মানুষের মহিমা

মানুষের মহিমা

প্রফুল্ল রায়

মণ্ডল বুক হাউস ॥ ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক ১৩৬৩ সন

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীগণেশ বসু

ব্লক
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস

মুদ্রক
শ্রীবংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

এখানে পিঞ্জর

১

সেই দুপুর থেকে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছিল। আর ছিল একটানা গোঙানির মতো ভিজে ভিজে পুবে বাতাস।

'নীলাকাশ' বলে একটা শব্দ অমলেশের জানা ছিল। ওপর দিকে কিছুক্ষণ চোখও পেতে রেখেছিল সে। কিন্তু বৃথাই, কোথাও এক ফোঁটা নীল দেখতে পাওয়া যায় নি। সারা আকাশ জুড়ে তখন থেকেই গাঢ় সীসের রঙ। পুবে-পশ্চিমে-ঈশানে-নৈঋতে শুধু মেঘ আর মেঘ। সে মেঘ মন-ভুলানো চোখ-জুড়ানো নয়, রীতিমত ভয়ধরানো। ভাবী গম্ভীর কালো কালো মেঘগুলো গর্ভিণী মহিষীর মতো হানা দিয়ে ফিরছিল; তাদের সঙ্গে ছিল বাজের গর্জন।

এ তো গেল দুপুরের কথা। হাওড়া থেকে অমলেশ যখন বীজপুরের লাস্ট ডাউন ট্রেনটা ধরেছিল তখন দুপুরও না বিকেলও না; বিকেল পেরিয়ে দিনটা সন্ধ্যের দেউড়িতে থমকে ছিল। সেই মুহূর্তে সূর্যকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। অবশ্য দুপুর থেকেই সূর্যটা আজ নিরুদ্দেশ।

সন্ধ্যের মুখে এসেও চরাচরের একই অবস্থা––সেই মেঘ, সেই বাজ, বিদ্যুতের সেই নিদারুণ হানাহানি।

বাঙলা ক্যালেন্ডারের সঙ্গে অমলেশের যোগাযোগ নেই। এটা কী মাস, কত বঙ্গাব্দ, সে বলতে পারবে না। তবে মেঘ-বিদ্যুৎ-বাজ আর পুবে হাওয়া––আকাশময় এত আয়োজন দেখে মনে হচ্ছিল, আষাঢ় কি শ্রাবণ।

আগে-পিছে এবং মাথার ওপর এমন দুর্যোগ নিয়ে বীজপুরের ট্রেনে ওঠা অমলেশের উচিত হয় নি; কিন্তু না উঠেও পারা যায় নি। বিচিত্র সম্মোহের ঘোরে এখানে ছুটে এসেছে সে। ইচ্ছা-অনিচ্ছা অথবা উচিত-অনুচিতের কথা আদৌ তার মনে পড়ে নি। বলা যায়, কোন এক অলৌকিকের হাতের ঘুঁটি হয়ে বীজপুর-গামী এই ট্রেনের কামরার যাত্রী হয়ে বসেছে অমলেশ।

অথচ আজই দুপুরে বোম্বাই থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছেছে। পরশু সন্ধ্যেয় ভিক্টোরিয়া টারমিনাস থেকে ক্যালকাটা মেল ধরেছিল; পুরো দুটি দিনের ক্লান্তি তার গায়ে মাখা। অনায়াসেই এক-আধদিন কলকাতায় বিশ্রাম করে বীজপুর রওনা হতে পারত অমলেশ। তা ছাড়া এ দেশের কিছুই চেনে না সে, জানে না। দু পুরুষ ধরে তারা বোম্বাইয়ের বাসিন্দা; জীবনে বাঙলাদেশে এই তার দ্বিতীয়বার আসা।

হাওড়া থেকে আগেই খবরটা পেয়েছিল অমলেশ; এই ডাউন লোকাল ট্রেনটা রাত এগারোটায় বীজপুরে পৌঁছুবে। অত রাতে বাঙলাদেশের সুদূর অভ্যন্তরে এক অচেনা শহরে নবেন্দুদের বাড়িটা আবিষ্কার করা সহজ হবে না। তা ছাড়া দ্বিতীয় ঋতুর আকাশ মেঘ-বিদ্যুৎ-বাজ আর জোরালো ঝোড়ো হাওয়া, চতুরঙ্গে যেভাবে সেজে আছে তাতে কখন কী হবে কিছুই বলা যায় না; যে কোন মুহূর্তে শুরু হয়ে যেতে পারে। সব জেনেও সব বুঝেও অমলেশ বীজপুরের ট্রেনে উঠে বসেছে।

আজকের মতো এটাই বীজপুরের লাস্ট ট্রেন; ফলে মানুষ আর মালপত্রে গাড়িটা বোঝাই। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি ভিড়ে জানালার ধার ঘেঁষে প্রায় বাহুবলেই একটুখানি জায়গা যোগাড় করতে পেরেছিল অমলেশ। সে ওঠবার পর বেশিক্ষণ বসে থাকতে হয় নি; হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছিল।

ঘড়ির কাঁটায় এখন আটটা।

হাওড়া থেকে ট্রেনটা ক'টা স্টেশন পার হয়ে এসেছে অমলেশ গুনে রাখেনি। মনে পড়ছে গাড়ি ছাড়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায়, পরে দুর্বার বেগে ঝড়ের মতো। কাজেই অমলেশদের কামরায় তাবৎ দরজা-জানলা ভেতর থেকে টেনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

অমলেশ অবশ্য জানালায় কাচের মধ্যে দিয়ে দূরমনস্কের মতো বাইরে তাকিয়ে ছিল। বাইরে কোন বিস্ময়ই নেই; শুধু গাঢ় কালো আকারহীন অন্ধকার। টের পাওয়া যাচ্ছে পুবে বাতাস আর তীরের ফলার মতো অশ্রান্ত বৃষ্টি জানালার কাচে রুদ্ধ আক্রোশে নিয়ত আঘাত হেনে যাচ্ছে। দ্বিতীয় ঋতুর এই রাতটার ওপর একটা সর্বনাশের আত্মা যেন ভর করে বসেছে।

বাতাসের মত্ততা, বৃষ্টির হানাহানি, বিদ্যুৎ চমক—অমলেশের চেতনায় কিছুই রেখাপাত করতে পারছিল না। অমলেশ শুধু ভাবছিল; গভীর নিরাকার ভাবনার ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল ট্রেনে করে এই যাওয়াটা সত্যি না; স্বপ্নের ঘোরে বুঝি-বা বীজপুরের যাত্রী হয়ে বসেছে।

আশ্চর্য! কোনদিন যে বাংলাদেশে আসতে হবে, অমলেশের সুদূর কল্পনাতেও এমন আকাঙ্ক্ষা ছিল না। এ ছিল তার পক্ষে অভাবনীয়। ছেলেবেলায় একবার বাবার সঙ্গে অবশ্য এসেছিল, একবারই শুধু। এদেশেব ধানের খেত, নদী, খাল, বিল. সবুজ বনানী, মাঠ এবং প্রান্তর—এসব অস্পষ্ট ভাবে অমলেশের মনে ছিল। ওইটুকুই মাত্র। বাংলাদেশ অমলেশের স্মৃতিতে আছে, অনুভবে নেই।

দু-পুরুষ বোম্বাইতে আছে তারা; বাংলাদেশ সম্বন্ধে সামান্য মোহটুকু পর্যন্ত অমলেশের মধ্যে আর অবশিষ্ট নেই। মাত্র বারশ মাইল দূরে এই দেশ। অমলেশের পিতৃভূমি! কিন্তু মনের দিক থেকে সে গ্রহান্তরের মানুষ। আরবসাগরের পটের একটি শহর বঙ্গোপসাগরের কূলের এই দেশটাকে অমলেশের অনুভূতি থেকে প্রায় মুছে দিয়েছে।

বাংলাদেশের নামে তার প্রাণে তরঙ্গ ওঠে না; বুকের ভেতর আবেগের নদীটি বিন্দুমাত্র উথলায় না। এদেশের কোন কিছুই অমলেশকে কোনদিন মুগ্ধ বা অভিভূত করে নি; সত্তার কোন তাবে ঝঙ্কার তোলে নি। এদেশ নিয়ে বিস্ময় অহংকাব কিংবা গ্লানি, কিছুই তার নেই। পিতৃভূমি অমলেশের কাছে কথার কথা মাত্র।

বাংলাদেশে অমলেশ নিতান্তই অচেনা আগন্তুক। 'বিদেশী'ই তার সবচাইতে সার্থক বিশেষণ। তবু যে এখানে ছুটে এসেছে তা শুধু নবেন্দুর জন্য। অথচ নবেন্দু তার আত্মীয় না, স্বজন না, বন্ধু না কেউ-না। সামান্য কিছু পরিচয় ছাড়া তার সঙ্গে অমলেশের কোন সম্পর্কই নেই।

অমলেশ এসেছে নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে। অবশ্য একটা টেলিগ্রাম করে অনায়াসেই নবেন্দুর বাবা-মাকে খবরটা জানিয়ে দিতে পারত। অমলেশ তা করেনি।

নবেন্দুর মৃত্যু ছাড়াও আর একটা ব্যাপার ঊর্ধ্বশ্বাসে অমলেশকে ভারতবর্ষের এ প্রান্তে ছুটিয়ে এনেছে। নিজেদের সংসার সম্বন্ধে নবেন্দু অমলেশকে কিছু কথা বলেছিল, অমলেশ তার সত্যতা যাচাই করতে এসেছে।

কতক্ষণ নিজের ভাবনার ভেতর তলিয়ে ছিল খেয়াল নেই। একটা স্টেশনে এসে গাড়িটা থামল। এখনও সমানে বৃষ্টি পড়ছে, পৃথিবীকে রসাতলে না পাঠানো পর্যন্ত দ্বিতীয় ঋতুর এই রাতটা বোধহয় থামবে না।

একটা ব্যাপার অমলেশ লক্ষ্য করেছে। হাওড়া থেকে বেরুবার পরই এ কামরার দরজা-জানালাগুলো সেই যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তারপর সহজে আর খুলতে চায় নি।

দরজার মুখ জুড়ে একটা প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স। তার ওপর যে বসে আছে বয়সে সে প্রৌঢ়, উৎসাহে তরুণ। এই কামরার সেই দুর্গরক্ষী তথা সেনাপতি। নেহাৎ যে-সব যাত্রী নামতে চায় তাদের জন্য বাক্সটা একটু সরিয়ে তৎক্ষণাৎ আবার সেটা টেনে দেয় সে। নামতে চাইলে নামা যাবে কিন্তু নতুন যাত্রীদের পক্ষে এ কামরা নিষিদ্ধ দেশ। হাজার মাথা কুটলেও তাদের জন্য এখানকার দরজা ইঞ্চিখানেকও ফাঁক হবে না। ট্রাঙ্ক এবং সেনাপতি সেখানে অনড় বসে আছে।

প্রৌঢ়র হাতে নিজেদের দায়িত্ব সঁপে দিয়ে এ কামরাটা বেশ নিশ্চিত আছে। কিছু কিছু লোক নেমে গেলেও ভিড় যেমন ছিল প্রায় তেমনি রয়েছে। তেমনি আকণ্ঠ, তেমনি ঠাসবুনন। যতজন বসতে পেরেছে তার দশগুণ দাঁড়িয়ে। সবাই প্রায় কথা বলছে, ফলত মাছির ভনভনানির মতো একটা শব্দ অমলেশের কানের পর্দায় অবিরাম ঘা দিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া আছে বিড়ির ধোঁয়া, পানের পিক, বাদামের খোসা। সব মিলিয়ে বায়ুশূন্য শ্বাসরুদ্ধ এক জগতে কেউ অমলেশকে ছুঁড়ে দিয়েছে বুঝি।

যাই হোক, গাড়িটা স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ঘা পড়ল, 'দরজা খুলুন, দরজা খুলুন—'

মেয়েমানুষের গলা, কিন্তু সেনাপতির হৃদয় দ্রবীভূত হবার লক্ষণ দেখা গেল না। চোখ আধাআধি বুজে আয়েস করে ফুক ফুক বিড়ি টেনে যাচ্ছে সে।

সেই গলাটা আবার শোনা গেল, 'দয়া করে খুলুন, একদম ভিজে গেলাম—'

অমলেশ পুরোপুরি শুনতে পেল না; পুবে বাতাসের ঝাপটায় বাকি কথাগুলো কোন্‌দিকে উড়ে গেল।

এদিকে সেনাপতি অটল। বিড়ি টানায় কোনরকম বিঘ্ন ঘটবে বলে মনে হল না। দরজা ধাক্কানি চলেছেই। সেই সঙ্গে সমানে ডাকাডাকি, 'কেউ দরজা খুলছে না। এ ট্রেনে যেতে না পারলে আজকের রাতটা বাইরে কাটাতে হবে আমাকে। একা মেয়েছেলে—' কণ্ঠস্বর এবার করুণ, ব্যাকুল, মিনতিপূর্ণ।

সেনাপতি এবারও অবিচলিত।

প্রৌঢ়র যে রণকৌশল এবং চাতুর্য অমলেশকে চমৎকৃত করেছিল এখন তা নিদারুণ অমানুষিক মনে হল। তার অভিভাবকত্বে হাওড়া থেকে এতদূর পথ নিশ্চিন্তে পাড়ি জমাতে পেরেছে, সে কথা অমলেশের মনে থাকল না। এই দুর্যোগের রাতে একটি মেয়ে অথবা মহিলা একা একা কোথায় থাকবে, কী করবে, এই চিন্তাটা অমলেশের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিল। নিজের অজান্তেই বুঝি-বা লাফ দিয়ে উঠে পড়ল সে, তারপর প্রৌঢ়কে এক টানে তুলে বাক্স সরিয়ে দরজা খুলে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে প্ল্যাটফর্ম থেকে যে উঠে এল, উপমা দিয়ে বলা যায় সে রাজহংসী।

মেয়ে যে, গলার স্বরে আগেই টের পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু মুখোমুখি যে দাঁড়িয়ে সে অভাবনীয়া, অমলেশের সুদূর কল্পনায় তার ছায়ামাত্র ছিল না।

বৃষ্টির ছাটে প্রায় ভিজেই গেছে। গাল-কপাল আর চুল বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় জল ঝরছে। তবু বুঝতে পারা যায়, তার বয়েস খুব বেশি হলে তেইশ-চব্বিশ। গায়ের রঙ রৌদ্র ঝলকের

মতো। পরনে সাদা শাড়ি, সাদা জামা। বাঁ-হাতের কব্জিতে সরু ফিতে দিয়ে বাঁধা ঘড়ি, ডান-হাতে এক বোঝা কাচের চুড়ি; কানে পাথর বসানো ইয়ার-রিং। এই সামান্য বেশে সামান্য সাজেও সে জাদুকরী।

মেয়েটা মোটামুটি সুবেশা, চেহারায় সুচারু একটি ছাঁদ আছে। কিন্তু তাকে সুকেশা বলা যায় কি না, সে সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ রয়েছে। চুলের রঙ তার কালোই; তবে তেল না দেবার জন্যই হয়তো রুক্ষ। নাক তীক্ষ্ণ, গলায় মরালীর মতো মসৃণ দীঘল টান। চোখের তারা দুটো তার কুচকুচি কালো; উজ্জ্বল মণিখণ্ডের মতো। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, সে দুটো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, চঞ্চল, শাণিত। কিন্তু লক্ষ্য করলে টের পাওয়া যাবে, চোখের ভেতর কোথায় খানিকটা ভীরুতা মিশে আছে।

মেয়েটা গাড়িতে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছেড়ে দিল। দরজা খোলা পেয়ে পুবে বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টির ছাট হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে সে অমলেশের দিকে ফিরল। তীক্ষ্ণ বিরক্ত গলায় বলল, 'এতক্ষণ ধরে ধাক্কা দিচ্ছি, ডাকছি, দরজা খুলছিলেন না কেন?'

উত্তরটা অমলেশের জানা ছিল; দিতে পারল না। চুপ করে থাকল।

মেয়েটি অমলেশের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলল, 'গাড়িটা আপনাদের সম্পত্তি বলে মনে হচ্ছে! নিজেরা ছাড়া কারোকে উঠতে দেবেন না।'

যদিও বিরক্তি ও তীব্রতা মেশানো তবু বোঝা যায় মেয়েটার কণ্ঠস্বর সুন্দর, অশ্চর্য ধ্বনিময়। যাই হোক, দরজা বন্ধ করে রাখাটা অমলেশেরই কারসাজি বলে সে হয়তো ধরে নিয়েছে।

অমলেশ বিড়বিড় করে কী বলল, নিজেই বুঝতে পারল না।

গলার স্বরে ধিক্কার মিশিয়ে মেয়েটা বলল, 'ছিঃ, আপনাদের সামান্য মনুষত্বটুকু পর্যন্ত নেই। এটাই লাস্ট ট্রেন; এটা ধরতে না পারলে ঝড়-বৃষ্টিতে আমার কী অবস্থা হত বলুন তো?'

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে আর সাহস হল না অমলেশের; নিঃশব্দে নিজের জায়গায় ফিরে এল সে। ফিরেও কিন্তু চোখ ফেরাতে পারল না। সজ্ঞানে নয়, অজ্ঞাতসারেই, বুঝি-বা বিচিত্র এক ঘোরের মধ্যে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আছে। নাকি দুর্বার আকর্ষণে তার চোখ দুটি নিজের দিকে টেনে রেখেছে।

অমলেশই শুধু না, এ কামরায় সব ক'টি যাত্রী স্থির নিষ্পলকে মেয়েটিকে দেখছিল। দৃষ্টি যদি বাণ হত, মেয়েটাকে অনেক আগেই ভীষ্মের শরশয্যা পাততে হত।

কামরাসুদ্ধ লোক তাকিয়ে আছে। মেয়েটির কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই। দৃষ্টিটাকে সে কামরার চারধারে ঘুরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; খুব সম্ভব বসবার মতো একটা জায়গা খুঁজে বার করা তার উদ্দেশ্য। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ মেয়েটার নজরে পড়ল, অমলেশের কাছাকাছি একটা উঁচু বস্তা পড়ে আছে, অনায়াসেই সেটার ওপর বসা যায়, দেখা মাত্র যাত্রীদের ভেতর দিয়ে পথ করে বস্তাটার কাছে চলে এল। সঙ্গে তার বিশেষ কিছুই নেই, চামড়ার ছোট একটা সুটকেশ শুধু।

মেয়েটা বসে পড়েছে। তার পাশেই কাঠের দেওয়াল; মেয়েটা দেওয়ালে হেলান দিল। সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ আচ্ছন্ন হয়ে এল।

অমলেশ তাকিয়েই ছিল। ঘুমন্ত মেয়েটাকে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত কোমল এবং অসহায় মনে হচ্ছে। একটু আগে রুক্ষ কর্কশ স্বরে যে কথা বলছিল সে যেন এ নয়, অন্য কেউ।

তাকিয়ে তাকিয়ে অমলেশের বিস্ময় যেন আর কাটছে না। বিস্ময়টা একাধিক কারণে। প্রথমত, মেয়েটা আশ্চর্য সুরূপা দ্বিতীয়ত অনায়াসগামিনী। তৃতীয়ত, এত রাতে এই লাস্ট ডাউন ট্রেনে একা-একা কোথায় চলেছে সে?

নিদারুণ এক কৌতূহল নিতান্ত অকারণে অমলেশকে একটু-একটু করে বেষ্টন করতে লাগল।

মেয়েটা খুব কাছে বসে আছে। তার শরীর থেকে একটা গন্ধ আসছিল। স্নিগ্ধ মৃদু গন্ধ। অমলেশের নাকের ভেতর দিয়ে সেটা ঢুকে স্নায়ুগুলোকে ক্রমশ অবশ আর বিহ্বল করে ফেলেছে।

বোম্বাইতে পার্শী মেয়েদের অমলেশ দেখেছে, সিন্ধি এবং পাঞ্জাবিনীদের দেখেছে। তারা সহজ স্বচ্ছন্দ সাবলীলা। বাঙালি মেয়েদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানত না; অবশ্য অনেক কিংবদন্তি শুনেছে। তারা হচ্ছে লজ্জা এবং সংকোচে জড়সড় এক-একটি পুঁটুলি। ছুঁতে গেলে গুটিয়ে যায় কী যেন এক লতা অছে, তাবা তাই। কিন্তু এই মেয়েটা অমলেশের এতদিনের ধারণার প্রতিবার।

ট্রেনটা আরো গোটা চারেক স্টেশন পার হয়ে গেল। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর মেয়েটির দিক থেকে কখন চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে অমলেশের মনে নেই।

প্রায় আড়াই দিনের মতো ট্রেনে ট্রেনে ঘুরছে অমলেশ। অসীম ক্লান্তিতে কখন যে ঝিমুনি এসেছিল, জানে না। কামরার লোকগুলোও বিমূঢ় বিস্ময়ে কিছুক্ষণ মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থেকে গাড়ির দোলানির তালে তালে ঢুলতে শুরু করেছে।

যাই হোক, মেয়েটা এ কামরায় উঠবার পর চারটে স্টেশন অমলেশরা নির্বিঘ্নে পার হয়ে এসেছে। কিন্তু পঞ্চম স্টেশন আসতেই বাইরে থেকে আবার ধাক্কা পড়ল। মেয়েটার মতো দুর্বল হাতে নয়, জোরে জোরে প্রচণ্ড বেগে। শুধু ধাক্কাই না, সেই সঙ্গে বুটের লাথিও পড়ছে।

মেয়েটা ঢুকবার পর দরজার কাছের সেই প্রৌঢ় কাঠের বাক্সটা টেনে দিয়ে কামরাটাকে আবার দুর্ভেদ্য করে ফেলেছিল এবং টান হয়ে বাক্সটার ওপরেই শুয়ে পড়েছিল। খুব সম্ভব ঘুমটা তার পাকেনি। পরিপাটি হয়ে আসা তন্দ্রাটা ভেঙে যেতে খেঁকিয়ে উঠল, 'এ কামরায় মাছি গলবার জায়গা নেই। অন্য কোথাও দেখুন—'

ধাক্কা আর লাথি-বর্ষণ থেমে গেল। তার বদলে মোটা সুরহীন গলায় কড়া নির্দেশ এল, 'তাড়াতাড়ি দরজা খুলুন। পুলিস—'

'ভাঁওতা মাববার জায়গা পাও না? ও সব তাল এখানে চলবে না। পুলিসের নাম করলেই উঠতে দোবো, তেমন পাত্তর আমি না।'

'দরজা খুলে দাও বলছি। নইলে ভেঙে ঢুকব—' কণ্ঠস্বর এবারে বেশ কঠোর, রূঢ়। প্রৌঢ়র এবার কেমন যেন খটকা লাগল। ধীরে ধীরে উঠে দরজা খুলে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে ওয়েস্টবেঙ্গল পুলিসের দু-জন কনস্টেবল নিয়ে একজন ইন্সপেক্টর বৃষ্টিতে পায়ে নেয়ে এসে উঠলেন।

পুলিসের নামের মহিমা আছে। যাত্রীদের চোখ থেকে বর্ষারাত্রির ঢুলুনি ছুটে গেল। কামরাময় সন্ত্রস্ত ভীত গুঞ্জন উঠেছে, 'আবার পুলিস কেন?'

অমলেশের ঝিমুনিও ছুটে গেল। লক্ষ্য করল ইতিমধ্যে সেই মেয়েটির ঘুমও কখন ভেঙে গেছে। চোখমুখ দেখে অনুমান করা যায়, রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছে সে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে তীক্ষ্ণ শিকারী চোখে কী যেন খুঁজছিলেন ইন্সপেক্টর। তাঁর চোখদুটো চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত অমলেশের পাশের সেই মেয়েটার ওপর স্থির হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-চমকের মতো কী যেন খেলে গেল তাঁর মুখে!

করায়ত্ত শিকারের দিকে বনের বাঘ যেমন সকৌতুক তৃপ্তির সঙ্গে তাকায়, ইন্সপেক্টরের চোখে অবিকল সেই দৃষ্টি। ভাবখানা এই, কোথায় যাবে চাঁদ, তুমি এখন আমার মুঠোর ভেতর।

একটুক্ষণ নিশ্চল হয়ে থাকলেন ইন্সপেক্টর। তারপর উল্লসিত চাপা গলায় প্রায় চেঁচিয়েই উঠলেন, 'হিয়ার ইউ আর' বলেই একে-ওকে-তাকে ডিঙিয়ে মেয়েটার কাছে এসে দাঁড়ালেন। পুলিস দুটোও তাকে অনুসরণ করে এসে পড়ল।

মেয়েটার চোখের তারা স্থির হয়ে গেছে। চোয়াল কঠিন, ঠোঁট শক্তবদ্ধ। কপালে কণা কণা ঘাম দেখা দিয়েছে। একটু আগের চাঞ্চল্য আর নেই। সমস্ত শরীর ঘিরে কেমন যেন বেপরোয়া মরিয়া ভাব।

ইন্সপেক্টরই প্রথম কথা বললেন, 'সেই জংশন স্টেশন থেকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। খুঁজে খুঁজে মরি, ধরিতে না পারি। খুব লুকোচুরি খেললেন যা হোক।'

কাঁপা অস্ফুট সুরে মেয়েটা বলল, 'লুকোচুরি কী রকম?'

'রকম জানতে চাইছেন?' শব্দ করে ইন্সপেক্টর হেসে উঠলেন, সেটা আমার কাছ থেকে না-ই শুনলেন। নিজেই তো ভাল জানেন।'

মেয়েটা উত্তর দিল না। দাঁতে দাঁত চেপে উঠে দাঁড়াল। তার নির্নিমেষ স্থির দৃষ্টি ইন্সপেক্টরের মুখের ওপর। সে দৃষ্টিতে অটুট কাঠিন্য।

ইন্সপেক্টর বিপুল উৎসাহে বলে উঠলেন, 'তারপর ম্যাডাম—'

'কী?' ঠোঁট দুটো এবার নড়ে উঠল মেয়েটার।

'একেবারে খালি হাতে দেখছি যে? মাল পাচার করে ফেলেছেন নাকি?' মেয়েটা নিশ্চুপ।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'জংশন স্টেশনে দেখলাম আপনার হাতে কী একটা ব্যাগ না সুটকেস—সেটা কোথায়?'

বীজপুরগামী লাস্ট ডাউন ট্রেনে বিচিত্র রহস্যময় এই নিশীথ-নাটকের দর্শক অমলেশ। আগাগোড়া একদৃষ্টে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে। দর্শক একা অমলেশই না, এ কামরার তাবৎ যাত্রী। মেয়েটা যখন এ কামরায় ওঠে তখনই অমলেশের অদৃশ্য ইন্দ্রিয়কে যেন বার বার জানান দিয়ে যাচ্ছিল, সে সহজ নয়। যে মেয়ে দুর্যোগের রাতে একা একা লাস্ট ডাউন ট্রেনে ঘুরে বেড়ায় তাকে ঘিরে সর্বনাশা ইঙ্গিত রয়েছে।

চকিতে অমলেশের মনে পড়ে গেল, গাড়িতে উঠবার সময় মেয়েটার হাতে চামড়ার চকচকে নতুন একটা সুটকেস ছিল। চারদিকে আতিপাঁতি করে খুঁজেও তার চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারল না অমলেশ। নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আর পোশাক ছাড়া মেয়েটির আর কিছুই নেই। একেবারে ঝাড়া হাত-পা। সুটকেসটা কি তবে অমলেশ ভুল দেখেছিল?

চাপা অনুচ্চ গলায় মেয়েটা বলল, 'আমার সঙ্গে কিছু নেই।' স্বরের মধ্য দিয়ে একটা তরঙ্গ বয়ে গেল।

ইন্সপেক্টরের চোখ কুঁচকে গেছে, দৃষ্টিটা সন্দিগ্ধ। জোরে জোরে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে সংশয়ের সুরে তিনি বললেন, 'চোখ আমার এত খারাপ হয় নি। উঁহু। নিশ্চয়ই আপনার হাতে কিছু ছিল। কোথায় সেটা বলুন।' একটু আগে তাঁর কথায়-বার্তায় কৌতুকের কিছুটা আমেজ ছিল। এখন তাতে ভিন্‌ভাবের রঙ ধরেছে। সুরটা এখন পুরোপুরি পুলিসসুলভ অর্থাৎ রসকষহীন এবং কঠোরতা মেশানো।

অমলেশ লক্ষ্য করল, বর্ষার এই শীতল রাত্রিতেও ঘেমে নেয়ে উঠেছে মেয়েটা। ঠোঁট দুটো আর হাতের আঙুলগুলো অস্বাভাবিক কাঁপছে। প্রাণপণে সেই কাঁপুনির বেগ সামলাতে চেষ্টা করল সে। অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কাছে কিচ্ছু নেই; কেন শুধু শুধু পেছনে লেগেছেন!'

'কিচ্ছু নেই?'

'না।'

'শুধু শুধু পেছনে লেগেছি!'

'নিশ্চয়ই।'

'চমৎকার।' ইন্সপেক্টরের চোখ ধীরে ধীরে উগ্র হয়ে উঠতে লাগল; এবং সেই সঙ্গে মেয়েটির কাছে কিছু দেখতে না পেয়ে অশাভঙ্গের ছায়াও তাতে পড়তে লাগল।

হতাশার ব্যাপারে কিছুটা যেন আঁচ করে ফেলল মেয়েটা। কঠিন গলায় সে বলল, 'একজন ভদ্রমহিলাকে অকারণে হ্যারাস করেছেন, এর ফলাফল কিন্তু আপনার পক্ষে খুব ভাল হবে না ইন্সপেক্টর।'

ইন্সপেক্টর কিছু বললেন না। তার মুখখানা শুধু সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠল। সাঙ্ঘাতিক এবং নির্মম। অকারণে উত্ত্যক্ত করার জন্য মেয়েটির অভিযোগ এবং সতর্কবাণী তাঁকে যেন ক্ষিপ্ত করে তুলল। সন্ধানী শিকারী চোখ চালিয়ে বেঞ্চির তলায় ডাঁই-করা মালপত্রের ফাঁকে ফাঁকে কী যেন খুঁজতে লাগলেন তিনি। খুব সম্ভব জংশন স্টেশনে মেয়েটির হাতে অস্পষ্টভাবে দেখা কোন ব্যাগ অথবা ঐ রকম আর কিছু।

খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ইন্সপেক্টরের চোখের তারা নেচে উঠল। নিষ্ঠুর উল্লাসের অব্যক্ত একটা ধ্বনি তাঁর গলার ভেতর থেকে যেন লাফ দিয়ে বেবিয়ে এল, 'দেয়ার ইউ আর!' পরক্ষণেই ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এগিয়ে এলেন ইন্সপেক্টর।

ইন্সপেক্টরের দৃষ্টি অনুসবণ করে অমলেশের চোখ তার নিজেরই পায়ের পেছন দিকে আটকে গেল। অমলেশ বেঞ্চিতে বসে আছে তার তলায় অন্ধকারে সেই ঝকমকে চামড়ার সুটকেসটা। আশ্চর্য, ওটা ওখানে কিভাবে গেল অমলেশ ভেবেই পেল না।

ইন্সপেক্টর এগিয়ে এসে বললেন, 'কাইন্ডলি আপনাব পা দুটো সরান তো—'

অমলেশ তৎক্ষণাৎ পা সরিয়ে নিল না। চকিতে তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল মেয়েটির মুখে। একটু আগের সেই অটুট কাঠিন্য এখন ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টি কেমন উদ্‌ভ্রান্ত এবং অসহায়। আতঙ্কের একটা ছায়া চারদিক থেকে একটু একটু করে ঘিরে ধরেছে। হাত-পা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। মৃতের মতো স্তব্ধ ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে আছে সে।

ভাবশূন্য, তবু অমলেশের মনে হল দৃষ্টিব সেই শীতল জমাট স্তব্ধতা দিয়ে অনুনয়ের মতো কিছু একটা বলতে চেষ্টা করছে মেয়েটা। কী বলতে চাইছে? এই মুহূর্তে অমলেশ তা বুঝতে পারল না।

এদিকে ইন্সপেক্টর কাছে এসে পড়েছেন। বেঞ্চির দিকে ঝুঁকে বললেন, 'কী হল, পা সরান।'

পা না সরিয়ে এবার পারল না অমলেশ। পা সরাল ঠিকই কিন্তু তার চোখ দুটি বরাবর মেয়েটির মুখেই স্থির হয়ে আছে। মেয়েটাব পাতলা রক্তাভ ঠোঁট কুঁকড়ে যাচ্ছে। সামলাবার জন্য বারবার সে দুটো কামড়ে কামড়ে ধবছে। হাত দুটো আপনা থেকেই মুঠো পাকিয়ে যাচ্ছে। এবার যেন মেয়েটার চোখেব ভাষা খানিক পড়তে পারল অমলেশ। সঙ্গে সঙ্গে ধমনীতে রক্তস্রোত মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। ভয়— নিদারুণ এক ভয় অমলেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

ইন্সপেক্টর বেঞ্চির তলায় হাত ঢুকিয়ে সুটকেসটা বার করে এনেছিলেন। সুটকেস না, ওটা বুঝি-বা তাঁবা সারা জীবনের সারাৎসার— তাঁর ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ।

বাঞ্ছিত বস্তুটিকে ওপর দিকে তুলে ইন্সপেক্টর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, তবে যে বললেন কিছু নেই আপনার সঙ্গে! এটা তাহলে কী?

মেয়েটা উত্তর দিল না, খুব সম্ভব দিতে পারল না। অসহ্য স্নায়ুভীতিতে এখন তার কথা বলার শক্তি নেই।

সুটকেসটা দোলাতে দোলাতে ইন্সপেক্টর টেনে টেনে বলতে লাগলেন, 'আপনি না ভদ্রমহিলা! কেমন ভদ্রমহিলা, এবার আমি দেখব।'

'ভদ্রমহিলা' শব্দটির ওপর অস্বাভাবিক জোর দিলেন ইন্সপেক্টর। উচ্চারণের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ধিক্কার এবং শ্লেষ। হয়তো কিছুটা অশোভনতাও।

এতক্ষণ বিহ্বল দর্শকের মতো ছিল অমলেশ। অকস্মাৎ তার বুকের মধ্যে ধস নামল, সঠিক কী যে ঘটল বলতে পারবো না। নিজের অজান্তে সমুদ্রে ঝাঁপ দেবার মতো চেঁচিয়ে উঠে অমলেশ বলল, 'ওটা আমার সুটকেস—দিন।' বলেই হাত বাড়াল। সম্ভবত এই কথাটাই দৃষ্টির স্তব্ধতা দিয়ে অমলেশকে বোঝাতে চেয়েছিল মেয়েটা।

অমলেশ যা বলছে তাতে দুজনের প্রতিক্রিয়া হল দু রকম। মেয়েটার শিথিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলি আবার নিজের বশে ফিরে আসতে লাগল যেন। মুখের রেখায় রেখায় আগের সেই কাঠিন্য দেখা দিয়েছে আর ভাবলেশহীন চোখের তারায় অমলেশের আচরণে প্রথমটা বিস্ময় খেলে গিয়েছিল, তারপরেই সে দুটো জ্বলে উঠল। ইন্সপেক্টরের দিকে ফিরে কর্কশ সুরে বলল, 'ও সুটকেস আমার নয়।'

ইন্সপেক্টর থতিয়ে গেলেন এবার। এ রকম একটা ব্যাপারের জন্য বোধহয় প্রস্তুত ছিলেন না। বিমূঢ়ের মতো বললেন, 'এটা আপনার সুটকেস না?' স্বরটা তাঁর স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন তোতলামির রেশ তাতে মেশানো।

'না।' পরিষ্কার জবাব মেয়েটার।

অবাক হয়ে গেল অমলেশ। এতখানি জোর দিয়ে কত অনায়াসে মিথ্যে বলল মেয়েটা, গলা একটুও কাঁপল না।

ইন্সপেক্টর এবার অমলেশেব দিকে তাকালেন। তাঁর চোখ ধারালো, দূরভেদী। বললেন, 'এ সুটকেসটা আপনার? আর ইউ সিওর?'

মুহূর্তের জন্য ভেতরের শ্বাসটা আটকে গেল যেন, ধমনী একেবারে স্তব্ধ। কিছুক্ষণ পর হৃৎপিণ্ডের আবদ্ধ বাতাস কোন রকমে বার করে দিয়ে অমলেশ রুদ্ধস্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই, ওটা আমার সুটকেস।'

মিথ্যে বলেছে অমলেশ, নিদারুণ ভয়াবহ মিথ্যে। মিথ্যে বলার এই দুর্জয় সাহস কোথা থেকে যে পেল তা বলতে পারবে না সে। কেনই বা এমন বিপজ্জনক মিথ্যেটা উচ্চারণ করল তারও কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। তবে কি রহস্যময়ী মেয়েটার আশ্চর্য রূপ আর চোখের ভীত করুণ চাহনি অমলেশের অবচেতনে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিয়েছে?

ইন্সপেক্টর তীব্র দৃষ্টিতে একটুক্ষণ অমলেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর সুটকেসটা পায়ের কাছে নামিয়ে রেখে মেয়েটির দিকে ফিরলেন। কঠোর সুরে বললেন, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

মৃত্যুর মতো আড়ষ্ট স্তব্ধতা আগেই কেটে গিয়েছিলে মেয়েটার। চোখমুখ রীতিমত উগ্র হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, 'আবার বলছি, আপনি শুধু শুধু আমাকে বিরক্ত করছেন। এর ফলাফল আপনার পক্ষে খুব খারাপ হবে।'

'ফলাফলটা মনে করিয়ে দেবাব জন্য ধন্যবাদ।' ইন্সপেক্টরের মুখে ধূর্ত হাসি খেলে গেল।

মেয়েটা চুপ।

ইন্সপেক্টর বললেন, 'অনুগ্রহ করে এবার আমাব সঙ্গে চলুন।'

'বলছি ও সুটকেস আমার না; তবু যেতে হবে?' মেয়েটা দাঁতে দাঁত চাপল

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি করুন; গাড়ি এক্ষুণি ছেড়ে দেবে।'

'চলুন—' অনিচ্ছাসত্ত্বেও পা বাড়াল মেয়েটা। খানিক আগে যে অটুট কাঠিন্য তার মধ্যে দেখেছিল, অমলেশের মনে হল তার ভিত যেন শিথিল হয়ে যাচ্ছে।

ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মেয়েটা নেমে যাবার পর অনেকখানি সময় কেটে গেছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে ট্রেনটা বীজপুরের কাছাকাছি যত এসে পড়ছে, অমলেশের অস্বস্তি ততই বেড়ে চলেছে। অস্বস্তিই শুধু না, সেইসঙ্গে উৎকণ্ঠাও। সুটকেসটা এখনও তার পায়ের কাছেই পড়ে আছে। মেয়েটা যদি আর নাই ফেরে সুটকেসটা নিয়ে কী করবে অমলেশ?

শেষ পর্যন্ত ট্রেনটা বীজপুর পৌঁছে গেল। এখনও মেয়েটা ফেরে নি। বুকের ভেতর সীমাহীন অস্বস্তি পুরে সুটকেসটা নিয়ে নেমে পড়ল অমলেশ। নামতে নামতে ঠিক করল স্টেশন-মাস্টারের কাছে এটা জমা দিয়ে যাবে। মেয়েটার নাম-ঠিকানা জানা থাকলে সময় করে না হয় দিয়ে আসত। কিন্তু তার তো উপায় নেই।

বীজপুরের কাঁকর-ঢালা সুবিস্তৃত স্টেশন শূন্যপ্রায়। লাস্ট ট্রেন থেকে অনেক লোক নামল ঠিকই কিন্তু নেমেই তারা নিমেষে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কে বলবে। অমলেশের জন্য কেউ বসে রইল না।

প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় অ্যাসবেস্টসের সংক্ষিপ্ত ছাউনি; সেখানে মিটমিটিয়ে আলো জ্বলছে। এ ছাড়া যেদিকে যতদূর তাকানো যায় গাঢ় অন্ধকার।

বৃষ্টিটা আগের মতো জোরালো নেই। কিন্তু সমানে ঝরেই যাচ্ছে। পুবে বাতাসের ছাটটাও রয়েছে। বিদ্যুতের ঝলক, আকাশ জুড়ে কালো কালো মেঘের চাংড়া, তাদের একটানা দুন্দুভি—আয়োজনের কোথাও খুঁত নেই। যে কোন মুহূর্তে আবার প্রবল বেগে শুরু হয়ে যেতে পারে।

যাই হোক, অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় টিমটিমে আলো দেখে মনে হল ওটাই স্টেশন মাস্টারের ঘর-টর হবে। ট্রেন থেকে নেমে জোরে জোরে সেদিকে পা চালিয়ে দিল অমলেশ। উদ্দেশ্য, প্রথমত সুটকেসটা জমা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, রাত কাটাবার মতো একটা আস্তানার সন্ধান। আজ এত রাতে এই ঝড়জল মাথায় নিয়ে নবেন্দুদের বাড়ি যাবে না, যাওয়া ঠিক হবে না। এভাবে মৃত্যু সংবাদ জানাতে যাওয়া চরম নিষ্ঠুরতা। কাল একটু বেলা হলে ভেবে-চিন্তে যা হয় করা যাবে।

ছাউনিটার কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছে অমলেশ। ঠিক তখনই দেখতে পেল ট্রেনের সেই মেয়েটা যেন আকাশ থেকে নেমে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অমলেশ। সবিস্ময়ে বলল, 'আপনি!'

সামান্য হেসে মেয়েটা বলল, 'হ্যাঁ, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'বাঁচা গেল।' অমলেশের বুকের ভেতর থেকে স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল, 'আপনার সুটকেসটা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছিলাম। ঠিক করেছিলাম স্টেশন মাস্টারের কাছে জমা করে দেব। নিন, নিজের জিনিস বুঝে নিন।'

হাত বাড়িয়ে সে সুটকেসটা ধরল। আর সেই মুহূর্তে একটা কথা মনে পড়ে গেল অমলেশের। বলল, 'কিন্তু—'

'কী?' মেয়েটা উন্মুখ হল।

'আমি—যে এই স্টেশনে নামব, আপনি নিশ্চয়ই জানতেন না। না জেনে আন্দাজে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি না-ও তো নামতে পারতাম।'

'আপনি কোথায় নামবেন তা জানতাম না ঠিকই।' মেয়েটা বলতে লাগল, 'তা ছাড়া পুলিশ ইন্সপেক্টর তখন অন্য একটা কম্পার্টমেন্টে আমাকে নিয়ে তুলেছিল। তার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে যখন পরের স্টেশনে নামলাম, আপনার কামরাটা গুলিয়ে গেছে। কিছুতেই আর সেটা খুঁজে বার করতে পারলাম না। এদিকে গাড়ি ছেড়ে দিচ্ছে, কাজেই সামনে যে কামরাটা পেলাম সেইটেতেই উঠে পড়লাম। তারপর একেকটা স্টেশন এসেছে, প্লাটফরমে নেমে অপেক্ষা করেছি যদি আপনি নামেন। শেষ পর্যন্ত বীজপুরে এসে আপনার দেখা পাওয়া গেল।' বলতে বলতে একটু থামল সে, পরক্ষণেই আবার শুরু করল, আপনি আমার যা উপকার করলেন, বলে বোঝাতে পারব না। সামান্য ধন্যবাদে সে ঋণ শোধ হয় না।'

পুলিশের হাত থেকে সুটকেসটা রক্ষা করে এতটা পথ যখের মতো আগলে এনে তার হাতে তুলে দিয়েছে, মেয়েটার কৃতজ্ঞতা নিশ্চয়ই সেই জন্যই। মৃদু হেসে অমলেশ বলল 'ধন্যবাদের দরকার নেই। তবে—'

'কী?'

হঠাৎ অমলেশের ওপর দুষ্টুমি যেন ভর করল। বলল, 'একটা সুটকেস পেয়ে গেছি। তার ভেতর কী আছে জানি না, দামী কিছু থাকতেও পারে। ধরুন আমি যদি এই স্টেশনে না নামতাম—'

মেয়েটা তাকিয়েছিল। বলল, 'এখানে না নেমে উপায় কী, বীজপুর এ লাইনের লাস্ট স্টেশন।'

'তা জানি। ধরুন আমি নামলাম না। ওই ট্রেনেই আজ হোক কাল হোক যদি কলকাতায় ফিরে যেতাম আপনিও কি সেই পর্যন্ত ছুটতেন?'

মেয়েটা বিচিত্র হাসল, 'অতগুলো 'যদি' একসঙ্গে ঘটানো সোজা কথা নয়। সত্যিই যদি ঘটত, নিশ্চয় কলকাতা পর্যন্ত ছুটে যেতাম। কলকাতা কেন আপনি পৃথিবীর শেষ মাথায় গেলেও ছাড়তাম না। পিছু পিছু ধাওয়া করতাম। কেন জানেন?'

'কী করে জানব?'

মেয়েটি হঠাৎ ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ঐ সুটকেসের ভেতর আমার প্রাণ-ভোমরা আছে।'

মেয়েটা কি প্রগল্‌ভা? হয়তো হবে। অমলেশের অবশ্য তাতে কিছু যায় আসে না; সে চুপ করে রইল।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর খুব সহজ স্বাভাবিক সুরে মেয়েটা এবার বলল, 'আপনি কি বীজপুরেই থাকেন?'

সামান্য দ্বিধা, তারপর সজ্ঞানে মিথ্যেই বলল অমলেশ, 'হ্যাঁ।' কেননা যদি বলে এ শহরে সে অচেনা আগন্তুক তা হলে কোথা থেকে এসেছে, কেন এসেছে, এত রাতে কোথায় থাকবে ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্নের মুখে পড়বার সম্ভাবনা। এত রাতে অত জবাবদিহি অমলেশের পোষাবে না।

মেয়েটা বলল, 'আমি এখানেই থাকি। কিন্তু—'

জিজ্ঞাসু সুরে অমলেশ বলল, 'কী?'

'আপনাকে এর আগে কোনদিন তো দেখিনি।'

'বীজপুরের সব লোককেই আপনি চেনেন নাকি?'

'আলাপ-টালাপ না হলেও মুখ চেনা আছে বৈকি। বিশেষ করে লাস্ট ট্রেনে যাবা ফেরে দের সবাইকেই চিনি।' মেয়েটা হাসল।

সে যে অনায়াস-গামিনী, সাবলীলা, নিশুতি রাতে একা-একা চলাব অভ্যাস তার ছে—আগেই অমলেশ তা টের পেয়েছিল। বলার ইচ্ছা ছিল না তবু কখন যেন বলে লেছে, 'আপনি বুঝি রোজই লাস্ট ট্রেনে ফেরেন?'

'রোজ না, তবে প্রায়ই। ওই ট্রেনটার আগে ফেরা আর হয়ে ওঠে না।' মেয়েটা বলল, টশনে আব কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন, চলুন—'

'কিন্তু বৃষ্টি পড়ছে যে।'

'এখন অল্প অল্প পড়ছে, এব চাইতে আর কমবে বলে মনে হয না। কখন আবার যে বেড়ে বে। নিন, চলুন—' মেয়েটা বলতে লাগল, আজ আবার সাইকেল রিক্সাওলোর পাত্তা নেই। ী দেখে পালিয়েছে। ভিজতে ভিজতে যেতে হবে দেখছি।'

অসঙ্কোচে মেয়েটা তার সঙ্গে যেতে বলছে। এটা ভদ্রতা। কিন্তু এত রাতে এই দুর্যোগের তর বীজপুর নামে বাংলাদেশের এক অজানা শহরে তার সঙ্গী হয়ে কোথায় যাবে অমলেশ? লল, 'আপনি যান, স্টেশনে আমার একটু দরকাব আছে। আমি পরে যাব।'

'বেশ।' কেমন করে যেন হাসল মেয়েটা।

হাসির ভেতর এমন একটা ইঙ্গিত ছিল যা নিমেষে অমলেশকে চকিত করে তুলল। সে লল, 'সত্যি আমাব এখানে দবকাব আছে, আপনাকে এড়াবার জন্যে বলিনি।'

'আপনার কাছে কৈফিয়ত তো চাই নি।' মেয়েটা আগের মতোই হাসল, 'সে যাক। এত পকাব কবলেন, আপনার নামটাই কিন্তু জানা হয়নি।'

'আমার নাম অমলেশ— অমলেশ বসু। আপনার?'

'আমাব নাম? কী হবে শুনে? জীবনে আর হয়তো আপনার সঙ্গে দেখাই হবে না। আচ্ছা ন।' বলেই রাতের বিচিত্র রহস্যময়ী মেয়েটা ঝড়জলের মধ্যেই সামনের রাস্তায় নেমে গেল।

২

মেয়েটা চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল অমলেশ, তারপর য়ে পায়ে অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় স্টেশন মাস্টারের ঘরটার সামনে চলে এল।

বৃষ্টিটা কিছুক্ষণ ঝিমিয়ে থাকার পর আবার নতুন উদ্যমে ঝরতে শুরু করেছে। পূবে তাসের একটানা গোঙানি ছিলই। দিগন্তের ওপর দিয়ে সাপের জিভের মতো বিদ্যুৎ চমকে চ্ছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। চিরদিনের চেনা সেই আকাশ অথবা টার চিহ্নমাত্র নেই। আকাশের গায়ে কারা যেন টিন টিন ঘন আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে।

এই প্রলয়ে স্টেশন মাস্টারই একমাত্র ভরসা। আজকের রাতের মতো মাথা গোঁজার একটা স্তানার হদিস তার কাছ থেকে আদায় করতেই হবে। অন্য কিছু জুটলে ভাল, নইলে ওয়েটিং মেরই দখল নেবে অমলেশ। স্টেশন-কুলে বীজপুর নেহাতই অজাত, ঘটা করে দেখাবার ত ওয়েটিং রুম আদৌ আছে কিনা অমলেশের অবশ্য জানা নেই।

যাই হোক, সামনের ঘরটার ভেতর ধুসো কোট গায়ে যে প্রৌঢ়টি ঘাড় গুঁজে ক্ষিপ্র হাতে গজপত্র গোছগাছ করছিলেন তিনিই যে এই স্টেশনের অভিভাবক তথা স্টেশন মাস্টার, তে অসুবিধে হল না অমলেশের।

খুক খুক কেশে নিজের অস্তিত্ব ঘোষণা করলে অমলেশ। চমকে প্রৌঢ় অমলেশের দিকে কালেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'কি চান?'

গালে তিন-চারদিনের দাড়ি। মাথার চুল সাদায় কালোয় দাবার ছক, কর্তা
যে সেগুলোতে কাঁচি এবং তেল পড়ে নি। মাঝারি মাপের শরীর, স্বাস্থ্য ঈষৎ স্থূলতার দিকে
অমলেশের দিকে তাকিয়ে আছেন ঠিকই; তবু মনে হয় চোখের দৃষ্টি কিছুটা অন্যমনস্ক।

অমলেশ কিছু বলবার আগেই প্রৌঢ় আবার বলে উঠলেন, 'আজ আর কোন ট্রেন নে
শেষ গাড়ি এসে গেছে, এখন আমার দোকান বন্ধ করার পালা।'

ভদ্রলোক হয়তো মনে করেছেন অমলেশ টিকিটের খদ্দের। এত রাতে ট্রেনে করে কোথ
পাড়ি জমাবে। তাড়াতাড়ি তার ভুল ভাঙিয়ে অমলেশ বলে উঠল 'আজ্ঞে আমি লাস্ট ট্রে
কলকাতা থেকে এসেছি।'

বিমূঢ় মুখে প্রৌঢ় বললেন, 'তা হলে?'

'আপনি স্টেশন মাস্টাব তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

খানিক ইতস্তত করে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'ভেতরে আসুন'।

ঘরের ভেতর গিয়ে একটা হাতল ভাঙা চেয়ার দখল করতেই স্টেশন মাস্টার আবার ব
উঠলেন, 'কী ব্যাপার, বলুন—'

সংক্ষেপে অমলেশ জানাল, এই অচেনা শহরে আজই তার প্রথম আসা। রাত্রিবেলা থাব
জন্য একটা আস্তানা চাই।

আর্জি শুনে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'তাই তো, ভারি বিপদ হল। হোটেল টোটেল অবি
আছে, তবে সে-সব শহরের মাঝখানে।'

আশান্বিত হল অমলেশ, 'কি ভাবে যেতে হবে যদি বলে দ্যান—'

'আপনি কি পাগল হয়েছে? এখান থেকে হোটেল পাক্কা দু-মাইল পথ। যা বৃষ্টি শুরু হয়ে
যাবেন কী করে? তা ছাড়া এখানে আপনি নতুন লোক।'

একটু ভেবে অমলেশ বলল, 'এই স্টেশনের নিশ্চযই ওয়েটিং রুম আছে?'

স্টেশন মাস্টার আঁতকে উঠলেন, 'তা অবশ্য একটা আছে। কিন্তু সেটা তো—'

'সেটা কী?'

'বছর দুয়েক তার তালা খোলা হয়নি। ছোট ছোট শুয়োরের মতো ধেড়ে ইঁদুর, চামচি
আরশোলা আর তেঁতুলে বিছের আখড়া হয়ে আছে ওটা। ওর ভেতর রাত কাটানো অসং
ব্যাপার।'

'তা হলে কী করা যায় বলুন তো?'

চোখ কুঁচকে দূরমনস্কের মতো কী চিন্তা করলেন স্টেশন মাস্টার। তারপর তুড়ি মে
সমস্ত দুর্ভাবনা উড়িয়ে দেবার মতে করে বললেন, 'কুছ পরোয়া নেই, চলুন আমার কোয়ার্টা
আজকের রাতটা ওখানেই থাকবেন।'

দ্বিধান্বিত সুরে অমলেশ বলল, 'কিন্তু—'

অমলেশের মনের কথাটা যেন পড়তে পারলেন স্টেশন মাস্টার, 'কোন কিন্তু নেই মশা
চলুন দিকি।' বলে তাড়াতাড়ি জানলা-টানলা বন্ধ করে দরজায় প্রকাণ্ড তালা ঝুলি
অমলেশকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

তবু আরেকবার চেষ্টা করল অমলেশ, 'এত রাত্রিরে নিয়ে চলেছেন। মিসেসদের অসুবি
হবে—'

স্টেশন মাস্টার আগে আগে হাঁটছিলেন, থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। অমলেশের দিকে ফিরে ালেন, 'মিসেসদের! আপনি কি আমার সংসারটাকে মোগল বাদশাদের হারেম ঠাওরেছেন কি?'

বিব্রত বোধ করল অমলেশ। 'মিসেসদের' বলতে অমলেশ স্ত্রী বাহিনী বোঝায় নি; বাড়ির ার কথা বলেছে। শব্দটা এমন আক্ষরিক অর্থে যে ভদ্রলোক ধরবেন কে জানত। অস্পষ্ট ায় অমলেশ বলল, 'না মানে—'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার সংসারে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। একেবারে ফার্মড ব্যাচেলার—চিরকুমার।' বলে আবার চলতে শুরু করলেন।

বেশি দূর যেতে হল না। অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় তলায় খানিকটা গিয়ে গোটা য়েক সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতেই টালিব-টোপর দেওয়া লাল ইটের কোয়ার্টার পাওয়া গেল। জার তালা খুলে লাইট জ্বালিয়ে স্টেশন মাস্টার অমলেশকে ভেতরে ডাকলেন।

ঘরে পা দিয়েই চিরকুমারের আস্তানা কাকে বলে টেব পাওয়া গেল। এখানে ওখানে জামা-পড়-আর কালো কালো ঝুল। খুব সম্ভব তৈরি হবার পর থেকে এ ঘরের কলি ফেরানো হয় মেঝে থেকে ভ্যাপসা ঝাঁঝালো দুর্গন্ধ উঠে আসছে। কতকাল যে এখানে ঝাঁট-পাট পড়ে কে বলবে।

এ ঘরের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বিছানাটা কালো কুচকুচে, বালিশ ফুটো হয়ে তুলো বেরিয়ে ড়ছে। গোটা কয়েক নোংরা কাঁথা, একটা ধুলো কম্বল স্তূপীকৃত হয়ে আছে। বালিশের ওপর াই-করা এঁটো বাসন চোখে পড়ল, একপাটি টায়ারের স্যান্ডেলও আবিষ্কার করা গেল। র্থাৎ বিছানাটা গৌরবে যে খাবার টেবিলও তা আন্দাজ করতে কষ্ট হয় না।

এ রকম অবস্থায় একজন অতিথিকে ডেকে এনে খানিকটা যেন অপ্রতিভই হলেন স্টেশন স্টার। দ্রুত হাত চালিয়ে যতটা সম্ভব ঘরখানা পরিষ্কার এবং গোছগাছ করতে করতে ালেন, 'বানোয়ারী ব্যাটাকে বলি ঘরটা একটু সাৎ-সুতরো করে রাখবি। কে কার কথা ানে। অথচ মাস রেল-কোম্পানির মাইনে গুনবার বেলায় ঠিক আছে।'

অমলেশ অনুমান করল, বানোয়াবী স্টেশনের পোর্টার-টোর্টার হবে।

ঘরখানা খানিক ভদ্রস্থ করে অমলেশকে বসালেন স্টেশন মাস্টার। বললেন। 'খাওয়ার পারে আপনার কিন্তু ভয়ানক অসুবিধে হবে। বনোয়ারী ব্যাটা আমাব একার মতো রেঁধে খে যায়; যা ভাত-তরকারি আছে দু-জনে ভাগ করে খেতে হবে।'

খুবই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল অমলেশ, 'না-না, খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা করবেন না। রাত্তির লা দয়া করে করে থাকতে দিচ্ছেন তাই যথেষ্ট। নইলে এই অচেনা জায়গায় কোথায় যে তাম, কী-বা করতাম! তা ছাড়া কলকাতা থেকে আমি খেয়ে এসেছি।'

স্থিরদৃষ্টিতে এবার অমলেশের দিকে তাকালেন স্টেশন মাস্টার। তারপর প্রায় ধমকেই লেন, 'চালাকি করবার জায়গা পেলেন না!'

অমলেশ হকচকিয়ে গেল।

স্টেশন মাস্টার বললেন. 'এই ট্রেনটা কলকাতা থেকে সন্ধ্যের মুখে মুখে ছাড়ে; আপনি তে চান তার আগেই রাত্রের খাওয়া খেয়ে এসেছেন। দেখুন মশাই, আমার ঘরে যা খুদকুড়ো ছে যদি ভাগ-জোগ করে খেতে রাজী না থাকেন তা হলে রাত্তিরে থাকতে দিতে পারব না; পনাকে পথ দেখতে হবে।'

ভদ্রলোকের আন্তরিকতা, আতিথেয়তা মুগ্ধ করল অমলেশকে। অভিভূত স্বরে সে বলল, াপনি যখন আদর করে খাওয়াতে চাইছেন নিশ্চয়ই খাব।'

চক্ষেব পলকে আসনের অভাবে খবরের কাগজ পেতে থালায় ভাত-টাত বেড়ে খাও ব্যবস্থা করে ফেললেন স্টেশন মাস্টার। অমলেশকে ডেকে বসিয়ে খেতে শুরু করলেন।

খেতে খেতে স্টেশন মাস্টাব হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ভাল কথা, এতক্ষণ ধরে বকবক ক অথচ আপনার নামটাই আমার জানা হয়নি।'

নাম বলল অমলেশ।

'আপনি তো তখন বলছিলেন এখানে প্রথম এলেন, এ জায়গা আপনার অচেনা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় থাকেন আপনি?'

কোথায় থাকে অমলেশ জানাল।

অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'বোম্বাই থেকে এখানে আসছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

একটু চুপ। তারপর স্টেশন মাস্টারই আবার শুরু করলেন, 'এখানে কি কোন দরক এসেছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অমলেশ ঘাড় কাত করল।

'যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি। দরকারটা কী?'

'একজনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'অচেনা জায়গায় বর্ষা মাথায় নিয়ে এত বাত্তিরে আপনার অ উচিত হয় নি; বেলাবেলি এলে ভাল করতেন। নেহাত আমার কাছে এসেছিলেন; নই আপনাকে মুশকিলে পড়তে হত।'

ভদ্রলোক যা বলেছেন তার ভেতর ফাঁক নেই। কৈফিয়তের সুরে অমলেশ বলল, 'আপ ঠিকই বলেছেন। কী যে হল, ঝোঁকেব মাথায় বেরিয়ে পড়লাম—'

'ইয়ং ম্যান, ঝোঁকেব মাথায় বেরুনো আশ্চর্য নয়।' স্টেশন মাস্টার হাসলেন, 'সে যাক বীজপুরে কাব সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?'

নরেন্দুদের ঠিকানা মনে ছিল, তার বাবার নামটাও। অমলেশ বলল, 'নতুন পাড়ায় মহীতো চ্যাটার্জির সঙ্গে।'

'মহীতোষ চ্যাটার্জি!' স্টেশন মাস্টারের গলাব স্বর চমকে গেল, চোখের তারা দুটো কে যেন অলৌকিক দেখাল।

অমলেশের স্নায়ুগুলো ইতিমধ্যে চকিত হয়ে উঠেছে; স্থির নিষ্পলক তাকিয়ে রইল ে

স্টেশন মাস্টার স্বর বদলে এবার যতটা সম্ভব সহজ করে তুলতে চেষ্টা করলেন, 'মহীতো চ্যাটার্জি আপনাব কেউ হয় নাকি?'

চোখকান বুজে মিথ্যেই বলল অমলেশ, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আত্মীয়।'

'আত্মীয়!' স্টেশন মাস্টারের দৃষ্টি প্রখর হল, 'কিন্তু আপনারা তো বোস—কায়স্থ! ম মহীতোষ বাবুরা বামুন। আত্মীয় কিরকম?'

এ রকম তোপের মুখে পড়তে হবে, কে ভেবেছিল। হকচকিয়ে তাড়াতাড়ি অমলেশ ব উঠল, 'আত্মীয় ঠিক না, আত্মীয়ের মতো। এক দেশে বাড়ি—'

'আপনিও পাকিস্তানের লোক তাহলে—'

আদি নিবাস অবশ্য একদা পূর্ববাঙলাতেই ছিল। জেলাটাও মনে আছে—ঢাকা। গ্র গ্রামের নাম কবেই ভুলে গেছে অমলেশ। জিন্না সাহেবের মাথায় পাকিস্তান সৃষ্টির পরিক

স্ফুরিত হবার আগে আগেই তারা সে দেশ ছেড়ে চলে এসেছে। দু-পুরুষ বোম্বাইতে প্রবাসী, াসলে অমলেশরা পূর্ব-বাঙলার মানুষ, পাকিস্তানের না।

গা থেকে ঢাকা জেলার গন্ধ কবেই ঘুচে গেছে। তবু তার ক্ষীণ রেশটুকু ধরে অমলেশ লল, 'তা বলতে পারেন।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ ঘাড় গুঁজে একদমে অনেকগুলো গ্রাস মুখে পুরলেন স্টেশন মাস্টার। াবপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, 'বাড়ি একখানা বটে।'

স্টেশন মাস্টার কী বলতে চান বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অমলেশ।

অমলেশের মনের কথা বুঝি-বা পড়তে পারলেন তিনি। বলে উঠলেন, 'ঐ মহীতোষ টুজ্জেদেব কথা বলছিলাম। বীজপুরেব মার্কামারা বাড়ি মশাই।'

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, তাব আগেই স্টেশন মাস্টাব আবার বললেন, 'মহীতোষ টুজ্যের ছেলেমেয়েগুলো এক-একটি রত্ন। হীরে-চুনি-পান্না---একটি তো আবার সাগর-ছেঁচা ক্তো। সেটাকে তো পুলিশ এই জেলা থেকেই বাব করে দিয়েছিল। বোম্বাই না কোন চুলোয় ায়ে আছে? আপনার দেশের লোক, আত্মীয়ের মতো। তবু বলব, ছেলেমেয়েগুলো বীজপুরের ড় একেবারে ভাজা-ভাজা করে দিচ্ছে।'

নিন্দা অথবা স্তুতি, স্টেশন-মাস্টার কোন্ সুরে কথা বলছেন—অনায়াসেই টের পাওয়া চ্ছে। সাগর-ছেঁচা মুক্তো যাব উপমা সে যে নবেন্দু, তাতে সন্দেহ কি; এই জেলা যে তার ক্ষে নিষিদ্ধ দেশ সেকথা অমলেশেব অজানা নেই; কথায় কথায় নবেন্দু একদিন তা জানিয়েছিল।

একটু কী চিন্তা করে স্টেশন মাস্টার বললেন, 'আপনি আত্মীয়ের মতো তো; তা কতকাল ব ওদেব সঙ্গে দেখা হচ্ছে?'

এক নবেন্দু ছাড়া আগে আর কারোকেই যে দেখে নি, এই বাত্রিবেলা মহীতোষ চাটুজ্জেদের দি সারি সাবি তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেওযা হয় আদৌ চিনতে পারবে না অমলেশ---এত াত্মীয়তা ঘোষণার পর সে কথা বলতে বাধল। শিথিল সুরে সে জানাল, 'অনেকদিন পব।'

'কাল সকালবেলা উঠে ওখানে যাচ্ছেন তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'মন আগে থেকে খিচড়ে দিতে চাই না, তবু মশাই চোখ-কান একটু মেলে রাখবেন।'

অমলেশ বলল, 'সকালে ওদের সঙ্গে দেখা করেই আমি কলকাতা ফিরে যাব; সেখান থকে বোম্বাই। একটা বিশেষ দরকারে এসেছি, সেটা মিটতে কতক্ষণ আর লাগবে। ঘণ্টাখানেক, ন্টা-দুয়েকের বেশি আমি ওখানে থাকব না।'

স্টেশন মাস্টাব একটু অবাক হলেন, 'মাত্র দু'ঘণ্টার জন্য আপনি বোম্বাই থেকে এতদূরে ুট এসেছেন।'

'তা একরকম বলতে পারেন।'

স্টেশন মাস্টার একদৃষ্টে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অমলেশকে দেখলেন; এ প্রসঙ্গে আর কিছু জ্ঞেস করলেন না।

একসময় খাওয়ার পালা চুকল। একটা তক্তাপোষ ছিলই; তার তলা থেকে স্টেশন মাস্টার কখানা ক্যাম্পখাট বার করে পাতলেন। ক্ষিপ্রহাতে যতখানি সম্ভব পরিপাটি করে বিছানা ছিয়ে দিলেন, মশারি টাঙালেন, টাঙানো-ফাঙানো হয়ে গেলে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, 'ব্যাচেলার হিসেবে মোটামুটি মন্দ হয়নি ক বলেন?'

'নিশ্চয়ই।' হেসে ফেলল অমলেশ, 'ম্যারেডরা এর চাইতে ভাল পারত কিনা সন্দে আছে।'

সকৌতুকে জোরে জোবে হেসে উঠলেন স্টেশন মাস্টার, 'সার্টিফিকেট দিচ্ছেন?'

'হাজাব বাব।'

'নিন, এবার শুয়ে পড়ুন । ঢের রাত হয়ে গেছে।'

সাবাদেহে দিন তিনের অবসাদ মাখা। শোবার কথা শোনামাত্র আর দাঁড়াল না অমলেশ মশাবির ভেতর ঢুকে তক্ষুনি বিছানায নিজেকে সঁপে দিল। আব স্টেশন মাস্টারও চটপ নিজের মশারি টাঙিযে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। অন্ধকারে টেব পেল অমলেশ, তুড়ি দিয়ে হাই তুলছেন ভদ্রলোক। তুড়ি বাজানো ও হাই তোলা শেষ হলে বললেন, রাত্তিরে আ ডাকাডাকি করবেন না মশাই; সমস্ত দিন তো আর বিছানায় গা ঠেকাবার জো নেই। রা বারোটায় শোওয়া; আবার ভোরবেলা উঠেই বাসি মুখে কলকাতার ফার্স্ট ট্রেন পার করাে হবে।' বলতে বলতে স্বরটা ক্রমশ শিথিল হয়ে হয়ে বুজে গেল। একটু পর নাকের ডাক শো গেল; অমলেশ বুঝল স্টেশন মাস্টারের চেতনার শেষ অন্তরীপটিও অতল ঘুমে নিমজ্জি হয়ে গেছে।

বাইরে বৃষ্টি বোধহয় ধরে গেছে। কিংবা পড়লেও খুব জোরে না, টিপ-টিপি ফিসফিসিয়ে প্রায় নিঃশব্দেই ঝরছে। টালির চালে ঝমঝমানি নেই, কোথায় কোন্ ঝোপে আড়ালে ঝিঁঝি ডাকছে। একটানা অক্লান্ত সেই ঝিল্লিস্বর যেন পৃথিবীর নিভৃত গুহায়ি বিলাপের মতো।

শরীরময় ক্লান্তি, বর্ষার রাত, অন্ধকার—আযোজনের ত্রুটি ছিল না। পরিপাটি একা ঘুমই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু ঘুমোতে পারল না অমলেশ। আজ সারাদিনের ঘটনাগুলিই ঘু ঘুরে মনে পড়ছে। বোম্বাই থেকে কলকাতায আসা, বীজপুরগামী ট্রেনের কামরায় সে রহস্যময়ী মেয়েটি—যার নামধাম অজানা, পুলিশের হানা, স্টেশন মাস্টার, তাঁ আতিথেয়তা—নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল পড়াব মতো ছোট-বড় অনেকগুলো ঢেউ তুলে কিছুক্ষ অমলেশকে দুলিয়ে গেল। তারপব তবঙ্গ যখন থামল সেই সময় নবেন্দুর কথা মনে প গেল অমলেশের।

নবেন্দু . এই ছেলেটির জন্যই আরব সাগরের কূল থেকে এতদূরে বঙ্গোপসাগরের পা অমলেশের ছুটে আসা। তার মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে এসেছে অমলেশ, আর এসেছে তার কয়েকা কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করতে।

নবেন্দুর সঙ্গে কোন কালে যোগাযোগ হবে, এমন সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। প্রথমত দু পুরুষ অমলেশরা বোম্বাইতে আছে, বাঙলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক কবেই ছিন্ন হয়ে গেছে বাঙলাদেশেব অথবা বাঙালি সম্বন্ধে এতটুকু মোহও আর অমলেশের প্রাণে অবশিষ্ট নেই তাছাড়া নবেন্দু এবং অমলেশেব যে জীবন তার মাঝখানে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুর দূরত্ব জগতের আলোকিত রাজপথের পথিক অমলেশ। তার পেছন দিকে যে অন্ধকার পাতালে অলিগলি সেইখানে বুকে হেঁটে হেঁটে সরীসৃপের মতো নবেন্দুর চলাফেরা।

কোনদিক থেকেই তাব সঙ্গে অমলেশের মিল নেই। নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে আজকে যে সুশৃঙ্খল সভ্য ভদ্র জীবনের সৃষ্টি, অমলেশ তাকে ঠেলে ঠেলে সামনের দিকে এগিয়ে নি চলেছে। সুবোধ বালকটি হয়ে পড়াশুনার পালা শেষ করেছে, এখন ভাল চাকরি-বাকরি কে ভাল মাইনে পায়। পার্টি-ফার্টিতে একটু-আধটু ড্রিঙ্ক করে, কিন্তু মাতাল হয় না। সিগারেটে

অভ্যেস আছে। নিখুঁত ব্যাকরণসম্মত ভদ্রলোক বলতে যা, অমলেশ তা-ই। মোটামুটি সুখী, সচ্ছল এবং পরিতৃপ্ত। বিয়েটা এখনও করে উঠতে পারে নি; ওটা চুকে গেলেই ষোলকলা পূর্ণ হত। আর নবেন্দু? অমলেশের স্বভাবে যা যা আছে তার বিপরীত ধাতুতে নবেন্দুর স্বভাবটি তৈরি। পুলিশের খাতায় কত জায়গায় কত ভাবে যে তার নাম লেখা, হিসেব নেই। সে স্মাগলার, ওয়াগনব্রেকার! প্রায়ই মদে চুর-চুর হয়ে নবেন্দু ভদ্রপল্লীর শান্তি নষ্ট করে যায়! নানা ব্যাপারে পুলিশ তার পেছনে নিয়ত লেগেই আছে। মাপ-জোপ-করা সুস্থ জীবনের পক্ষে সে অশুভ ঘৃণার মূর্তি। তার নাম উচ্চারণ করতে গেলে ঠোঁট এবং চোখ কুঁচকে যাবার কথা।

যে কক্ষপথে অমলেশের মতো শান্ত স্তিমিত মানুষের চলাফেরা সেখানে নবেন্দুর মতো উল্কারা আসে না। তবু তার সঙ্গে অমলেশের আলাপ হয়েছিল, এবং কিছুটা অন্তরঙ্গতাও।

আলাপটা খুবই আকস্মিক; বলা যায় অভাবিতই। বোম্বাইয়ের শহরতলিতে যেখানে অমলেশদের বাড়ি সেই জায়গাটার নাম যোগেশ্বরী। যোগেশ্বরী থানার অফিসার-ইনচার্জ বিজয় ফালকে অমলেশের প্রতিবেশী। ছেলেবেলা থেকেই একসঙ্গে বড় হয়েছে, এক স্কুলে এক কলেজে পড়েছে। সে অমলেশের ছেলেবেলার বন্ধু, সহচর।

ছুটির দিনে তো বটেই, সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতেও থানায় গিয়ে বিজয়ের সঙ্গে গল্প-টল্প করে অমলেশ। চা-পকৌড়া আর ভেলপুরীতে আড্ডা জমে ওঠে।

সে দিনটা ছিল রবিবার। যথারীতি থানায় গেছে অমলেশ। বিজয়ের ঘরে পা দিয়েই টের পেল সে বেশ উত্তেজিত, থানার আবহাওয়া রীতিমতো উত্তপ্ত।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে অমলেশ বলেছিল, 'কী ব্যাপার রে?'

বিজয় বলেছিল, 'আর বলিস না, ব্যাটা মারাত্মক হয়রান করে শেষে ধরা দিয়েছে।'

'কার কথা বলছিস?'

'একটা ওয়াগন-ব্রেকার; হারামজাদা যেন ভেলকি জানে। চক্ষের পলকে বড় বড় বগিগুলো খুলে মাল লোপাট করে দেয়।' বিজয় বলে যাচ্ছিল, 'ওর অপারেশনের এরিয়া হচ্ছে আন্ধেরীর কাছে। রেল-পুলিশ আর কিছুতেই পেরে উঠছিল না, কখন যে চোখে ধুলো ছিটিয়ে কাজ হাসিল করে যেত টেরও পাওয়া যেত না। না পেরে রেল-পুলিশ শেষ পর্যন্ত আমার হেল্প চেয়েছিল। কাল রাত থেকে ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম, আজ ভোরে ধরেছি। ধরা পড়বার আগে তিনটে পুলিশকে জখম করেছে।'

অমলেশ চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল, কিছু বলে নি।

বিজয় আবার বলে উঠেছিল, 'গুণধর! বুঝলি, সারা ইন্ডিয়ায় এমন মহাপুরুষ দু চারটির বেশি পাওয়া যাবে না। ওয়াগন ভাঙায় সাফ হাত, মদ যা চোলাই করে তাতে বিদেশী ডিস্টিলারিগুলো ফেল পড়ে যাবে। তার ওপর আফিম-স্মাগলার। বন্দুকবাজি, পিস্তলবাজিতে মহা ওস্তাদ—'

এতক্ষণে অমলেশের গলার স্বর ফুটেছিল, 'সত্যিই গুণধর তো—'

'এতদিন ক্যালকাটা জ্বালিয়ে খেয়েছে, এখন বোম্বাইতে এসেছে আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত করতে।'

'ক্যালকাটা জ্বালিয়ে খেয়েছে, মানে—'

মাথা দুলিয়ে অমলেশের কথার অনুচ্চারিত অংশটা পূরণ করে দিয়েছিল বিজয়, 'ইয়েস ব্রাদার, মহাপুরুষটি বাঙালি—তোমারই দেশোয়ালী—'

কিছুটা কৌতূহলী হয়েছিল অমলেশ, 'কী নাম?'

'নবেন্দু—নবেন্দু চ্যাটার্জি।'

নামটা যে সত্যই বাঙালি, সন্দেহ কি। অমলেশ চুপ করে থেকেছে।

চোখের তারায় কেমন যেন নাচন দিয়ে বিজয় বলেছিল, 'তোর জাতভাই, মহাপুরুষটিকে একবার দেখবি নাকি?'

বাঙালির নামে অমলেশের প্রাণ উথলে ওঠে না; বাঙলাদেশ অমলেশের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের কোন অনাবিষ্কৃত দ্বীপের মতো। তবু কী যে প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল অমলেশের স্নায়ুতে, খুব আস্তে বলেছিল, 'দেখব।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'লোকটা কোথায়?'

'এখানেই আছে, লক আপে। আয়—'

থানার একেবারে মাঝখানে সুরক্ষিত লোহার খাঁচাটার সামনে বিজয় অমলেশকে নিয়ে গিয়েছিল। ভেতরে চার-পাঁচটি লোক বসে ছিল। এক পলকেই বোঝা যায় ওরা সমাজের পচনশীল গলিত অংশ, দাগধরা অপরাধী দল। একজন অবশ্য শুয়ে ছিল, মুখ দেখা যাচ্ছিল না, কেন না তার দুই হাত মুখের ওপর আড়াআড়ি নিবদ্ধ। যে শুয়েছিল বিজয় তাকেই ডেকেছিল, 'এ্যাই—এদিকে এস—'

ঘুমোয় নি, ডাকামাত্র সে উঠে পড়েছিল। তারপর পায়ে পায়ে গরাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার দু-চোখে প্রশ্ন, কিছুটা বা বিমূঢ়তা। স্বয়ং অফিসার-ইন-চার্জ কেন তার কাছে এসেছেন, বোধহয় বুঝে উঠতে পারছিল না।

অন্য যে সব কয়েদী লক-আপের ভেতর বসে ছিল, তাদের সঙ্গে এর কোন মিলই নেই। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের মধ্যেই; নিখুঁত কামানো মুখ, চোখ দুটিতে কিশোর-সুলভ সারল্য, চওড়া কপাল, গায়ের রং টকটকে ফর্সা। দীর্ঘ সুপুরুষ একটি যুবক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

চোখ দুটো অবশ্য আরক্ত; সেটা সম্ভবত বিনা ঘুমে রাত কাটাবার জন্য। কুচকুচে কালো চমৎকার চুলগুলো ধুলোয় ধূসর—ওটা হাজতের নোংরা মেঝেতে শুয়ে থাকার ফলাফল। বিজয় তার সম্বন্ধে যেসব কিংবদন্তী শুনিয়েছে সেগুলোর কোনটাই এই ছেলেটির দিকে তাকালে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। বরং তাকে ঘিরে নিষ্পাপ এক শুচিতা রয়েছে।

বিজয় বলেছিল, 'এই সেই মহাত্মা; দেখে নয়ন ধন্য কর।'

অমলেশ উত্তর দেয় নি।

বিজয় আবার কী বলতে যাচ্ছিল সেই সময় একটা কনেস্টবল এসে খবর দিয়েছে, কে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিজয় বলেছিল, 'ইচ্ছে করলে তুই কথাবার্তা বলতে পারিস, দেখি কে আবার কোন্ ঝামেলা এসেছে।' বাধিয়ে সে চলে গিয়েছিল।

ছেলেটি অমলেশের চাইতে ছোটই হবে। বিজয় চলে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল অমলেশ। তারপর বলেছিল, 'তোমার নাম আমি জানি।'

বিজয়ের সঙ্গে অমলেশ মারাঠীতেই কথা বলেছিল। ছেলেটির সঙ্গে কিন্তু খাঁটি মাতৃভাষাতেই বলেছে। অমলেশ লক্ষ্য করেছে, তার দু চোখ চকচকিয়ে উঠেছে। গলার স্বর খুশি এবং বিস্ময় মিশিয়ে সে বলে উঠেছিল, 'আপনি বাঙালি?'

'হ্যাঁ। তবে—'

'তবে কী?'

'বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা নেই; দু-পুরুষ আমরা বোম্বাইতে আছি।'

ছেলেটি অর্থাৎ নবেন্দু বলেছিল, 'আপনার কথা শুনলে কিন্তু তা মনে হয় না। আমাদেরই মতোই পরিষ্কাব বাঙলা বলেন, একটুও জড়তা নেই।'

অমলেশ বলেছিল, 'বাড়িতে আমরা মাতৃভাষাতেই কথাবার্তা বলে থাকি। ঐ ভাষাটা ছাড়া বাঙলাদেশের সঙ্গে আর সব সম্পর্কই ঘুচে গেছে। সে যাক, এই থানার অফিসার-ইন-চার্জ আমার বিশেষ বন্ধু।'

'তাই মনে হল।' নবেন্দু হেসেছিল।

'তোমার সম্বন্ধে ও আমাকে বলছিল—'

'কি বলছিল?'

নবেন্দু সম্বন্ধে বিজয় যে সব ভয়াবহ তথ্য সরববাহ কবেছিল, মুখেব ওপর তা বলে ফেলতে পারে নি অমলেশ। চেহারা যার চমৎকার, চোখ দুটি শিশুসুলভ সরলতা দিয়ে ঘেরা তাকে ওসব কথা বলতে অমলেশের বেধেছে। শুধু বলছিল, 'নানারকম খারাপ কথা বলেছে।'

'আপনি দেখছি পারফেক্ট জেন্টেলম্যান। অন্যে কষ্ট পায়, এরকম কথা উচ্চারণও করতে পারেন না।' নবেন্দুর মুখে হাসির আভাটি লেগেই ছিল।

এবার আর উত্তর দেয় নি অমলেশ।

নবেন্দু আবার বলেছিল, 'অফিসার যা বলেছেন তা তো আপনি বলতে পারলেন না, আমিই বলছি। নিশ্চয়ই উনি বলেছেন—আমি ওয়াগন-ব্রেকার, স্মাগলার, দাঙ্গাবাজ। তাই না?'

ঘাড় কাত করে অমলেশ জানিয়েছে, তাই।

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর অমলেশ বলেছিল, 'কথাগুলো কি সত্যি?'

অমলেশের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে নবেন্দু বলেছিল, 'মিথ্যে হবার কারণ তো নেই।'

'অনেক সময় পুলিশ ভুলও তো করে। রামকে ধরতে শ্যামকে ধরেছে, এমন তো বেশ কয়েকটাই আমার জানা আছে।'

হঠাৎ জোরে জোরে সকৌতুকে হেসে উঠেছিল নবেন্দু।

অমলেশ বিমূঢ়, 'হাসছ যে?'

হাসতে হাসতেই নবেন্দু বলেছিল, 'আমার বেলা পুলিশের ভুল হয় নি। আপনার বন্ধু আমার সম্বন্ধে যা-যা বলেছেন সেগুলো ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা সত্যি। আসলে ব্যাপারটা কী জানেন?'

সে ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল অমলেশ। নবেন্দু বলেছিল, 'আমাকে দেখে লোকে ভুল করে।'

অমলেশ তাকিয়েই ছিল।

নিজের বুকে একটা আঙুল রেখে নবেন্দু আবার বলেছিল, 'আমার চেহারাটা খুব ডিসেপটিভ, মারাত্মক রকমের প্রতারক। আমাকে দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না যে কারো গায়ে সামান্য টোকাটুকু পর্যন্ত দিতে পারি। এই চেহারার জোরে কত অন্যায় করে কতবার যে পুলিশের চোখে ধুলো ছিটোতে পেরেছি হিসেব নেই তা ছাড়া—'

'কী?'

'বাঙলাদেশের সঙ্গে আপনার সব সম্পর্ক ঘুচে গেছে বলছিলেন না? কথাটা কিন্তু ঠিক না।'

'কি রকম?'

'মনে মনে বাঙলাদেশ আর বাঙালির জন্য আপনার রীতিমতো টান আছে। নইলে অফিসার-ইন-চার্জ আপনার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও আমার সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি।'

হেসে ফেলেছিল অমলেশ, 'তা হবে।'

একটু চুপ। তারপর আবার অমলেশ বলেছিল, 'কতদূর পড়াশুনা করেছ?'

'বি এ. পর্যন্ত। ফাইনাল পরীক্ষাটা আর দেওয়া হয় নি, তার আগেই আমাদের সর্বনাশ হল। আমার লেখাপড়ার পাটও চুকল।'

একটু ভেবে অমলেশ বলেছিল, 'লেখাপড়া জান, দেখতে শুনতে চমৎকার, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে ঐ সব স্মাগলিং ওয়াগান-ব্রেকিংয়ের মতো নোংরা কাজ কর কেন?'

চোখের তারায় মুহূর্তের জন্য কী যেন ঝলসে গিয়েছিল নবেন্দুর। তারপর সে পাল্টা প্রশ্ন করেছিল, 'কতকাল আপনি বাঙলাদেশে যান নি?'

'অনেক কাল, নাইনটিন ফরটি ফাইভের শেষের দিকে লাস্ট গিয়েছিলাম। সেই লাস্ট, সেই ফার্স্ট। কেন?'

'তাহলে আপনি বুঝবেন না।'

'কী বুঝব না?'

বিষণ্ণ অন্যমনস্ক সুরে নবেন্দু বলেছিল, 'কেন আমি নরকের খাতায় নাম লিখিয়েছি? এখনকার বাঙলাদেশ যারা দেখে নি তাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না।'

'এখনকার বাঙলাদেশে কী আছে?'

নবেন্দু কী একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিল তার আগেই একটা কনস্টেবল এসে হাজিব। ব্যাপার কি? না অফিস-ঘরে কফি আর পকৌড়া জুড়িয়ে যাচ্ছে। অফিসার-ইন-চার্জের জরুরী তলব, এখুনি যেতে হবে।

অমলেশ এবার নবেন্দুকে বলেছিল, 'চলি। পরে আবার দেখা হবে।'

'আচ্ছা।'

অফিস-ঘরে ফিরে আসতেই বিজয় হেসেছিল, 'খুব জমে গিয়েছিলি মনে হচ্ছে। দেশোয়ালী আর কি সাধে বলে।'

উত্তর না দিয়ে অমলেশ কফির কাপে চুমুক দিয়েছিল।

বিজয় জিজ্ঞেস করেছিল, 'তারপর দেব-শিশুটিকে কি রকম দেখলি?'

খুব আস্তে মৃদু গলায় অমলেশ উত্তর দিয়েছিল, 'মন্দ কি।'

কেমন চোখ পিট পিট করতে শুরু করেছিল বিজয়েব।

'লেখাপড়া-জানা ছেলে, বি. এ. পর্যন্ত পড়েছে, কথায়-বার্তায় মার্জিত—'

অমলেশের বক্তব্য শেষ হবার আগেই বিজয় বলে উঠেছিল, 'ক' মিনিটের আলাপেই ভিজিয়ে ফেলেছে, দেখছি। কিন্তু একটা কথা মনে রেখো ব্রাদাব, পৃথিবীতে ওর চাইতে ঢের ঢের বেশি শিক্ষিত, ঢের ঢের ভাল চেহারার ক্রিমিনাল নানা দেশের ক্রাইম রিপোর্ট খুঁজলে পাওয়া যাবে।'

খানিক দ্বিধান্বিত সুরে অমলেশ বলেছিল, 'তা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ছেলেটার ব্যাপারে আমার কী মনে হয় জানিস?'

'কী?'

'এ বর্ন ক্রিমিনাল নয়।'

চোখ কুঁচকে গিয়েছিল বিজয়ের, কিছু বলে নি।

অমলেশ বলেছিল, 'নানা রকম অ্যাডভার্স অবস্থা আর অভাব ওকে খারাপ করে দিয়েছে।'

কণ্ঠস্বরে কাঁপন তুলে বিজয় বলেছিল, 'কি রকম কি রকম গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু ব্রাদার, অভাবে পড়লেই যদি মানুষ ক্রিমিনাল হয়ে যায় তবে দুনিয়ায় একটি সৎ লোকেরও অস্তিত্ব থাকবে না। ওটা কোন যুক্তির কথা নয়।'

থতমত খেয়ে গিয়েছিল অমলেশ, 'না না, সে কথা আমি বলিনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ছেলেটার ভেতর কোথায় যেন খানিকটা ভালত্ব এখনও আছে। সুযোগ-সুবিধে পেলে হয়তো ও সুস্থ ভদ্র জীবনে ফিরে আসতে পারে।'

ঠোঁটে কামড় দিয়ে আবার হেসেছিল বিজয়, 'বুঝেছি--'

'কী?'

'জাত-ভাইয়ের জন্যে প্রাণ-কিঞ্চিৎ কেঁদে উঠেছে।'

অমলেশ বিরক্ত হয়েছিল। ঝাঁঝালো উষ্ণ গলায় বলেছিল, 'তুই একটা কথা তখন থেকে বার বার বলে যাচ্ছিস। জাতভাই--এর মানে কী?'

বিজয় বলেছিল, 'আহা চটিস কেন? একটু ঠাট্টা করছিলাম, তাতেই ক্ষেপে যাচ্ছিস সে।'

উত্তর না দিয়ে ঘাড় গোঁজ করে কফির পেয়ালায় ধ্যান-জ্ঞান সঁপে দিয়েছিল অমলেশ। কফি-পকৌড়ার পালা শেষ হলে বলেছিল, 'আচ্ছা বিজয়--'

'বল—'

'ঐ ছেলেটা মানে নবেন্দু যা করেছে তাতে ক'দিনের জেল-টেল হতে পারে?'

নিঃশব্দে ইঙ্গিতময় হেসে বিজয় বলেছিল, 'তা বছর দুয়েক তো নির্ঘাত, তার বেশি হওয়াই সম্ভব। কিন্তু ব্যাপার কি, ওর কথা যে ভুলতেই পারছিস না।'

বিজয়ের কথার শেষের দিকে মৃদু একটা খোঁচা ছিল, গায়ে মাখেনি অমলেশ। লক্ষ্য করেছে এবার আর সে 'জাত-ভাই' বা 'দেশোয়ালী'—কোনটাই বলে নি, এতেই অমলেশ খুশি হয়েছিল।

যাই হোক, সেদিন আড্ডা আর তেমন জমে নি। কিছুক্ষণ এলোমেলো অসংলগ্ন গল্প করে উঠে পড়েছিল অমলেশ।

তারপর দু-তিনটে দিন কেটে গেছে। কিন্তু অমলেশ কিছুতেই নবেন্দুকে ভুলতে পারছিল না। বার বার ঘুরে ঘুরে সে অমলেশের স্মৃতিতে হানা দিয়ে যাচ্ছিল।

দুনিয়ার আইন-আদালত আর সভ্য-ভদ্র মার্জিত জীবনের প্রতিষ্ঠা করে অতীতের কোন্ কুয়াশাবিলীন তারিখে, অমলেশের জানা নেই। তবে সেই প্রথম দিনটি থেকে হাজার হাজার মানুষ অপরাধী প্রমাণিত হয়েছে, হাজতবাস করেছে জেল খেটেছে। আরও কত রকম শাস্তি যে পেয়েছে তার হিসেব নেই। অপরাধ ও শাস্তি সমান্তরাল রেখায় যুগ-যুগান্ত ধরে রয়েছে। যতদিন মানুষের প্রাণে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনের তৃষ্ণা আছে ততদিন ও দুটো থাকবে।

পৃথিবীতে কত অপরাধীই তো আছে কিন্তু নবেন্দুকে ভুলতে পারছে না কেন অমলেশ? সমাজের দাগ ধরা গলিত অংশের একজনকে কেনই বা অমলেশের স্মৃতি প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে? তবে কি বারশ' মাইল দূরে দু-পুরুষ বাস করেও বাঙলাদেশকে সত্যিই ভুলতে পারে নি অমলেশ? অমলেশ জানত না, কিন্তু সে বুঝি ছিল অমলেশের সত্তার ভেতর, ছিল হৃৎপিণ্ডের কোন নিভৃত প্রান্তে গোপন হয়ে। নবেন্দুকে দেখার পর ফোয়ারা হয়ে সে হয়তো ফুটে বেরিয়েছে।

দিন তিনেক পর থানায় গিয়ে অমলেশ বিজয়কে বলেছিল, 'আমার একটা অনুরোধ রাখতে হবে।'

অমলেশের স্বরে এমন কিছু ছিল যে অবাক চোখে বিজয় তাকিয়েছিল, 'কী ব্যাপার অমল?'

'ছেলেটাকে তুই ছেড়ে দে।'

বিজয় হয়তো ভুলে গিয়ে থাকবে। বলেছিল, 'কার কথা বলছিস?'

'নবেন্দুর।'

'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? তার বিরুদ্ধে মারাত্মক মারাত্মক অভিযোগ আছে। তা ছাড়া ব্যাপারটা আমার হাতের বাইরে চলে গেছে।'

'কি রকম?'

'হাজতে তো কারোকে চব্বিশ ঘণ্টার বেশি আটকে রাখা যায় না, কোর্টে প্রডিউস করতে হয়। নবেন্দুব বিরুদ্ধে চার্জ তৈরি করে অলরেডি ওকে কোর্টে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

অমলেশ বলেছিল, 'দ্যাখ, কেস-টেস সাজানো সব নির্ভর করছে তোর ওপব; তুই ইচ্ছা কবলে ওকে বাঁচিয়ে দিতে পারিস।'

বিজয়কে চিন্তান্বিত দেখিয়েছিল। সে বলেছিল 'কিন্তু এ তো বে-আইনি; যখন জানি ছেলেটা সত্যিকারের অপরাধী—'

নিজের মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল, অমলেশ স্পষ্ট করে বলতে পারবে না। বিজয়ের দু-হাত ধরে বলেছিল, কোনদিন এ জাতীয় ব্যাপারে তোকে অনুবোধ কবি নি, কববও না। কিন্তু এই ছেলেটাকে তোকে বাঁচিয়ে দিতে হবে।'

অমলেশের জেদ দেখে হয়তো বিস্মিত হয়েছিল বিজয়, হযতো স্তম্ভিত। বলেছিল, 'দ্যাখ, আমি যতদূর আইন বুঝি শাস্তি ওর হবেই এবং হওয়া উচিত। আদালত ওকে ছাড়বে বলে মনে হয় না। কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'

'কী কথা?'

'নবেন্দু তোর আত্মীয় না, বন্ধু না, কেউ না। তবে তার জন্য তোর এত মাথা-ব্যথা কেন?'

'সেদিন তোকে বলেছিলাম না, ছেলেটার ভেতর খানিকটা ভালত্ব এখনও রয়েছে। ওকে আমি নোংরা কদর্য জীবন থেকে ফেবাতে চেষ্টা করব।'

'আই সী, আই সী—' বিজয় জোরে হেসে উঠেছিল, 'সমাজসেবী!'

অমলেশ উত্তর দেয় নি।

বিজয় আবার বলে উঠেছিল, 'কারা যেন চোর-গুণ্ডা-ডাকাতদেব 'চেঞ্জ অব হার্ট' 'চেঞ্জ অব হার্ট' করে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছে। 'হৃদয় পরিবর্তন'ওলারা আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে একেবারে বেকার বানাতে চায়। তুই কি সেই দলে নাম লিখিয়ে এসেছিস?'

'নো ব্রাদার— '

'তবে?'

'বললামই তো, ছেলেটাকে আমি ফেরাতে চেষ্টা করব।'

'করিস।' নাক কুঁচকে কেমন করে যেন বলেছিল বিজয়।

অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'নাক কোঁচকালি যে?'

'তোকে চিনি কিনা তাই।' বিজয় হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তোর মাথায় মাঝে মাঝে পোকা নড়ে ওঠে।'

কথাটা মিথ্যে নয়। মানুষ হিসেবে অমলেশ প্রায় গোটাটাই আবেগপ্রবণ। কোনো কিছু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার মতো পর্যাপ্ত ধৈর্য অমলেশের নেই। যে কোন ব্যাপারে নিমেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। সব সময় ঝাঁপ দেবার জন্য যেন উন্মুখ হয়েই আছে; যখন যে স্রোত এসে পড়ে তাতেই গা ভাসিয়ে দেয়।

অমলেশ বলেছিল, 'এবার পোকা নড়ে নি।'

বিজয় বলেছিল, 'তা হলে ব্যাপারটা সিরিয়াসলিই নিয়েছিস?'

'নিশ্চয়ই।'

'দেখা যাক।'

তার অনুরোধ এবং জেদে কতখানি কাজ হয়েছিল অমলেশ বলতে পারবে না। পুলিশের তরফ থেকে বিজয়ের কোন কারসাজি ছিল কি না, তাও অমলেশের অজানা। প্রথম দিন বিজয় যে বলেছিল, নবেন্দুর দু বছরের কারাবাস একেবারে অবধারিত, সেটা কিন্তু হয় নি। তার বদলে মোটে তিন মাস জেল হয়েছিল ।

কোর্টে নবেন্দুর কেস যখন চলছিল তখন অমলেশ প্রায়ই যেত। কিন্তু কি আশ্চর্য, ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বেরুবার পর যখন সে জেলে চলে গেল, তার কথা আর মনে রইল না। পাতালের অন্ধকার থেকে নবেন্দুকে বার করে এনে তার হাতে সৎ শুদ্ধ জীবনের সনদ তুলে দেবে বলে একদা গলা ফাটিয়ে অমলেশ ঘোষণা করেছিল। সে কথা বেমালুম ভুলে গেল সে। বোম্বাই শহরের হাজারটা স্রোত ততদিনে অমলেশকে আরো নানা দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

বিজয় যে বলেছিল, পোকা নড়ে ওঠা—কথাটা ষোল আনার জায়গায় আঠারো আনা সত্যি। এই হচ্ছে অমলেশের স্বভাব।

যাই হোক, তিন মাস পর জেল থেকে বেরিয়ে সোজা অমলেশের বাড়ি চলে এসেছিল নবেন্দু। সেটা ছুটির দিন না, তবু অমলেশ বাড়িতেই ছিল। ক্যাজুয়েল লিভের কয়েকটা দিন তামাদি হতে বসেছিল, অফিস কামাই করে সেগুলো উসুল করে নিচ্ছিল অমলেশ।

মনে পড়ছে সেদিন দুপুরবেলা ইজিচেয়ারে টান হয়ে বিদেশী থ্রিলারে ধ্যান-জ্ঞান সঁপে দিয়ে পড়ে ছিল সে। মারাঠী চাকরটা এসে খবর দিয়েছিল, কে একজন তার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

অমলেশ বলেছিল, 'এখানে নিয়ে আয়।'

একটু পর চাকরটা যাকে নিয়ে এসেছিল অমলেশের সুদূর কল্পনাতেও সেই মুহূর্তে তার অস্তিত্ব ছিল না। প্রায় খাড়া হয়ে বসেছিল অমলেশ, 'এ কি তুমি!'

নবেন্দু আস্তে করে বলেছিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। আজই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। তারপর সোজা আপনার কাছে চলে এলাম।'

মনে মনে খুবই বিব্রত বোধ করছিল অমলেশ, কিছুটা বা বিরক্তি, কেননা যত সহানুভূতিই থাক, নবেন্দু যে জেল-ফেরত আসামী, তার সমস্ত পরিচয়টাই যে তার অন্ধকারে লিপ্ত, সে কথা অমলেশ কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। এ ছাড়া অমলেশদের ঐ বাড়িতে যারা থাকে—অমলেশরা চার ভাই, বাবা-মা বৌদিরা—তারা সবাই জীবনের আলোকিত গৌরবময় দিকের বাসিন্দা। অমলেশের বাবা ছিলেন সিদ্ধার্থ কলেজের প্রিন্সিপাল; বছর তিনেক রিটায়ার করেছেন। বড়দা ওয়েস্টার্ন রেলের ক্লাস ওয়ান অফিসার। মেজদা অমলেশের বাবার কলেজেই অঙ্কের অধ্যাপক। ছোটদা প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি। বৌদিদের কেউ রিসার্চ করছেন, কেউ শিক্ষয়িত্রী। নবেন্দুর মতো নরকের পোকাদের ছায়া পড়লে অমলেশদের বাড়ির ভেতর দুলে ওঠার কথা।

নেহাত যখন এসেই পড়েছে কি আর করা। বিরক্তি এবং অস্বাচ্ছন্দ্য যতখানি সম্ভব গোপ করে অমলেশ বলেছিল, 'বোসো।'

নবেন্দু নিঃশব্দে সসঙ্কোচে সামনের একটা চেয়ারে বসে পড়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার ঠিকানা কোথায় পেলে?'

'থানায়।'

'কে দিয়েছে?'

'অফিসার-ইন-চার্জ।'

অফিসার-ইন-চার্জ মানে বিজয়। কেন যে সে ঠিকানাটা দিতে গেল!

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর খানিক ভেবে নিয়ে অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমার কা কী মনে করে? কিছু দরকার আছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ঘাড় কাত করেছিল নবেন্দু, 'আমি এসেছি আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাতে

'কৃতজ্ঞতা!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কেন বল তো?' অমলেশ কিছুটা অবাকই হয়েছিল।

নবেন্দু বলেছিল, 'আমার যা অপরাধ তাতে কমপক্ষে দু-তিন বছর জেল হবার কথা। খব নিয়ে জেনেছি, আপনার চেষ্টার ফলে আমার জেল খাটার মেয়াদ কমে মোটে তিন মা হয়েছে। তাতে আমার কী উপকাব যে হয়েছে বুঝিয়ে বলতে পারব না।'

জেল-খাটা একজন আসামীর কৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে অমলেশের প্রাণে আদৌ কোন মোহ নেই ব্যাপারটা আর যাই হোক, গৌববজনক নয়। তা ছাড়া অমলেশের জন্যই যে তার কাবাবাসে মেয়াদ কমেছে, এমন কোন প্রমাণ নেই।

নবেন্দু আবার বলেছিল, 'দু-তিন বছর জেলে পচলে আমাদের সংসারটা ভেসে যেত আমি এখান থেকে টাকা না পাঠালে বাড়ির হাঁড়ি চড়া বন্ধ। তিন মাস তো জেলে ছিলাম— বলতে বলতে হঠাৎ চুপ করে গিয়েছিল।

নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন বলে উঠেছিল অমলেশ, 'কে কে আছে তোমাদের সংসারে

'বাবা মা, দুটো ভাই, তিন বোন।'

'বাবা কিছু করেন?'

'কিছুই না।'

নবেন্দুর বাবার প্রসঙ্গে মুখ ফসকে আর একটা প্রশ্ন বেরিয়ে আসছিল: অমলেশ প্রাণপ সামলে নিয়েছে।

অমলেশের মনের কথাটা যেন চট করে পড়ে নিতে পেরেছিল নবেন্দু। তাড়াতাড়ি সে ব উঠেছিল, 'এখনই না হয় কিছু করেন না কিন্তু ঢাকাতে পি. ডব্লু. ডি.-তে চাকরি করতেন। বে বড় চাকরি—'

একদা কাজ করেছেন বলে এখন বসে থাকবেন, ব্যাপারটা অমলেশের কাছে যুক্তিসঙ্গ মনে হয় নি। পরক্ষণেই দ্বিতীয় একটি সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। অমলেশ জিজ্ঞে করেছিল, 'তোমার বাবার বয়স কত?'

'ষাটের মতো হবে। কিন্তু বয়সটা বড় কথা নয়। ঐ বয়সেও অনেক লোক শক্ত সম থাকে। বাবা যদি সুস্থ সবল থাকতেন—' নবেন্দুর গলার স্বর বিষণ্ণ শুনিয়েছিল, চোখের দৃ আচ্ছন্ন।

অমলেশ চকিত হয়েছিল, 'কী হয়েছে তোমার বাবা?'

ইন্ডিয়ায় আসার পর প্যারালিসিসের লক্ষণ দেখা দিল। আজ ক'বছর ধরে উনি বিছানায় ড় আছেন।'

নবেন্দুর বিষাদ আর ক্লান্তি অমলেশের মধ্যে যেন সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল। একটি শব্দই উচ্চারণ করতে পেরেছিল, 'ও—'

আবার কিছুক্ষণ চুপ। তারপর হঠাৎ একটা কথা অমলেশের মনে পড়ে গিয়েছিল এবং না । বিপজ্জনক এক ফাঁদে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল, 'ইন্ডিয়ায় আসার কথা বললে না?'

'হ্যাঁ—' নবেন্দু অমলেশের চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিল।

'তার আগে তোমরা কোথায় থাকতে? ঢাকায়?'

'হ্যাঁ।' নবেন্দু বলতে শুরু করেছিল, 'দেশ ভাগের পর অনেক লোক অপসান দিয়ে য়ায় চলে এসেছিল। বাবা কিন্তু দেশেই থেকে গেলেন। বাবার ধারণা ছিল যে জন্য টশান আর পাকিস্তান তা তো হয়েই গেছে, আর গোলমাল হবে না। কিন্তু স্বাধীনতার ধাক্কা াতে না কাটাতেই টের পাওয়া গেল বাবার ধারণাটা কত ভুল কত মিথ্যে। বোনেরা বড় ় লাগল, পাকিস্তানে থাকা আর সম্ভব হল না। চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাবা আমাদের নিয়ে য়ায় চলে এলেন। আসার পরই তো আমাদের সর্বনাশ হল, বাবা পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী পড়লেন।'

অমলেশ কী বলবে, ভেবে পায় নি।

নবেন্দু কিন্তু থামে নি। আপন মনেই সে বলে যাচ্ছিল, 'আমি বড় ছেলে। বুঝতেই পারছেন ার পর সব দায়িত্ব এসে পড়ল আমার কাঁধে। পাকিস্তানে থাকতে বি.এ. পর্যন্ত পড়েছিলাম। য়ায় এসে পড়াশুনায় ইস্তফা দিলাম। একটা চাকরি—বাঁচবার মতো একটা কিছুর আশায় ালের মতো ঘুরতে লাগলাম। কত লোককে যে ধরেছি, কত জায়গায় যে গেছি—কিন্তু না, ানে গেছি সেখানেই দুয়ার বন্ধ। রিফিউজিদের সুযোগ-সুবিধে দিয়ে স্বর্গে চড়ানো হচ্ছে যে ঢাক-ঢোল পেটানো হয়, সে সব ডাহা মিথ্যে। অন্য কে কী পেয়েছে জানি না, আমি ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে কোন সাহায্যই পাই নি।'

রুদ্ধশ্বাসে অমলেশ বলেছিল, 'তারপর?'

অমলেশের কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না নবেন্দু। নিশি-পাওয়া মানুষের মতো বলে যাচ্ছিল, পনি প্রথম যেদিন আমাকে হাজতে দেখতে গিয়েছিলেন সেদিন একটা কথা বলেছিলাম মনে ছ?'

'কী কথা?'

'আপনি এখনকার বাঙলাদেশকে জানেন না।'

'সত্যিই জানি না।' অমলেশ মাথা নেড়েছিল।

নবেন্দু বলেছিল, 'আমার ধারণা সৎভাবে বাঁচবার মতো একটা পথও সেখানে খোলা নেই। থায় যাব, কোন্‌দিকে গেলে বাঁচার একটা নিশানা মিলবে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। সাঁতার-না-জানা মানুষের মতো হাত-পা ছুঁড়তে তে আমি যেন ডুবে যাচ্ছিলাম। আর সেই সময় খবর এসেছিল, আছে। বাঁচার একটামাত্র ই বাঙলাদেশের খোলা রয়েছে।' একটু দম দিয়ে আবার আরম্ভ করেছিল, 'সেই পথটা শ্য সোজা নরকের ঠিকানায় চলে গেছে। বাঙলাদেশ যেন চারদিক থেকে ধাক্কা মারতে তে আমাকে সেই রাস্তাটার মুখে নিয়ে এসেছিল, তারপর কখন যে সেটা ধরে হুড়হুড়িয়ে

নেমে গেছি, নামতে নামতে অন্ধকারে তলিয়ে গেছি, মনে নেই। রাতারাতি আমি হয়ে উঠলা কুখ্যাত ওয়াগন-ব্রেকার স্মাগলার, গুণ্ডা, আরো কত কি।'

আরব সাগরের এই কূলে বাঙলাদেশ সম্বন্ধে হাজারো কিংবদন্তী হাওয়ায় হাওয়ায় ভেসে আসে। ওখানে নাকি দিবারাত্রি বিক্ষোভ মিছিল, অসন্তোষ। বাঙলাদেশের স্নায়ু নাকি এক মুহূর্তের জন্যও জুড়োয় না, সর্বক্ষণ টগবগ করে ফুটছে। ধর্মঘটে-পিকেটিংয়ে স্লোগানে এবং উত্তেজনায় জ্বলন্ত অশান্ত উচ্চকিত বাঙলাদেশের খবর নিয়তই বোম্বাইকে দোলা দিয়ে যায়।

কিন্তু ক্ষোভ-অশান্তি-উত্তেজনা এক কথা আর নবেন্দু যে ভয়াবহ ছবি এঁকেছে তা আরেক কথা। সত্যিই কি বাংলাদেশের সৎ মানুষের জন্য একটা পথও খোলা নেই?

ভাবতে ভাবতে অমলেশের চমক লেগেছিল। নবেন্দু ছেলেটা কি রকম? ধূর্ত? ধড়িবাজ? উল্টো-পাল্টা নানা প্রসঙ্গ তুলে কৌশলে সে কি তার অন্ধকারে ডুব দেবার কৈফিয়তটা শুনিয়ে দিয়েছিল? অমলেশ বুঝতে পারে নি।

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নবেন্দু আবার বলে উঠেছিল, 'বোনেরা বড় হয়েছে, তাদের বিয়ে দেওয়া দরকার। মায়ের চিঠিতে খবর পাই ভাইগুলো স্কুলে যায় না, দিন রাত আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, বদ সঙ্গে পড়ে একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কী যে আমি করব

সেই মুহূর্তে নবেন্দুকে দুর্দান্ত ওয়াগন-ব্রেকার অথবা ভদ্র সমাজের দুঃস্বপ্ন মনে হয় নি। মনে হচ্ছিল সে যেন স্নেহময় দাদা, সে তার ছোট ভাই-বোনদের প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাদের ভাল মন্দের কথা সর্বক্ষণ ভাবে। যাই হোক, অমলেশ উত্তর দেয় নি।

খানিক ইতস্তত করে নবেন্দু এবার বলেছিল, 'আমার খুব ইচ্ছে করে—'

'কী?' অমলেশ জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিল।

'ঐ সব কাজ আর করব না। সুস্থভাবে বাঁচবার মতো একটা চাকরি বাকরি যদি পেতাম—বলে একটু থেমে চকচকে চোখে অমলেশের দিকে তাকিয়েছিল নবেন্দু, 'আমায় একটা চাকরি দিতে পারেন?'

একদিন অমলেশ বিজয়ের কাছে ঘোষণা করেছিল, নবেন্দুর হাতে সুস্থ ভদ্র জীবনের দুয়ার খোলার চাবিটা তুলে দেবে। সে খবর কি নবেন্দু পেয়ে গেছে? অমলেশ বলেছিল, 'আমার হাতে তো কোন চাকরি নেই।'

'একটু যদি চেষ্টা করেন—' নবেন্দুর চোখ-মুখ এবং কণ্ঠস্বর কৃতজ্ঞ, মিনতিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সে বলেছিল, 'ভদ্রলোকের ছেলে, কিছুটা লেখাপড়া শিখেছি। ওয়াগন ভাঙা, চোরাই চালান—এইসব করে জীবন-ধারণ করতে হয়। অন্যে কে আর কী বলবে, নিজের কাছেই আমার লজ্জার শেষ নেই।'

নবেন্দুর কণ্ঠস্বরে এমন বিষাদ ছিল আর ছিল বেদনা যা অমলেশকে অভিভূত করে ফেলেছে। অমলেশ বলেছিল, 'তোমার চাকরির জন্যে নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

নবেন্দু বলেছিল 'খারাপ পথে নামার পর সবাই আমাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, ঘেন্না করেছে, পারলে আমার মুখে তারা থুতু ছিটিয়ে দেয়। আপনিই একমাত্র মানুষ যিনি আমাকে ঘেন্না করেন নি। তার বদলে একখানা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আপনার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে—'

'বল।'

'চাকরির খোঁজ নেওয়া ছাড়াও মাঝে মাঝে এসে আপনাকে বিরক্ত করে যাব।'

নবেন্দুর উদ্দেশ্য কী অমলেশ বুঝতে পারছিল না। মুখের ওপর কি করে আর 'না' বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে হয়েছিল। 'আচ্ছা, এসো।'

'আজ তা হলে চলি—'

'এসো।'

তারপর থেকে প্রায়ই আসত নবেন্দু। অপছন্দ করলেও তার ব্যবহারে এমন কোন ফাঁক ়য়া যায় নি যাতে অমলেশ বলতে পারে, 'আর এসো না।' জেল খাটার কালিটুকু বাদ দিলে র স্বভাব নিখুঁত। আর দশজনের মতোই সে ভদ্র, শোভন, মার্জিত।

মাঝখানে কিছুদিন (নবেন্দু যখন জেলে) তার সম্বন্ধে অমলেশের আবেগের রং ফিকে হয়ে য়েছিল। জেল থেকে বেরুবার পর সে যখন নিয়মিত যাতায়াত শুরু করল তখন তার সম্বন্ধে সুক হয়ে উঠল অমলেশ। কয়েক জায়গায় তার চাকরির জন্য চেষ্টাও সে করেছিল কিন্তু । নামের সঙ্গে চোরাই-চালান, ওয়াগন-ভাঙা আর জেল খাটার কিংবদন্তী জড়ানো, তাকে জ জুটিয়ে দেওয়া প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার।

নবেন্দু বলত, 'কি অমলেশদা, আমার চাকরির কি হল?'

তার সম্বন্ধে অমলেশের প্রাণে যে কিঞ্চিৎ দুর্বলতা আছে, নিশ্চয়ই তা টের পেয়ে থাকবে বন্দু। কবে থেকে সে 'অমলেশদা' বলছে, কবে থেকে তার সম্বোধনে আত্মীয়তার রঙ ধরেছে জানে। তার ঘনিষ্ঠতা নিশ্চয়ই লোভনীয় এবং মূল্যবান বস্তু নয়। তবু অমলেশ তাকে বাধা য় নি।

অমলেশ বলত, 'এখন কিছু যোগাড় করতে পারি নি।'

'একটু তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করুন।'

'চেষ্টা করে যাচ্ছি, দেখি—'

কোনদিন এসে নবেন্দু বলত, 'আর পারছি না অমলেশদা, জেলে যাবার পর থেকে বাড়িতে টা পয়সাও পাঠাই নি। মা ঘন ঘন চিঠি লিখছেন। টাকা পাঠাতে গেলে আমাকে আবার নো পথেই ফিরে যেতে হয়।'

কী উত্তর দেবে অমলেশ ভেবে পায় নি।

শুধু চাকরির জন্য তাগাদা দিতেই আসত না নবেন্দু, মাঝে মাঝে এসে অন্য কথাও বলত। দের সংসারের কথা, বাবা-মা-ভাই-বোনের কথা।

একদিন এসে সে বলেছিল, 'জানেন অমলেশদা, মা চিঠি লিখেছেন, বাঙলা দেশে যেখানে মরা থাকি সেখানে টিকবার উপায় নেই।'

'কোথায় থাক তোমরা?'

'কলকাতা থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে একটা মফস্বল শহরে। বীজপুর জায়গাটার নাম।'

অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'টিকবার উপায় নেই কেন?'

'বাবা শয্যাশায়ী, তিনি তো কর্তব্যের ভেতর নন। ভাইগুলো ছোট ছোট।' নবেন্দু বলেছিল, ানেরা বড় হয়েছে। জানে মাথার ওপর অভিভাবক নেই, তারা রাস্তায় বেরুলে নানারকম ত দেয়। কুৎসিত উড়ো চিঠি আসে। একদিন নাকি মদ খেয়ে একটা লোক আমাদের বাড়ি পড়েছিল।'

চমকে উঠেছিল অমলেশ, 'বল কি!'

'ঠিকই বলছি অমলেশদা—'

আরেক দিন এসে নবেন্দু বলেছিল, 'আর চাকরির দরকার নেই দাদা—'

'কেন?'

সেদিন খুবই অস্থির আর উত্তেজিত দেখিয়েছিল নবেন্দুকে, 'সৎ সুস্থ জীবন আমার জন্য

'তার মানে?'

অমলেশের কথা যেন শুনতে পাচ্ছিল না নবেন্দু। আপন মনেই সে বলে যাচ্ছিল 'অ জানি আপনি খুবই চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমার মতো লোকের চাকরি হওয়া সম্ভব নয়। য ব্যাকগ্রাউন্ডে এত অন্ধকার তাকে কেউ বিশ্বাস করে না। সে যাক গে, এদিকে কী হয়ে জানেন?'

'কী?'

'ক' মাস টাকা পাঠাতে পারি নি, সংসার অচল হয়ে যাবার কথাই। মায়ের চিঠিতে জান পারলাম সোনা-টোনা একটু-আধটু যা ছিল বিক্রি হয়ে গেছে। তাতে আর ক' দিনই বা চলে মা আরো লিখেছেন বড় বোনটা সংসারের অবস্থা দেখে একটা কাজ নিয়েছে। কী ধরনের ক খুলে জানান নি। তবে এটুকু লিখেছেন, কাজটা ভাল না। মা-র ধারণা যে কোনদিন এ বিপদ-আপদ ঘটে যাবে। মা-র চিঠি পেয়েই উত্তর দিয়েছি। লিখেছি, বোন যেন আমার . পাওয়া মাত্র কাজ ছেড়ে দেয়।'

অস্থির বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত নবেন্দুর দিকে বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে ছিল অমলেশ, বলার ম কিছু খুঁজে পায় নি।

নবেন্দু বলেছিল, 'আমি তো সারা গায়ে পাঁক মেখেছি। একজনই যথেষ্ট, ওরা অ ভালভাবে বাঁচুক। অমলেশদা, সুস্থভাবে বাঁচবার জন্য একটু লোভ হয়েছিল। আপনাকে জন্য বার বার এসে বিরক্ত করেছি, কিছু মনে করবেন না।'

অমলেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিল, 'না-না, বিরক্ত কিসের। যখন ইচ্ছে হবে এস।' অস জেনেও বলেছিল, 'চাকরি তোমায় একটা যোগাড় করে দেবই, হয়তো খানিকটা দেরি হ

অমলেশের শেষের কথাগুলো যে শুধু কথার কথা, নিতান্তই তার মৌখিক প্রতিশ্রুতি কি বুঝতে পেরেছিল নবেন্দু? সে নিঃশব্দে অদ্ভুত একটু হেসেছিল।

আরো কিছুক্ষণ বসে থেকে চলে গিয়েছিল নবেন্দু। জীবন্ত অবস্থায় নবেন্দুকে সেই অমলে শেষ দেখা।

সেই যে নবেন্দু চলে গিয়েছিল তারপর মাস খানেক আর দেখা নেই। অমলেশ নবেন্দু পছন্দও করত না, আবার অপছন্দও না। তাকে ঘিরে তার মন পছন্দ আর অপছন্দের মাঝখ থমকানো। তবে সে যে নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছিল, তাতে খুব সম্ভব অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে অমলেশ। মনে মনে কবে থেকে যে তার সঙ্গ কামনা করতে শুরু করেছিল, বলা দুরূহ

একমাস না দেখার ফল হয়েছিল এই, নবেন্দুর শূন্যতা বড় বেশি করে অমলেশের চো পড়ছিল, খানিকটা চিন্তিতও হয়ে পড়েছিল। নবেন্দুর খোঁজ করা দরকার কিনা যখন ভাব ঠিক সেই সময় বিজয় একদিন অমলেশদের বাড়িতে হানা দিল। চোখের তারা নাচিয়ে গল স্বরে ঢেউ দিয়ে বলেছিল, 'তারপর হৃদয়পরিবর্তনওয়ালা, খবর কী?'

বিজয়ের আসাটা স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল না। অমলেশের অদৃশ্য কোন ইন্দ্রিয়ের ভে থেকে কে যেন ফিসফিসিয়ে বলছিল, এ ভাল না, এর ভেতর খারাপ কোন ইঙ্গিত আছে, ে কুঁচকে অমলেশ বলেছিল, 'খবর আবার কী, ভালই।'

'উঁহু—উঁহু—'

'কী হল?'

'তোর খবর আমি জানতে চাই না।'

'তবে কার?'

'তোর গড-চাইল্ডটির।'

গড-চাইল্ড অর্থে নবেন্দু। নবেন্দু যে নিয়মিত অমলেশদের বাড়ি আসত বিজয়ের তা জানা ছিল না। অমলেশ নিজেই তাকে বলেছে। ঠাট্টা করে নবেন্দুকে অমলেশের গড-চাইল্ড বলত বিজয়।

অমলেশ বলেছিল, 'তার খবরও যতদূর জানি, ভালই।'

'না ব্রাদার, নো—' বিজয় জোরে জোরে মাথা নেড়েছিল, 'শ্রীমান আবার ফাটকে যাবার বা।'

নবেন্দু যে তার পুরনো পথে ফিরে যাবে, আগেই মোটামুটি আন্দাজ করেছিল অমলেশ। বু চমক লাগার মতো খাড়া হয়ে বসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তার মানে?'

'আবার তিনি ওয়াগন-ভাঙাব ব্রত নিয়েছেন।' দু হাতের বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বিজয় বলেছিল, 'চেঞ্জ অফ হার্ট তা হলে করা গেল না!'

অমলেশ চুপ।

বিজয় আবার বলেছিল, এবার যদি ধরা পড়ে তিন মাসে হবে না, চুল দাড়ি পাকিয়ে জেল থেকে বেরুতে হবে।'

অমলেশ উত্তর দেয় নি। নবেন্দু সম্বন্ধে বিপজ্জনক খবরটি দিয়ে বিজয় চলে গিয়েছিল।

নবেন্দুর ঠিকানা অমলেশের জানা ছিল না। আন্ধেরীর কাছাকাছি কোথাও থাকত বলে একবার শুনেছিল। কিন্তু আন্ধেরী তো ছোটখাট পাড়া না, বিশাল জন-সমুদ্রের ভেতর থেকে ঠিকানাহীন একটি মানুষকে খুঁজে বার করা দুরূহ ব্যাপার। অথচ নবেন্দুকে পাওয়া দরকার, তাকে পেলে সতর্ক করে দিতে হবে।

আরো মাসখানেক মাস দেড়েক কাটল। ইতিমধ্যে নবেন্দু সম্বন্ধে অমলেশের চাঞ্চল্য, অস্থিরতা অনেকখানি জুড়িয়ে এসেছে। স্মৃতির যে অংশে সবাই উপেক্ষিত অনাবশ্যক অতীতকে আবর্জনার মতো ছুঁড়ে দেয়, নবেন্দু ধীরে ধীরে সেখানে সরে যাচ্ছিল।

আরো হাজারটা স্রোতে ভেসে গিয়ে নবেন্দুকে হয়তো ভুলে যেত অমলেশ কিন্তু নবেন্দুই ভুলতে দিল না। একদিন আফিস থেকে সবে ফিরেছে, থানা থেকে বিজয় ডেকে পাঠাল। সে দিন তক্ষুনি যায়।

থানায় পা দিতেই বিজয় বলেছিল, 'বোস্—'

একটা চেয়ারে নিজেকে সঁপে দিতে দিতে অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী ব্যাপার? এমন জরুরী তলব যে?'

তৎক্ষণাৎ কিছু বলে নি বিজয়। তার হাতে একটা কাঠের ব্যাটন ছিল, সেটা হাতের ভেতর ঘোরাতে ঘোরাতে অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করেছিল। তারপর আস্তে আস্তে বলেছিল, 'তোর পক্ষে একটা স্যাড নিউজ আছে।'

মুহূর্তের জন্য হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন যেন থমকে গিয়েছিল। রুদ্ধশ্বাসে অমলেশ জিজ্ঞেস করেছিল, 'কী?'

'সেই ছেলেটা কাল ওয়াগন ভাঙতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।'

দুঃসংবাদটা যে নবেন্দুর দিক থেকে আসবে, এ ছিল অভাবনীয়। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিল অমলেশ, ঠাট্টার সুরেও অন্তত বিজয় গড-চাইল্ড মহাপুরুষ অথবা অন্য কোন মজাদার বিশেষণ জুড়ে দেয় নি। নবেন্দু অমলেশের কেউ না, তবু এস্রাজে এলোপাথাড়ি ছড়

টানার মতো বুকের ভেতর কয়েক মুহূর্ত যেন ঝড় বয়ে গিয়েছিল। বিজয়ের দিকে তাকি বিমূঢ়ের মতো প্রতিধ্বনি করেছিল সে, 'নবেন্দু মারা গেছে!'

হ্যাঁ, ঐ জাতীয় লোকের মৃত্যু এই ভাবেই হয়।' বিজয় বলেছিল, 'ডেড বডিটা রে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে, চল দেখে আসবি।'

নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছা কোন কিছুই অমলেশের ওপর ক্রিয়া করছিল না। জাদুকর যে ভ সম্মোহিত করে অন্যকে ওঠায়-বসায়-চলায়-ফেরায় বিজয়ও যেন সেইভাবে রেল-পুলি দপ্তরে তাকে নিয়ে গিয়েছিল।

একটা না, দুটো গুলি নবেন্দুর বুক ভেদ করে বেরিয়ে গিয়েছিল। তার সারা শরীর দি থোকায় থোকায় রক্ত জমাট বেঁধে ছিল, আর উড়ছিল মাছি। ভনভনে হাজার হাজার মা ওরা টের পায়, কি ভাবে যে পায় কে জানে।

এক পলকের বেশি তাকিয়ে থাকতে পারে নি অমলেশ, তার মাথা ঘুরছিল। ক্লান্ত ডু স্বরে বলেছিল, 'চল, ফিরে যাই।'

ফিরতে ফিরতে বিজয় বলেছিল, 'কোথায় দেশ, আর কোথায় এসে মরল! হ্যান্ডস ইয়ংম্যান—চাকরি-বাকরি করে ভালভাবে জীবন কাটিয়ে দিলেই পারত। তা না—'

সৎ-সুস্থ জীবনের তৃষ্ণা যে নবেন্দুর ছিল, অমলেশের চাইতে কে আর তা ভাল জা একটা চাকরির জন্য কতবার সে তার কাছে গেছে। কিন্তু এসব নিয়ে সেই মুহূর্তে অমলে কিছুই বলতে ইচ্ছা করছিল না।

একটু চুপ। তারপর বিজয় আবার বলে উঠেছিল, 'ভাল কথা—'

চলতে চলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল অম[illegible]

বিজয় বলেছিল, 'নবেন্দুর বাড়িতে একটা খবর পাঠানো দরকার। কিন্তু ও বাঙা এইটুকুই শুধু জানা গেছে। তোর কাছে তো যাতায়াত ছিল, ওর বাড়ির ঠিক জানিস?'

'জানি।'

'একটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিস তো। হিউম্যান গ্রাউন্ডেই জানানো দরকার, না বলিস?'

নিঃশব্দে মাথা নেড়েছিল অমলেশ।

বীজপুরের নবেন্দুর মা বাবার ঠিকানায় চিঠি লিখি লিখি করেও একটা মাস কেটে গে মৃত্যুর মতো নিদারুণ দুঃসংবাদ জানিয়ে আগে আর কখনও কারোকে চিঠি দেয় নি অমলে কী ভাষায় তা লিখতে হয়, জানে না।

নবেন্দুই ছিল তাদের সংসারের একমাত্র রোজগেরে। যে পথেই আসুক, তার উপার্জ সঙ্গেই গোটা সংসারটার বাঁচা-মরার প্রশ্ন জড়ানো। নবেন্দুর মৃত্যুর খবরটা বীজপুরের এব বাড়িতে কী ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দেবে ভাবতেই অমলেশের সমস্ত স্নায়ু শিথিল হ এসেছে। তার স্নায়ু লোহার তার দিয়ে তৈরি না।

একটা মাস অমলেশ শুধু ভেবেছে, ভেবেছে আর ভেবেছে। যত ভেবেছে ততই বিচিত্র এক আচ্ছন্নতা চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরেছে। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছে চিঠি লিখে সে নিজেই বীজপুরে যাবে। অতর্কিত আঘাত না, ছেলের মৃত্যু-সংবাদ যাতে নবে বাবা-মা মোটামুটি সহজভাবেই গ্রহণ করতে পারেন সে জন্য আগে থেকে কথায় কথ তাদের মনকে প্রস্তুত হবার সুযোগ করে দেবে।

তা ছাড়া অতদূর পাড়ি জমানোর দ্বিতীয় একটি কারণও আছে। খুব ছেলেবেলায় একবার পিতৃভূমিতে এসেছিল অমলেশ। যে বাঙলাদেশ আবছাভাবে তার স্মৃতিতে আছে সেখানে নাকি সৎভাবে বাঁচবার একটা পথও খোলা নেই। নবেন্দুব কথা কতখানি সত্যি তা যাচাই কবার লোভ অমলেশের মনের অবচেতনে কোথাও হয়তো ছিল। দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ পার্টিশনে বক্তাক্ত জর্জরিত ক্ষুব্ধ ক্ষিপ্ত বাঙলাদেশ যেন অমোঘ নিয়তির মতো তাকে হাতছানি দিচ্ছিল আর ঘোরের মধ্যে অমলেশ বঙ্গোপসাগবেব এই কূলে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

উজান টানে অমলেশ যেন কয়েক মাস আগেব সেই দিনগুলোতে ফিবে গিয়েছিল। কতক্ষণ নবেন্দুর ভাবনাব মধ্যে সে ডুবেছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ বৃষ্টির ঝমঝমানিতে চকিত হল; কিছুক্ষণ নীরব থাকার পব আবার সেটা প্রবলবেগে ঝরতে শুরু কবেছে।

এখন কত বাত, কে বলবে। পাশের বিছানায় স্টেশন মাস্টারের নাকেব ডাকে প্রলয় বয়ে যাচ্ছে। অমলেশ অনুভব করল, তারও ঘুম পাচ্ছে। দেখতে দেখতে সমস্ত চেতনা গাঢ় গভীর অথৈ ঘুমের ভেতব হারিয়ে যেতে লাগল।

৩

সকালবেলা ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ল সারা ঘব জুড়ে টলটলে সোনালী আলোর ঢল নেমেছে। দিনের বয়স যে অনেকখানি বেড়ে গেছে, রোদের রঙ দেখে তা টের পাওযা যাচ্ছে।

ঘরের কোণে ঝুল, ঘুলঘুলিতে চড়াইদের বসতি, কালচে দেওয়ালে আরসোলা আর টিকটিকিদেব ঘোরাফেরা, নোংবা দুর্গন্ধ বিছানা, ভাঙাচোরা মেঝে—সব মিলিয়ে অমলেশের প্রথমটা মনে হল ঘুম-ঘোরে কেউ বুঝি তাকে এখানে রেখে ফেলে গেছে। পরক্ষণেই কাল বাতের ঘটনাগুলো একে একে মনে পড়ে গেল।

ধড়মড় করে উঠে বসল অমলেশ। কিন্তু না, পাশের বিছানায় স্টেশন মাস্টার নেই। খুব সম্ভব ফার্স্ট ট্রেন ছাড়তে স্টেশনে চলে গেছেন।

এক রাতের আশ্রয় পেয়েছিল অমলেশ। ঘব দখল কবে বসে থাকা শোভন মনে হল না এবং তা ছাড়া এক্ষুনি তাকে নতুন পাড়ায় ছুটতে হবে। দুপুরের ভেতর ওখানকার কাজ চুকিয়ে কলকাতায় ফিরবে। সঙ্গে কিছুই নেই। বোম্বাই থেকে ছোটখাটো একটা বিছানা আর সুটকেস নিয়ে এসেছিল অমলেশ। কাল কলকাতার একটা হোটেলে সেগুলো রেখে এসেছে। নতুন পাড়া থেকে সোজা সেখানেই চলে যাবে। কাজেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া উচিত।

ঘরের বাইরে এসে প্রথমে শেকল তুলে দরজা বন্ধ করে দিল অমলেশ। ফিরে দাঁড়াতেই সংক্ষিপ্ত উঠোনের এক কোণে একটা কুয়ো চোখে পড়ল। দ্রুত পায়ে সেখানে গিয়ে মুখটা ধুয়ে নিল। তারপর এল স্টেশনে।

স্টেশন মাস্টার শুধোলেন, 'ঘুম হল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কৃতজ্ঞ সুরে অমলেশ জানাল, কাল রাতে আশ্রয় দিয়ে মাস্টার মশাই যথেষ্ট উপকার করেছেন। সেজন্য তাকে অজস্র ধন্যবাদ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

স্টেশন মাস্টার প্রবলবেগে মাথা এবং হাত নেড়ে বললেন, 'কিছু না, কিছু না। উপকার আবার কি? ভদ্রলোকের জন্য ভদ্রলোক ওটুকু করেই থাকে। তার জন্যে ধন্যবাদ ধন্যবাদ করে অস্থির হবেন না।'

কথাটা মিথ্যে বলেন নি স্টেশন মাস্টার। কিন্তু তিনি না হয়ে আর কেউ হলে অচেনা এব আগন্তুককে সত্যি আশ্রয় দিতেন কিনা সে সম্বন্ধে অমলেশের যথেষ্ট সংশয় আছে। যাই হোক এ প্রসঙ্গে আর কিছু বলতে গেলে স্টেশন মাস্টার হাজার মুখে প্রতিবাদ জানাবেন। কাজেই চুপ করে রইল সে।

একটু পর অমলেশ বলল, 'আমি এখন যাচ্ছি—'

'এখনই? তা একটু চা-টা খেয়ে যান।'

হাত জোড় করে অমলেশ বলল, 'আজ্ঞে না, এখন আর ও-সব ঝামেলা করবেন না। নতুন পাড়ার কাজটা চুকিয়ে আজই আমায় কলকাতায় ফিরতে হবে।'

স্টেশন মাস্টার খুঁতখুঁত করতে লাগলেন, 'সকালবেলা একেবারে খালি পেটে—'

অমলেশ যেন তার কথা শুনতে পায় নি। বলল, 'আপনার কোয়ার্টারটা খোলা পড়ে আছে

'দিন রাতই ওটা খোলা থাকে।'

'তবু যদি একবার দেখে আসতেন—'

অমলেশের মনোভাব খানিকটা বুঝি-বা আন্দাজ করতে পারলেন স্টেশন মাস্টার। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে মৃদু হাসলেন, 'আমি লোক চিনি মশায়। তা ছাড়া আমার কোয়ার্টারে সোনা-দানা, হীরে-কোহিনুর নেই; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ওখানে যা আছে ত নিলে চোরের মজুরি পোষাবে না।'

অমলেশ হাসতে লাগল।

স্টেশন-মাস্টার আবার বললেন, 'নতুন পাড়ায় যাবেন, আপনি তো নতুন এসেছেন কারোকে সঙ্গে দিয়ে দেব?'

'না। আমিই খুঁজে বার করে নিতে পারব।'

'এক কাজ করুন, সাইকেল-রিক্সায় চলে যান। আনা দশেক নেবে। একেবারে সোজা নতুন-পাড়ায় পৌঁছে যাবেন।'

'সেই ভাল। আচ্ছা নমস্কার।'

'নমস্কার।'

স্টেশনের ঠিক বাইরে ঝাঁকড়া-মাথা অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় সাইকেল রিক্সার জটলা। একটা রিক্সা ঠিক করে অমলেশ উঠে বসতে চলতে শুরু করল।

কাল যে অত দুর্যোগ গেছে, আকাশের দিকে তাকিয়ে আজ সকালবেলা তা কে বলবে আজ আর কোথাও এক টুকরো মেঘ নেই। যতদূর চোখ যায় চারদিক ধোয়ামোছা, ঝকঝকে নির্মেঘ নীলাকাশ জুড়ে গলানো গিনির মতো টলটলে তরল রোদের ছড়াছড়ি। আর আছে পাখি; কাল যারা বেরুতে পারে নি আজ আকাশের অগাধ অথৈ নীলে তারা গা ভাসিয়ে দিয়েছে। দিনটা যেন বর্ষার শাসন না মেনে একলাফে মধ্যঋতু শরতের ঠিক মাঝখানটিতে এসে হাজির হয়েছে।

কালকের দুর্যোগের কিছু কিছু স্মৃতি চারদিকে ছড়িয়ে আছে। কাঁচা খোলা নর্দমাগুলোতে ঢল বয়ে যাচ্ছে। গাছের পাতা ডালপালা রাস্তায় ইতস্তত ছড়ানো; এখানে-ওখানে জল জমে আছে।

অমলেশের রথটি বেশ জোরেই ছুটছে। দু-ধারে বাড়ি ঘর। বীজপুর যেন একালের শহর না। সবই তার পুরনো। বাড়ি-ঘর-ইমারত-মন্দির, সব কিছুরই দেওয়াল খসা, আস্তর খসা বাঁকে বাঁকে পাক-খাওয়া সরু গলি, প্রাচীর-ঘেরা বাড়ি-বাগান পুকুর—সমস্ত কিছুরই গায়ে

প্রাচীনত্বের শীলমোহর আঁটা। মনে হয় বীজপুর যেন জীবন্ত মানুষ সমেত মাটির অতল থেকে আবিষ্কৃত কোন সুদূর অতীতের নগরী।

দুধারে পুরনো ভাঙা-চোরা বাড়িগুলো একাকার হয়ে নিরবচ্ছিন্ন একটা স্রোতের মতো রিক্সার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে দৃশ্যপট বদলের জন্য এক-আধ ছটাক জমি, কিছু ফাঁকা মাঠ, কচুরিপানার ঠাস-বুননের তলায় মজা খাল, বাঁশের সাঁকো।

পুরনো বীজপুর শহর তার ধসে-পড়া বাড়ি-ঘর কিংবা এই বর্ষায় হঠাৎ পাওয়া শরতের একটি দিন—কিছুই অমলেশের ওপর রেখাপাত করতে পারছিল না। রিক্সাটা নতুন পাড়ার দিকে যত এগুচ্ছে বুকের ভেতর সেই দুন্দুভিটা ততই যেন হাজার কাঠিতে বাজতে শুরু করেছে।

সামনের দিকে চোখ রেখে রিক্সাওয়ালা হঠাৎ শুধলো, 'নতুন পাড়ায় কার বাড়ি যাবেন বাবু?'

'ওখানকার সবাইকে চেন নাকি?' পাল্টা প্রশ্ন করল অমলেশ।

'চিনি বৈকি। এ-শহরে ক'জন আর লোক; অবিশ্যি রিফুজিরা আসতে ভিড় বেড়েছে। আমাদেরও দু-পয়সা হচ্ছে।'

অমলেশ বলল, 'মহীতোষ চাটুজ্জের বাড়ি যাব।'

চমকে রিক্সাওলা ঘাড় ফেরাল, 'কোন্ মহীতোষ চাটুজ্জে, যার ছেলে নবেন্দু?'

অমলেশ লক্ষ্য করল মহীতোষ চাটুজ্জে অথবা নবেন্দুর ব্যাপারে এ-শহরটা রীতিমত স্পর্শকাতর। এখানকার যে দুটি মানুষের সঙ্গে এখন পর্যন্ত দেখা হয়েছে, তারা—স্টেশন মাস্টার আর রিক্সাওলা—দুজনেই ঐ নামটা শুনে চমকে উঠেছে।

অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ, কেন বল তো?'

কী বলতে গিয়ে থমকে গেল রিক্সাওলা। মহীতোষ চাটুজ্জের সঙ্গে অমলেশের সম্পর্কে কী, তার সম্বন্ধে কী জাতীয় মন্তব্য করলে সে সন্তুষ্ট হবে অথবা বিরক্ত, বুঝতে না পেরে ঠোঁটে চাবি আঁটাই সে বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। চট করে মুখটা আবার সামনের দিকে ঘুরিয়ে জোরে জোরে প্যাড্‌ল্ মারতে আরম্ভ করল রিক্সাওলা।

অমলেশও আর কোন প্রশ্ন করল না।

একসময় নতুন পাড়ায় পৌঁছে গেল অমলেশ। পুরনো শহর যেখানে শেষ, ইতির পর পুনশ্চর মতো নতুন পাড়ার সেখানে শুরু। অধিকাংশ বাড়িই এখানে টালির চালা মাথায় দিয়ে বাঁশের দেওয়াল নিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ছন্দ পতনের মতো এক-আধটা নতুন পাকা বাড়ি চোখে পড়ে।

নবেন্দুর মুখেই অমলেশ শুনেছিল, তারা উদ্বাস্তুরা জমি জবর-দখল করে কলোনি বসিয়েছে। রিফিউজি কলোনি—উদ্বাস্তুদের উপনিবেশ। নাম একটা দিতে হয় বলেই দেওয়া হয় নি। নতুন পাড়ার নামকরণ মোটামুটি সার্থক। এখানকার মানুষ-জন, বাড়ি-ঘর—সবই নতুন, আনকোরা।

ভাড়া মিটিয়ে নিয়ে রিক্সাওলা রাস্তা থেকে একটু দূরে একখানা টিনের বাড়ি দেখিয়ে দিল, 'এটা মহীতোষ চাটুজ্জের বাড়ি।'

বেল বাজিয়ে রিক্সাওলা চলে গেল। তারপরও অমলেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। অনুভব বছে হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামা দ্রুততর হয়ে উঠেছে। এক সময় সে হাঁটতে শুরু করল। যে আরব সাগরের পার থেকে তাকে এতদূর নিয়ে এসেছে সেইটেই ঠেলে এগিয়ে চলল।

কখন যে বাড়িটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অমলেশের খেয়াল নেই। নতুন পাড়ার আর স· বাড়ির মতোই এর চার ধারে ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়া, নতুনত্বের ভেতর টালির বদলে টিনের চাল সামনের দিকে সংক্ষিপ্ত উঠোন। দুচারটে দেশী ফুলের গাছ, একটা তুলসীমঞ্চ, একটা পাতাবিহী· পেয়ারাগাছও চোখে পড়ল।

অমলেশ আস্তে আস্তে ডাকল, 'মহীতোষবাবু—' ডেকেই টের পেল গলায় স্বর ফোটে নি কণ্ঠস্বরটাকে ভেতর থেকে মুক্ত করে আবার ডাকল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি মেয়ে সামনের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে অমলেশের মুখোমু· দাঁড়াল। বলল, 'কাকে চাইছেন?'

ষোল সতেরোর মতন বয়েস। উদ্দাম স্বাস্থ্য। পরনে যে খাটো ফ্রকটা রয়েছে, শরীর ত থেকে উপচে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখ-মুখ-নাকের ধারাল টানে খুব চেনা চেনা আদ· বসানো; নবেন্দুর কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে, মেয়েটা নবেন্দুর বোনই হবে। এই রকম যার স্বাস্থ তাকে ঐ রকম খাটো জামা পরিয়ে রাখা অশোভন, দৃষ্টিকটু।

মেয়েটা অমলেশের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারল না। মুখ নামিয়ে সে উসখু· করছে, আর ফ্রকটা টেনে টেনে হাঁটুর দিকে নামাবার চেষ্টা করছে, কিন্তু বৃথাই।

রিক্সাওলা চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছিল তবু আরো নিশ্চিত হবার জন্য অমলেশ বলল, 'এট মহীতোষ চাটুজ্জের বাড়ি?'

অস্ফুট গলায় মেয়েটি বলল, 'হ্যাঁ।'

'আমি তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।

'আসুন—' কুণ্ঠিত জড়সড় মেয়েটা নিজেকে গুটিয়ে এতটুকু করে ফেলতে পারলে যে· বেঁচে যায়। নুয়ে বেঁকে আগে আগে চলতে লাগল সে, অমলেশ তাকে অনুসরণ করতে লাগল

উঠোনে এসে কাঁপা গলায় মেয়েটা ডাকল, 'মা, বড়দি, মেজদি শিগগির এসো। এব ভদ্রলোক এসেছেন, বাবার সঙ্গে দেখা করতে চান।' বলেই এক ছুটে সামনের ঘরটায় অদৃশ হয়ে গেল।

উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়েছে অমলেশ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মেয়ে· ডাকার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন মধ্যবয়সিনী আরেক ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর পি· পিছু আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ে; এর পরনে অবশ্য ফ্রক নেই—যা আছে তা সস্ত আধময়লা রঙিন শাড়ি। যে অমলেশকে রাস্তা থেকে ভেতরে ডেকে এনেছে তার মুখ-চোখ ভুরু এই মেয়েটির মধ্যে বসানো। অর্থাৎ এ-ও নবেন্দুরই বোন হবে। নবেন্দু বলেছিল তার তি· বোন। দু বোনকে মোটামুটি দেখা হয়ে গেল অমলেশের।

বর্ষীয়সী মহিলাটির বয়েস কত, বলা দুরূহ। ভাঙাচোরা শরীর, নীল নীল শিরা বার-কর হাত, জ্বলে যাওয়া রঙ—এসব সত্ত্বেও বোঝা যায় একদা তিনি সুরূপাই ছিলেন। চুল উঠে উ· কপালটা মাঠ হয়ে গেছে, মুখ রেখাময়, কণ্ঠার হাড় বার করা। তবু কোথায় যেন অস্তগামী সূর্যের মত লাবণ্যের ক্ষীণ একটু আভা এখনও লেগেই আছে। দু-হাতে শাঁখা আর দু-গাছি লোহা ছাড়া সর্বাঙ্গে ধাতুর চিহ্নমাত্র নেই। পরনে সেলাই-করা লাল-পাড় শাড়ি। 'জীবনযুদ্ধ' বলে একটা শব্দ জানা ছিল, মহিলাকে দেখতে দেখতে তা মনে পড়ে গেল অমলেশের।

সব চাইতে আশ্চর্য তাঁর চোখ। সে দুটি যেন জগতের কোন কিছুকে বিশ্বাস করে না, আবার অবিশ্বাসও করে না—বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে দৃষ্টিটা থমকানো।

ঘোমটা ছিলই, সেটা কপালের দিকে আরেকটু টেনে দিয়ে ভদ্রমহিলা অমলেশের চোখে চোখ রাখলেন।

সেই একই কথা আবার বলতে হল, অমলেশ মহীতোষ চাটুজ্জের দর্শনার্থী।

মৃদু গলায় মহিলা বললেন, 'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না বাবা—'

তাঁর বলার ভঙ্গি কিছুটা সন্দিগ্ধ, হয়তো বা সতর্ক। অমলেশ বলল, 'আমার নাম অমলেশ—অমলেশ বসু।'

মহিলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

অমলেশ বুঝল তিনি তাকে চিনতে পারেন নি। নাম শুনলেই চিনে ফেলবেন, এতখানি স্বনামধন্য নিশ্চয়ই সে নয়। তাকে আরো বিস্তৃতভাবে নিজের পরিচয় দিতে হবে। তাড়াতাড়ি সে বলে উঠল, 'আমি বোম্বাই থেকে আসছি—'

এবার কাজ হল। অমলেশের কথা শেষ হবার আগেই চোখের তারা দুটো মুহূর্তের জন্য যেন আলোকিত হয়ে উঠল মহিলার, 'তুমিই অমলেশ—আমার নবুর বন্ধু!'

'নবু?'

'নবেন্দু—'

অমলেশ লক্ষ্য করল তাঁর পাশে যে আঠার-উনিশ বছরের মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তার চোখেও আলোর ছটা খেলে যাচ্ছে। নবেন্দুর মতো মানুষের বন্ধুত্ব কোনদিনই কাম্য নয়—অন্তত তার পক্ষে। কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখের ওপর তা বলে ফেলতে এই মুহূর্তে অমলেশের বাধল; বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, নবেন্দু আমার বন্ধু।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমি নবেন্দুর মা—'

অমলেশ আগেই তা অনুমান করেছিল। নিজের বাবা-মা ছাড়া পারতপক্ষে আর কারোকে সে প্রণাম করে না। কিন্তু এই মুহূর্তে তার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল বলতে পারবে না, অমলেশ ভদ্রমহিলার পা ছুঁল।

অমলেশের চিবুকে হাত ঠেকিয়ে নবেন্দুর মা চুমু খেলেন, 'থাক বাবা, থাক। একশ' বছর বেঁচে থাকো।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন 'নবুর চিঠিতেই জেনেছি তুমি বোম্বাইতে থাক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

ইদানীং নবু যত চিঠি লিখেছে তার সবগুলো তোমার কথায় ভর্তি। সে যে কী চোখে তোমায় দেখে! বাপ-মা ছাড়া আর কারোকে সে এত ভক্তি করে না।'

অমলেশ আর কী বলবে, চুপ করে রইল।

নবেন্দুর মা আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় ভাঙা বসা জড়িত গলায় ডানদিকের ঘরটা থেকে কে যেন বলে উঠল 'কে, কে এসেছে? আবার কী হল?'

এতক্ষণে নবেন্দুর মা যেন সচেতন হলেন, 'ঐ দ্যাখো, তোমাকে দাঁড় করিয়েই রেখেছি। কী বেভুলো মন যে আমার; চল কত্তার ঘরে যাই—'

সেই অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল, 'কই, কে এসেছে—নিয়ে এস!'

'চল বাবা—' নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'ঐ এক মানুষ, একটুতেই অস্থির। কেউ যে এসেছে সেটা টের পেয়েছে। যতক্ষণ না তোমাকে দেখছে স্বস্তি নেই। সমানে বকে যাবে, 'নিয়ে এস, নিয়ে এস—' বিছানায় পড়বার পর ধৈর্যটৈর্য বলতে সব গেছে।'

নবেন্দুর কাছে আগেই খবর পেয়েছিল অমলেশ, তার বাবার পক্ষাঘাত। যাই হোক ভদ্রমহিলাকে অনুসরণ করে ডানদিকের ঘরে গিয়ে ঢুকল সে। সেই মেয়েটাও তাদের সঙ্গে সঙ্গে এল।

জানালাগুলো বন্ধ, সামনের দিকের দরজাটা বাদ দিলে আলো আসার কোন পথই খোলা নেই। দরজা দিয়েও যে কুণ্ঠিত আলোটুকু এসেছে, ঘরটাকে উজ্জ্বল করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয়। ফলে ভেতরটা যেন চির প্রদোষের রাজ্য।

অন্ধকারে প্রথমটা কিছুই দেখতে পেলে না অমলেশ। চোখ সয়ে এলে নজরে পড়ল, একধারে তক্তপোষের ওপর অনন্তশয্যা পাতা, তার ওপর বৃদ্ধও না, প্রৌঢ়ও না—দুয়েক মাঝামাঝি একটি মানুষ শুয়ে আছেন। তার শরীরের আধখানা অর্থাৎ ডানদিকটা চমৎকার সুস্থ, সবল স্বাস্থ্যপূর্ণ। বাকি অর্ধেক শীর্ণ, অসাড়। নীরস অনাবশ্যক শুকনো ডালের মতো দেহের সঙ্গে কোন রকমে আটকে আছে। মুখের বাঁ দিকটা বেঁকে গেছে, বাঁ চোখটাও বোধহয় নষ্ট—অন্তত চাউনি দেখে তাই মনে হয়।

মাথার কাছে একটা সস্তা কাঠের টেবিলে কিছু শিশি বোতল, ওষুধ-পত্তর, দু'-একটা ফল।

না, নবেন্দু মিথ্যে বলে নি, তার বাবা সত্যিই পক্ষাঘাতে পঙ্গু।

মহীতোষ চাটুজ্জের যে চোখটা ভাল সেটা অমলেশের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আগের মতো সেই ভাঙা জড়িত উৎকণ্ঠ সুরে তিনি বললেন, 'কী হয়েছে? কী ব্যাপার?'

ঈষৎ বিরক্ত গলায় নবেন্দুর মা বললেন, 'কী আবার হবে? সব সময় এক কথা, কী হয়েছে—'

'আমার কী মনে হয় জানো, চারদিকে সাঙঘাতিক কিছু ঘটে চলেছে, তোমরা আমাকে জানতে দিচ্ছ না।'

'ও তোমার মনের বাই।'

অমলেশ পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল। মনে হল, বিছানায় বন্দী মহীতোষ চাটুজ্জে সর্বক্ষণ যেন শঙ্কিত হয়ে আছেন।

আরো কী বলতে গিয়ে অমলেশের সম্বন্ধে সচেতন হলেন মহীতোষ।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'এ কে?'

নবেন্দুর মা অমলেশের পরিচয় দিলেন। অমলেশ এগিয়ে গিয়ে মহীতোষ চাটুজ্জের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।

শয্যাশায়ী পঙ্গু মানুষটি অমলেশকে নিয়ে কী করবেন, ভেবে পেলেন না। আকাশের চাঁদই বুঝি হাতে পেয়ে গেছেন। তাঁর শরীরে সুস্থ জীবন্ত দিকটায় ঢেউ খেলে গেল। হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না। ব্যস্তভাবে শুধু বলতে লাগলেন, 'ওকে বসতে দাও—' আঠার-উনিশ বছরের সেই মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটা চেয়ার নিয়ে আয় মীনা—'

মেয়েটির নাম জানা গেল, মীনা। সে একরকমই ছুটেই বেরিয়ে গেল; প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একটা হাতল-ভাঙা চেয়ার এনে অমলেশের কাছে রাখল। অমলেশ বসল।

মহীতোষ চাটুজ্জে বললেন, 'তারপর অমলেশ—'

'আজ্ঞে—' অমলেশ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল।

'এখন তুমি কোত্থেকে আসছ?'

'বোম্বাই থেকে।'

'সোজা বোম্বাই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ'

'রাত্রিবেলা ছিলে কোথায়?'

কোথায় কিভাবে রাত কাটিয়েছে, অমলেশ বলল।

মহীতোষ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'দ্যাখো দিকি কাণ্ড! কত কষ্ট হয়েছে তোমার।'

বুঝিয়ে সুঝিয়ে অসুস্থ পঙ্গু মানুষটিকে শান্ত করল অমলেশ। জানাল তার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নি বরং রাতটা মোটামুটি ভালই কাটিয়েছে।

খানিক নীরবতা। তাবপর মহীতোষ চাটুজ্জে বললেন, 'বীজপুরে কি আমাদেব এখানেই এসেছ, না আর কোথাও—'

ভেতরে ভেতরে থমকে গেল অমলেশ। একটু ভেবে নিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'কলকাতায় এসেছিলাম। আপনাদেব ঠিকানাটা সঙ্গে ছিল; ভাবলাম একবার দেখা করে যাই—'

'এসেছ, বেশ করেছ। খুব আনন্দ পেয়েছি বাবা, যদি জানতে পেতাম কলকাতা পর্যন্ত এসে আমাদের এখানে আসো নি, খুব দুঃখ হত।'

অমলেশ চুপ।

মহীতোষ চাটুজ্জে আবার বললেন, 'নবুর চিঠিতে জানতে পেরেছি, তোমরা দু-পুরুষ ওখানেই আছ। একরকম ওখানকারই বাসিন্দা হয়ে গেছে; বাংলা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ নেই বললেই চলে।'

অস্ফুট গলায় অমলেশ বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাঙলাদেশের দিকে তেমন আসো-টাসোও তো না?'

'আজ্ঞে না। তেমন দরকার-টরকার হয় না। আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা দিল্লী-কানপুর-নাগপুরের দিকে থাকে, গেলে ঐ সব দিকেই যাই।'

রসিকতার সুরে মহীতোষ বললেন, 'বাঙলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখার পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে ফেলেছ একেবারে।'

অমলেশ হাসল, 'তা বলতে পারেন। খুব ছেলেবেলায় একবার এখানে এসেছিলাম; তারপর এই এলাম।'

'কিছু মনে কোরো না, একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল অমলেশ।

মহীতোষ চাটুজ্জে বললেন, 'এতদিন পর হঠাৎ এদিকে এলে।'

বুকের ভেতব হৃৎপিণ্ড যেন থমকে গেল। এতকাল পর কেন অমলেশের বাংলাদেশে আসা, এই সুযোগে কি বলে ফেলবে? সেই নিদারুণ খবরটা—নবেন্দুর মর্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ জানাবার এই কি সময়? কিন্তু না, এই মুহূর্তে কিছুতেই তা বলতে পারল না অমলেশ। আবছা শিথিল সুরে শুধু জানাল, 'বিশেষ একটা দরকারে এসেছি।'

মহীতোষ কী উত্তব দিতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বাইরে একটা মেয়ে-গলা শুনতে পাওয়া গেল, 'কে এসেছে গো মা, ঝুমু বলছিল। এই সাত-সকালে কে এল?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজার কাছে যে এসে দাঁড়াল তাকে যে এখানে নবেন্দুর বোন হিসেবে আবার আবিষ্কার করতে হবে, সে কথা কে ভেবেছিল। ট্রেনের সেই নিশীথ নাটকের রহস্যময়ী মেয়েটা—যার নাম অমলেশের অজানা। তার সমস্ত সত্তার ভেতর দিয়ে নিমেষে বিদ্যুৎ-বেগের মতো কী যেন বয়ে গেল।

ওদিকে ঘরের ভেতর পা দিতে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে মেয়েটা। কালকের সেই মোহময়ী বেশে নয়, এই সকালবেলা তার পরনে নিতান্ত আটপৌরে ঢিলেঢালা একখানা শাড়ি আর আধময়লা জামা। চোখ ঈষৎ আবক্ত, ফোলা ফোলা। এলোমেলো রুক্ষ চুল গালে-গলায় এবং মুখের ওপর উড়ছে। দেখেই টের পাওয়া যায়, এইমাত্র তার ঘুম ভেঙেছে। তাকে ঘিরে অনেকখানি আলস্য ঘন হয়ে আছে।

মেয়েটির দৃষ্টি কিন্তু স্থির, নিষ্পলকে অমলেশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। অমলেশও চোখ ফেরাতে পারছে না, কি এক ফাঁদে সে দুটো আটকে গেছে।

এই সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তাদের বাড়িতে অমলেশকে বসে থাকতে দেখবে এতখানি সে যেন কল্পনাই করতে পারে নি। জ্বলন্ত জীবন্ত প্রমাণের মতো অমলেশ তার মুখোমুখি, দেখেও বুঝি বা বিশ্বাস করতে পারছে না মেয়েটা।

বিমূঢ় বিস্ময়ে কতক্ষণ তাকিয়ে ছিল অমলেশের খেয়াল নেই। এক সময় নবেন্দুর মায়ের গলা কানে এল 'অমলেশ রে, এ আমাদের অমলেশ। বোম্বাই থেকে প্রত্যেক চিঠিতে নবু যার কথা লিখত—'

এ বাড়িতে তার আসনখানি কোন্‌খানে পাতা, এখানে পা দিয়েই টের পেয়ে গিয়েছিল অমলেশ। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটাকে উচ্ছ্বাসিত হতে দেখা গেল না। জীবনে এই প্রথম যেন অমলেশের নাম শুনল, তার চোখমুখ দেখে অন্তত তাই মনে হয়।

অমলেশের দিকে তাকিয়ে নবেন্দুর মা বললেন, 'ও আমার বড় মেয়ে নীলা; নবুর দেড় বছরের ছোট।'

নামটা জানা গেল। অমলেশ বলতে যাচ্ছিল, 'কাল রাতেই একে বীজপুরের লাস্ট ডাউন ট্রেনে দেখেছি, একটু একটু আলাপও হয়েছে।' বলতে গিয়েও থতিয়ে যেতে হল। তার নজরে পড়ল, চোখ টিপে আস্তে করে একবার মাথা নাড়ল নীলা। ইঙ্গিতটা মোটামুটি আন্দাজ করল সে। সে যে তাকে চেনে, আগেই দেখেছে—তা যেন বলে না ফেলে সেই জন্যই চোখ টেপা, মাথা নাড়া। অমলেশ চুপ করে রইল।

এই যেন প্রথম আলাপ হচ্ছে, এ ভাবে প্রায় ভাবলেশশূন্য মুখে দু-হাত জোড়া করে নমস্কার করল নীলা। ভদ্রতা অমলেশও জানে, নিঃশব্দে দু-হাত একত্র করে বুক পর্যন্ত তুলল।

হঠাৎ মহীতোষ চাটুজ্জে তাঁর সেই অস্বাভাবিক গলায় ডেকে উঠলেন, 'অমলেশ—' অমলেশ চোখ ফেরাল। মহীতোষ আবার বললেন, 'ঐ দ্যাখো, কি ভুলো মন, আসল খবরই এখন পর্যন্ত নেওয়া হয় নি।'

'কি খবর?'

'আসার সময় তোমার সঙ্গে নবুর কি দেখা হয়েছিল?'

মুহূর্তে অমলেশের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এল। মৃত্যু-সংবাদ জানাতে এসে এরকম একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে কে ভাবতে পেরেছিল! কিছুক্ষণ স্তব্ধ বসে থেকে নিজের অজান্তেই যেন সে বলে ফেলল, 'হ্যাঁ।' আর বলেই মনে হল, কি এক অজানা ফাঁসে জড়িয়ে পড়লাম। সেখান থেকে মুক্তি পাবার কোন পথই বুঝি খোলা নেই।

সুস্থ ভাল চোখটা চকচকিয়ে উঠল মহীতোষ চাটুজ্জের, 'কেমন আছে নবু?'

ফাঁসটা ক্রমশঃ নিবিড় হয়ে বসে যাচ্ছে। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারদিকে তাকাতে লাগল অমলেশ। হঠাৎ চোখে পড়ল সেই মেয়েটা—নবেন্দুর বোন নীলা, স্থির নিষ্পলক তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রথম থেকেই ঐ ভাবে তাকিয়ে আছে নাকি সে? কে জানে। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে আবছা শিথিল স্বরে রুদ্ধশ্বাসে অমলেশ বলল, 'ভাল—ভালই আছে।'

'যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। একমাস নবুটার চিঠি পাই না, বড় ভাবনায় ছিলাম।'

মনে পড়ে গেল অমলেশের, ঠিক একমাস আগে নবেন্দু পুলিশের গুলিতে মারা গেছে।

মহীতোষ চাটুজ্জের হঠাৎ যেন খেয়াল হল, অমলেশ অনেকক্ষণ এ ঘরে বসে আছে। স্ত্রীর উদ্দেশে বললেন, 'রুগীর ঘরে আর থাকতে হবে না, অমলেশকে নিয়ে যাও। ছেলেটা তিনদিন

ট্রেন জার্নি করে এসেছে। চান-টানের ব্যবস্থা করে দাও, চা-টা খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নিক। উঠে ভাত খাবে।'

'না-না, সে কি—', অমলেশ চমকে উঠল, 'আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম, দেখা হল। এখনই আমি চলে যাব।' মুখোমুখি বসে মৃত্যুর খবর দেবার সাধ তার ইতিমধ্যেই মিটে গেছে। পৃথিবীতে এর চাইতে ভয়াবহ দুরূহ কাজ আর আছে কি না, কে জানে। অথচ বোম্বাই থেকে ক্যালকাটা মেলে যখন উঠেছিল, ব্যাপারটা খুব সহজ না হলেও একেবারে অসাধ্য মনে হয় নি।

আজই, এখনই এখান থেকে চলে যেতে চায় অমলেশ। কলকাতায় গিয়ে চিঠিতেই নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদ জানিয়ে বোম্বাই ফিরে যাবে।

কিন্তু যে ফাঁস ইচ্ছে করে গলায় পরেছে, তার হাত থেকে মুক্তি নেই অমলেশের।

যুগপৎ নবেন্দুর মা এবং বাবা চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন, 'তাই কখনো হয়! তুমি আমাদের নবুর বন্ধু; যখন এসেই পড়েছ দুটো দিন আমাদের ভেতর থেকে না গেলে খুব খারাপ লাগবে।'

সাঁতার না-জানা মানুষের মতো অমলেশ বুঝি ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে। ক্ষীণ একটা খুঁটো ধরে সে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করল. 'আমার জরুরি একটা দরকার—' কথা শেষ হবার আগেই দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'সে সব পরে দেখা যাবে। এখন গিয়ে চান-টান কর তো—'

নবেন্দুর মা ডাকলেন, 'এসো বাবা—'

যদিও কাল রাতে ঘণ্টাখানেক ঘুমোতে পেরেছে অমলেশ তবু তিন দিনের ক্লান্তি মুছে দেবার পক্ষে তা যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এই মুহূর্তে স্নায়ুর ওপর যে নিদারুণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে তাতে কোন কিছুই সঠিকভাবে গুছিয়ে ভাবতে পারছে না সে। এলোমেলো বিশৃঙ্খল স্নায়ুগুলোকে জুড়িয়ে নেওয়া দরকার, তারপর কী করা উচিত ভাবা যাবে।

ওদের ইচ্ছেয় নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল অমলেশ। আর তখনই আরেকবার নীলার চোখাচোখি হয়ে গেল, এখনও একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছে মেয়েটা। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিল অমলেশ।

বাইরে আসতে নবেন্দুর মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো কিছুই নেই দেখছি। জামা-কাপড় আনো নি?'

জড়িত ঝাপসা গলায় অমলেশ বলল, 'এনেছি; কলকাতায় একটা হোটেলে রেখে এসেছি।'

'কলকাতার হোটেলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। বোম্বাই থেকে কাল কলকাতায় এসে একটা হোটেলে উঠেছিলাম। তাই—'

'উঁহু, উঁহু, হোটেলে থাকা চলবে না। আজ থাক, কাল গিয়ে সুটকেস-টুটকেস নিয়ে আসবে। ক'দিন বাঙলাদেশে তোমাকে থাকতে হচ্ছে?'

'ঠিক কিছু নেই। তবে এক সপ্তাহের বেশি থাকার উপায় নেই।'

'ঐ ক'টা দিন আমাদের বাড়ি থেকে গেলে বড় আনন্দ পেতাম।'

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, বাধা দিয়ে নবেন্দুর মা বলে উঠলেন, 'এখন ওসব কথা থাক। এসো—'

অমলেশ উত্তর দিল না। নবেন্দুর মায়ের সঙ্গে যেতে যেতে না তাকিয়েও অনুভব করল, একজোড়া নির্নিমেষ চোখ তার পিছু নিয়েছে।

৪

স্নান টান সেরে নবেন্দুর মায়ের দেওয়া একখানা ফরসা ধুতি পরেছে অমলেশ। দক্ষিণ দুয়ারী সব চাইতে বড় ঘরখানা তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

গোটা তিন চারেক বেতের মোড়া, তার ওপর হাতে সেলাই করা গদি, খেলো কাঠের খান দুই চেয়ার, একটা সস্তা টেবিল, বাঁশের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথের একখানা ছবি, একটা গ্রু ফটো—তাতে মহীতোষবাবু, নবেন্দুর মা, নবেন্দু আর নীলা। এককোণে আলনায় পরিপা করে কুঁচনো সামান্য ক'টি ধুতি শাড়ি মেয়েদের জামা—এ সবের ভেতর এই পরিবারটির রু এবং আর্থিক অবস্থা মুদ্রিত হয়ে আছে।

দক্ষিণের জানালা ঘেঁষে একখানা বড তক্তপোষ। তার ওপর ধবধবে পরিচ্ছন্ন বিছানায় এ মুহূর্তে শুয়ে আছে অমলেশ। বাখারির জানালা; তার ফ্রেমে শরতের আমেজ-লাগা বর্ষার এ টুকরো নীলাকাশ আটকে আছে। সেখানে গলানো গিনির মতো সেই রোদ, সেই পাখি, সে সুখ—শিহরণের মতো ঝিরঝিরে বাতাস।

স্নান-টানের পর শরীর জুড়িয়ে গিয়েছিল। এখন ঘুম পাচ্ছে অমলেশের।

নিমকি সিঙাড়ার একটা প্লেট আর গরম চা নিয়ে সেই মেয়েটি ঘরে এসে ঢুকল। রাস্ত থেকে এ-ই অমলেশকে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। অমলেশ লক্ষ্য করল, এবার আর তার পরে ফ্রক নেই, একটা শাড়ি। আরও একটা ব্যাপার তাব নজরে পড়ল, মেয়েটা মুখ তুলছে না

টেবিলটা টেনে এনে তার ওপর চা-খাবার রাখল মেয়েটা। অমলেশ বলল, 'চা হলেই তে হত, অত খাবার কেন?'

খাবার-টাবার দিয়ে জড়সড় হয়ে মেয়েটা দাঁড়িয়ে ছিল। অস্ফুট গলায় বলল, 'মা পাঠি দিলে।'

এ ব্যাপারে আর কী বলা যায়। একটু চুপ করে থেকে অমলেশ জিজ্ঞেস করল, 'নাম কী তোমার?'

'ঝুনু।'

'কোন্ ক্লাসে পড়?'

ঝুনু উত্তর দিল না; বরং মুখটা আরো নীচু করে নখ খুঁটতে লাগল। অমলেশ আবার বলল 'কী, চুপ করে কেন?'

এবার ফিসফিস করল ঝুনু, 'আমি স্কুলে পড়ি না।'

'কেন?' প্রশ্নটা করেই অমলেশ টের পেল, কানে বিশ্রী বেজেছে।

ঝুনু বলল, 'স্কুলে পড়তাম, ক্লাস এইটে। মাইনে বাকি পড়েছিল বলে নাম কেটে দিয়েছে। একটু থেমে উজ্জ্বল উৎসাহিত মুখে আবার বলল, 'দাদা ক'দিন আগে বোম্বে থেকে লিখেছিল শিগ্‌গির অনেক টাকা পাঠাবে। তখন আবার স্কুলে ভর্তি হব।'

চমকে তার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিল অমলেশ। একটু নীরবতা। তারপরই ঝুনুই বলল, 'খবরের কাগজ পড়বেন?'

'আছে?'

'আমাদের নেই। পাশের বাড়ির বুলাদের আছে।'

অন্যের কাগজ; অমলেশ ইতস্তত করতে লাগল। ঝুনু বোধহয় তার মনের কথাটা পড়তে লাগল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ওরা খুব ভাল; কাগজ আনলে কিছু মনে করে না। রোজ তো বাবাকে এনে দিই।'

ঝুনুর আগ্রহ এত বেশি যে 'না' বলতে পারল না অমলেশ, 'আচ্ছা আনো—'

ঝুনু চলে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে অমলেশ বলল, 'আমি এত খেতে পারব না; এসো ভাগাভাগি করা যাক।'

ঝুনু মুহূর্তে গুটিয়ে গেল যেন, কুণ্ঠিত সুরে বলল, 'না—'

'নাও বলছি। লজ্জা করতে নেই।'

'উঁহু—'

'কি বোকা মেয়ে রে! খাবার জিনিস পেলে টপ করে যে মুখে পুরতে হয় তাও জানে না। নাও নাও—দাদারা বললে নিতে হয়।'

কোনরকমে একটা সিঙাড়া তুলে নিয়ে আর দাঁড়াল না ঝুনু, ছুট লাগাল। কিছুক্ষণ পর খবরের কাগজ নিয়ে ফিরে এল সে।

চা, খাবার এবং খবর-কাগজ অন্যমনস্ক করে ফেলল। কতক্ষণ পর মনে নেই, খবর-কাগজ থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পেল, ঝুনু দাঁড়িয়ে। একটু অবাক হয়ে অমলেশ বলল, 'এ কি, দাঁড়িয়ে কেন? বোসো না।'

ঝুনু বসল না। সস্নেহে তার একটা হাত ধরে নিজের পাশে বসিয়ে দিল অমলেশ। বলল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না।'

অমলেশের মনে হল, ঝুনু কিছু বলতে চায়। জিজ্ঞেস করল, 'আমায় কিছু বলবে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ঝুনু। ফিসফিসিয়ে বলল, 'অনেকদিন দাদাকে দেখি না। বড্ড দেখতে ইচ্ছা করে।'

ঝুনু কার কথা বলছে অমলেশ বুঝতে পারল। কে জানত এ বাড়িতে যার সঙ্গে যে বিষয়েই কথা হোক নবেন্দুর প্রসঙ্গ এসে পড়বেই। বুকের ভেতর শ্বাস আটকে চুপ করে থাকল সে।

ঝুনু আবার বলল, 'আপনি বোম্বেতে ফিরে দাদাকে একবার আসতে বলবেন। বলবেন তো?'

আড়ষ্ট অস্পষ্ট গলায় কী উত্তর দিল, অমলেশের নিজের কাছেই তা পরিষ্কার না।

ঝুনু এবার উঠে পড়ল, 'এখন যাই।' বলে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে হঠাৎ কী মনে পড়তে ঘুরে দাঁড়াল। বিষণ্ণ সুরে বলল, 'থাক, দাদাকে আসতে বলবেন না।'

অমলেশ বিমূঢ়, হতবাক। বলল, 'কেন?'

ঝুনু বলতে লাগল, 'মনে ছিল না, এখানে আসা দাদার বারণ। এলেই পুলিশ ধরবে।' বলে আস্তে আস্তে চলে গেল।

অমলেশ কার কাছে যেন শুনেছিল নবেন্দুকে এই জেলা থেকে 'এক্সটার্ন' করা হয়েছে। এই মুহূর্তে তার নাম মনে করতে পারল না। শুধু বিভ্রান্ত পীড়িত স্নায়ুর ভেতর থেকে কেউ ফিসফিসিয়ে অবিরত বলতে লাগল, 'পালাও পালাও—'

৫

চা আর খবর-কাগজ শেষ করার পর চোখের পাতা কখন সীসের মতো ভারী হয়ে ছিল, মনে নেই। অমলেশও শুয়েও পড়েছিল। হঠাৎ বারান্দা থেকে ফিসফিসানি তার কানে এল। কণ্ঠস্বরে চিনতে পারল নীলা আর নবেন্দুর মা।

নবেন্দুর মা বলছেন, 'গোটা পাঁচেক টাকা দে নীলি—'

নীলা বলল, 'টাকা কোথায়?'

'কিছু বাজার-টাজার করা তো দরকার। ঘরে কিছু নেই, ছেলেটা এল। একটু মাছ, এব
তরকারি তার সামনে ধরে দিতে না পারলে কেমন দেখায়।'

'সত্যি বলছি মা, আমার কাছে একটা টাকা আর অল্প কিছু রেজগি ছাড়া কিছু নেই। ও
যদি তোমাকে দিয়ে দি, আজ বেরুব কী করে? তা ছাড়া—'

'তা ছাড়া কী?'

'সেদিন অতগুলো টাকা তোমায় দিলাম, এর ভেতর খরচ হয়ে গেল?'

'অতগুলো মানে? মোটে তো ষাটটা টাকা। সংসারটা কত বড় খেয়াল আছে। চার বে
এই গুষ্টির হাঁ বুজোতে কী লাগে টের পাস? তোর তো ধারণা মায়ের পেটটা জালার মতে
দিন রাত চার হাতে সেই জ্বালা বুজোচ্ছে।' নবেন্দুর মায়ের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত তিক্ত।

নীলা করুণ গলায় বলল, 'তুমি শুধু শুধু সব কিছু নিজের ওপর টেনে নিচ্ছ মা। আ
কি বলেছি তোমার পেটটা জালার মতো, দিনরাত সেটা তুমি বুজিয়ে যাচ্ছ? সংসার বাঁচা
জন্যে চেষ্টা কি আমি কম করছি?'

'রাগ করিস না মা; নানান জ্বালায় মাথার আমার ঠিক নেই। এক মাস হল নবু টা
পাঠাচ্ছে না। তার আগেও ক'মাস পাঠায় নি। সংসার কিভাবে চলছে!'

নীলা বলল, 'ওসব কথা থাক এখন। বুলাদের বাড়ি থেকে পাঁচটা টাকা ধার করে আনে

নবেন্দুর মা বললেন, 'ওদের কাছে আর হাত পাতা যায় না। কাল দেব পরশু দেব ক
কতবার যে টাকা এনেছি, ফেরত আব দেওয়া হয় নি।'

'তবু আরেকবার যাও। পরশু ঠিক দিয়ে দেব।'

'কী করে যে গিয়ে হাত পাতব!'

নীলা বলল, 'দোষ তো তোমারই। তোমাব জন্যই তো এই ঝঞ্ঝাট বাধল।'

ঈষৎ রুক্ষ গলায় নবেন্দুর মা শুধোলেন, 'কেন, কী কবেছি আমি?'

'ভদ্রলোক নিজে থেকে চলে যেতে চেয়েছিলেন; তুমি তাঁকে আটকালে। নিজেদের এ
অবস্থা, এর ভেতর ওঁকে না রাখলে চলত না?'

'না, চলত না। নবুর সঙ্গে ওর যা সম্পর্ক তাতে চলে যেতে দেওয়া যায় না।'

নীলা আর বিশেষ কিছু বলল না, নীচু গলায় গজ গজ করতে লাগল।

অমলেশের জন্যই যে এরা বিব্রত বিপন্ন, বলে না দিলেও চলে। সব জেনেও সব বুঝে
এই মুহূর্তে আর পালানো যায় না। হঠাৎ অমলেশের মধ্যে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটে
আচ্ছন্ন ঘুমের ভাবটা আগেই ছুটে গিয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে নিজের পকেট থেকে কি
টাকা নিয়ে বাইরে এল সে। ডাকল, 'মাসিমা—'

নবেন্দুর মা আর নীলা এখনও যায় নি; বারান্দার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। ডাকটা কা
যেতে দুজনেই চোখ ফেরাল। নবেন্দুর মা পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন, 'কি বাবা, এখন
ঘুমোও নি?'

'ঘুম আসছিল, হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে উঠে এলাম।'

'কী কথা?'

'আসার সময় নবেন্দু আমার হাতে শ'দেড়েক টাকা দিয়েছিল, আপনাদের দিতে বলে
নানা কথায় একদম ভুলে গিয়েছিলাম—এই নিন।' টাকাটা এগিয়ে দিল অমলেশ।

হাত পেতে নিতে নিতে নবেন্দুর মায়ের চোখ আলোকিত হয়ে উঠল, তাই তো ব
এখনও টাকা আসে না কেন? সংসার সম্বন্ধে অত দায়িত্ব যে ছেলের, অত মমতা, সে কে

নও টাকা পাঠাচ্ছে না? দাঁড়াও বাবা, তোমার মেশোমশাইকে খবরটা দিয়ে আসি।' বলে জানালা-বন্ধ ঘরটার দিকে ছুটলেন।

আবেগের বশে টাকাটা দিয়েই অমলেশ বুঝতে পারল, অদৃশ্য সেই ফাঁসটা নিজের গলায় ভাল করেই বেঁধেছে, এ সে কী করল? অবচেতনে কিছু টাকা সাহায্য করার লোভটা হঠাৎ ায় চাড়া দিয়েছিল কিনা বলতে পারবে না। কিন্তু দেড়শ' টাকা দিয়ে এ কোন্ নিদারুণ বিপদ ন বসল সে? নবেন্দু পাঠিয়েছে বলে তো দাতাকর্ণ সাজল; কিন্তু তারপর? তারপর কেমন মৃত্যুর খবরটা দেবে? অমলেশের চার ধারে পৃথিবী যেন দুলতে লাগল। তার মনে হতে াল, ফুসফুসে টানার মতো পর্যাপ্ত বাতাস এখানে নেই।

এলোমেলো স্খলিত পায়ে দক্ষিণ-দুয়ারী সেই ঘরটার দিকে যেতে গিয়ে হঠাৎ অমলেশের পড়ল সেই মেয়েটা, নীলা স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ বাড়িতে দেখা হবার পর ক কেন নীলা ঐ ভাবে তাকিয়ে থাকছে? তার চোখ কেন এত তীব্র, এত তীক্ষ্ণ এবং ভেদী? অমলেশ তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিজের সেই ঘরখানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ ান্ত অস্থির ইন্দ্রিয়ে ঝড় বইতে লাগল। তারপর কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল, জানে না।

ঘুম ভাঙল ঝুনুর ডাকে। চোখ মেলে অমলেশ দেখল, কোথায় সেই গলানো গিনির মতো দ, কোথায় পাখি, আর কোথায়ই বা ঝিরঝিরে বাতাস। কোন এক জাদুকরের ইঙ্গিতে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আকাশ জুড়ে এখন সাজ সাজ রব; টুকরো টুকরো কালো মেঘ ইতস্তত ানো; থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকে যাচ্ছে; ভিজে ভিজে পুবে বাতাস দিগ্বিদিকে ছুটছে। বর্ষার টা সকাল থেকে ঘণ্টা কয়েক চুপিসারে শরৎকালের মজা লুট করে আবার তার আপন াবে ফিরে যেতে শুরু করেছে।

ঝুনু বলল, 'খেতে চলুন। মা ডাকছে—'

নিঃশব্দে উঠে তার পিছু পিছু পুবদিকের একটা ঘরে চলে এল অমলেশ। মাঝখানে পাড়ের া দিয়ে ফুল-লতা-পাতা বোনা একটা সুদৃশ্য আসন; তার সামনে ঝকঝকে কাঁসার থালায় -ভাজা টাজা ঘিরে জলের গেলাস, বাটিতে বাটিতে তরকারি, মাছ, ডাল। একটা কাচের টি দই এবং বড় একখানা সন্দেশও চোখে পড়ল। থালার অদূরে নবেন্দুর মা বসে আছেন; মধ্যে স্নান-টান সেরে নিয়েছেন, চুলগুলো এলোমেলো খোঁপায় আবদ্ধ, চওড়া কপালে মস্ত ্রের টিপ। তাঁর ডান পাশে মীনা দাঁড়িয়ে। ঝুনু অমলেশকে ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে চলে ছ।

নবেন্দুর মা বললেন, 'বোসো বাবা, বোসো। অনেক বেলা হয়ে গেল; এত বেলায় নিশ্চয়ই মার খাবার অভ্যেস নেই।'

অভ্যাস সত্যিই নেই। সপ্তাহের আর সব দিনে তো বটেই, ছুটির দিনও সাড়ে ন'টার ভেতর যা-দাওয়া চুকিয়ে ফেলে অমলেশ। তাদের বাড়িতে তাই নিয়ম। এখন প্রায় একটা বাজতে ছে। ভদ্রতার খাতিরে বলতেই হল, 'অভ্যেস-টভ্যেসের বালাই আমার নেই; যখন হোক লই হল।'

আসনে বসতে বসতে আঁতকে ওঠার মতো করল অমলেশ, 'আমি কিন্তু এত খেতে পারব মাসিমা। সব বাটি থেকে আদ্ধেক আদ্ধেক তুলুন—'

বিষণ্ণ হাসলেন নবেন্দুর মা, 'তোমাদের কথা নবু আমাদের জানিয়েছে। তোমরা কী খাও, আন্দাজ করতে পারি, তোমার পাতে কী সাজিয়ে দিয়েছি আমি তো জানি। একে যদি নক বল, 'বেশি' বল, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যায়।' একটু থেমে আবার বললেন,

'এমন দিনে আমাদের বাড়ি এলে যখন আমরা পথের ভিখিরি। সুদিনে যদি আসতে বাবা বলতে বলতে তাঁর স্বর ভারী বিষাদে বুজে এল।

এ ব্যাপারে অমলেশের মুখে কোন উত্তর যোগাল না। সুদূর বোম্বাই থেকে সে এদের কা মৃত্যুর খবর বয়ে এনেছে, সে নিদারুণ এক বার্তাবহ। অথচ তারই সামনে এঁরা সযত্নে না সুখাদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন। এত আদর, এত আপ্যায়ন, এত আতিথেয়তা—সব যেন দুঃসহ ম হতে লাগল।

অথচ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, এমন এক জায়গায় সে পৌঁছে গেছে যেখানে দাঁড়ি মৃত্যুর কথা বলা যায় না। যাই হোক, জোর করে অন্যমনস্ক হবার জন্য অমলেশ বলল, 'আ একাই খাব নাকি? সবাই এক সঙ্গে বসলে হত না? খাবার-টাবারগুলো মাঝখানে রেখে আ সকলে বসি, আপনিও বসুন।'

'পাগল ছেলে—' সস্নেহে নবেন্দুর মা হাসলেন, 'ছেলেদের খাওয়া না হলে বাড়ির মেয়ে কি বসতে পারে বাবা। ভাল কথা—' মীনার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'হীরু আর নি কোথায় রে? সেই সকাল থেকে যমের অরুচি দুটোকে দেখছি না। ওরা থাকলে না অমলেশের সঙ্গে বসতে পারত। পড়াশোনা ছেড়ে দুটো বাঁদর তৈরি হচ্ছে—' হীরু আর নি খুব সম্ভব নবেন্দুর ভাই, তার মুখে দুই ভাইয়ের কথাই যেন শুনেছিল অমলেশ। এ বাড়ি আসার পর অবশ্য তাদের দেখেনি।

মীনা বলল, 'হীরু তো ভোরবেলা কলকাতায় গেল। ওদের ক্লাবে ফাংসন আছে—কলকা থেকে আর্টিস্ট আনবে। নিতু কোথায় জানি না।'

বিরক্ত স্বরে নবেন্দুর মা অমলেশকে বললেন, 'হাড় একেবারে ভাজা-ভাজা করে দিল। তু বোম্বাইতে গিয়ে নবুকে বোলো তো, ওরা একদণ্ড বাড়ি থাকে না। দিনরাত বাঁদরামি ক বেড়াচ্ছে।'

আবার সেই নবেন্দুর কথা, রুদ্ধশ্বাসে অমলেশ জানাল, 'বলব।'

নবেন্দুর মা বললেন, 'কত্তাকেই বসতে বলতাম কিন্তু ওর অবস্থা তো নিজের দেখেছ। বিছানা থেকে উঠতে পারেন না। তুমি একাই খাও বাবা ওবেলা 'হীরু-নিতু' এলে সঙ্গে বোসো।'

এ বাড়ি কি পুরনো চালে চলছে? অর্থাৎ মেয়ে-পুরুষের এক সঙ্গে বসে খাওয়ার রেওয় চালু হয় নি? অমলেশ বলতে যাচ্ছিল, 'মীনা আর বুনু তো ছেলেমানুষ, ওরা আমার বসতে পারে।' কিন্তু তার আগেই একখানা আসন হাতে করে ব্যস্তভাবে এ ঘরে এসে ঢু নীলা। তাড়াতাড়ি আসন পেতে বসতে বসতে বলল, 'কারোকে যখন পাওয়া যাচ্ছে না ত আমিই ওঁর সঙ্গে বসছি। ভাত দাও মা, দুটোর ট্রেনটা ধরব। চারটের ভেতর কলকা পৌঁছতে না পারলে মুশকিল হবে।' বলতে বলতে জানালার বাইরে তাকাল, 'ইস কি মেঘ না করেছে! বৃষ্টি নামলে বেরুতে পারব না। তাড়াতাড়ি দাও মা, খেয়েই বেরিয়ে পড়ি। স্টেশ গিয়ে না হয় খানিকক্ষণ বসে থাকব।'

দুটো ব্যাপার লক্ষ্য করল অমলেশ। নীলা ইতিমধ্যে স্নান সেরে নিয়েছে। চোখের কো কাজল টানা, মুখে হাল্কা পাউডার বুলনো, পরিপাটি করে চুল বাঁধা, ইত্যাদি ইত্যাদি টুকিটা প্রসাধন শেষ। এখন শুধু শাড়িটা জামাটা বদলে নিলেই সাজটা সম্পূর্ণ হয়।

আরেকটা ব্যাপার, নীলার বেরুবার কথা শুনেই নবেন্দুর মায়ের মুখ শক্ত হয়ে চোখের দৃষ্টি স্থির। মেয়ের জন্য ভাত বাড়তে বাড়তে বললেন, 'এখন তো বেরুচ্ছ, কখন?'

নীলা বলল, 'লাস্ট ট্রেনের আগে ফিরতে পারব বলে তো মনে হয় না।'

রোজ রোজ লাস্ট ট্রেনে ফেরা, কী যে তোমার অভ্যেস হচ্ছে!' নবেন্দুব মায়ের গলা চাপা ানাল।

'কী করব বল, চাকরি—' বলেই অমলেশের দিকে তাকাল নীলা।

নীলার সামনে ভাতের থালা দিয়ে নবেন্দুর মা বললেন 'ঐ একটা কথা তো আছেই। ড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা কোরো।'

মুখ নামিয়ে আস্তে করে নীলা বলল, 'আচ্ছা—'

অমলেশ চুপ করে বসে ছিল। নবেন্দুর মা এবার তার সম্বন্ধে সচেতন হলেন বুঝি। ালেন, 'ও কি, তুমি এখনও হাত গুটিয়ে বসে আছ! নাও—নাও, শুরু কর—' নিয়ম ুযায়ী খিদে পাওয়া নিশ্চয়ই উচিত, নানারকম লোভনীয় খাদ্যও চারদিকে সাজানো কিন্তু বার মতো বিন্দুমাত্র উৎসাহ নিজের মধ্যে খুঁজে পেল না অমলেশ। বাঙলাদেশের মায়েদের াখে ধুলো ছিটনো সহজ না। নবেন্দুর মা, 'এটা খাও, ওটা খাও, পটলের তরকারিটা ফেলে ালে হবে না' ইত্যাদি হাজার রকম বলে কত যে খাওয়ালেন, হিসেব নেই। মীনা রান্নাঘর কে মাঝে মাঝে ভাত মাছ এনে তাঁকে সাহায্য করতে লাগল। খাওয়া যে সব সময় আনন্দময় ভিজ্ঞতা না, কখনও কখনও তা অত্যন্ত কষ্টদায়ক আর ভয়াবহ—এমন কথা আগে অমলেশের না ছিল না। খেয়ে যাচ্ছে ঠিকই, প্রচুর পরিমাণে খাচ্ছে, কিন্তু অসাড় অবোধ জিভ স্বাদ বা ন্ধ কিছুই বুঝতে পারছে না।

শুধু খাওয়ানোই না, ফাঁকে ফাঁকে অন্য গল্পও হতে লাগল। অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই এক রফা। নবেন্দুর মা রমণীসুলভ কৌতূহলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের সংসারের যাবতীয় খবর গ্রহ করতে লাগলেন। অমলেশের ভাইরা কে কী করে, বৌদিরা কে কতদূর পড়াশুনা রেছেন, বাবার রিটায়ারমেন্টের পর ক'বছর কাটল, বাঙলাদেশে স্থায়ীভাবে ফেরার ইচ্ছা ছে কিনা, বিয়ে করেছে কিনা, যখন শুনলেন করে নি তখন শুধোলেন কেন করে নি, করবার চ্ছে আছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি কত প্রশ্ন যে করলেন নবেন্দুর মা আর অমলেশও একের এক উত্তর দিয়ে যেতে লাগল।

কথায় কথায় কখন যে অনিবার্যভাবে নবেন্দুর প্রসঙ্গ এসে পড়েছিল, টের পায় নি অমলেশ। াপারটা অমোঘ নিয়তির মতো, ঘুরে ফিরে অজ্ঞাতসারেই হোক আর আগে থেকে জানা য়েই হোক, সেটা এ বাড়িতে এসে পড়বেই।

নবেন্দুর মা বললেন, 'আচ্ছা অমলেশ—'

থালা থেকে মুখ তুলে তাকাল অমলেশ। নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'নবু তো আন্ধেরীতে কে। বোম্বাইতে তোমরা যেখানে থাকো সেখান থেকে ঐ জায়গাটা কতদূর?'

'বেশি দূর না, কাছেই। মাইল তিন-চারেক হবে।'

'তুমি নবুর ওখানে যাও?'

'অমলেশের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই পুরনো শ্বাসরুদ্ধ ভাবটা বুকের ভেতর নুভব করতে লাগল সে। ভেতরে ভেতরে ভয়ানক ছটফট করছে, হঠাৎ তার চোখে পড়ল ওয়া থামিয়ে নীলা তার দিকে তাকিয়ে আছে। আশ্চর্য, সকালবেলা তার এ বাড়িতে পা বার পর থেকে যখনই নবেন্দুর কথা উঠেছে তখনই অদৃশ্য কিছুর ইঙ্গিতে নীলা সামনে কে। শুধু থাকেই না, দৃষ্টি নিবদ্ধ করে থাকে। বিচিত্র এক অস্থিরতা অমলেশকে পেয়ে বসল ন।

একদৃষ্টে নীলা তাকিয়ে আছে। তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে ঝাপসা শিথিল সুরে অম
বলল, 'মাঝে মাঝে যাই—'। অথচ নবেন্দুর মৃত্যুর পর একবারই মাত্র আন্ধেরী গিয়েছিল, ত
ঠিকানা খুঁজে পায় নি।

নবেন্দুর মা বললেন, 'নবু একটা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে, কত বড় ঘরটা?'

চোখ-কান বুজে সাগরে ঝাঁপ দেবার মতো করে অমলেশ বলল, 'মাঝারি—'

'আলো-বাতাস খেলে?'

'হ্যাঁ।'

'খাওয়া-দাওয়া কোথায় করে? নিজের হাতে রাঁধে না হোটেলে খায়? খুব কম চিঠি লে
নবু; দরকারি সব কথাই তাতে থাকে। শুধু খাবার কথাটাই থাকে না।'

অমলেশের নাক-মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছিল। মরিয়ার মতো বলল, 'নিজেই রাঁধে।'

'সে এক রকম ভাল।' নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'হোটেলের খাওয়া তো পাপের শা
বাসি পচা যা ইচ্ছে দেয়। নবু আমার পেটরোগা ছেলে, ঝাল-টাল বাসি-টাসি একেবারে স
করতে পারে না।'

অমলেশ উত্তর দিল না।

নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'বড্ড খেয়ালী, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক থাকে না। ইচ্ছে হল
দিন না খেয়েই রইল। চোখের আড়ালে অতদূরে থাকে, আমার তো কিছু করবার নেই। তু
বাবা ওকে সময় মতো চান-খাওয়া করতে বোলো।'

অমলেশ ফিসফিসিয়ে জানাল। 'বলব'।

নবেন্দুর মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে নবুর আলাপ হয়েছে, এতে একদিক থেকে অ
নিশ্চিন্ত। নবু জানিয়েছে, তুমি ওকে ছোট ভাইয়ের মতো দ্যাখো। দরকার হলে বকবে, শা
করবে।'

অবরুদ্ধ গলায় অমলেশকে বলতে হল, 'করব।'

একটু চুপ। তারপর নবেন্দুর মা নীরবতা ভাঙলেন। আচ্ছন্ন বিষাদময় সুরে বলে
'নবুকে নিয়ে আমার বড্ড ভাবনা অমলেশ। চোখের সামনে তো নেই, প্রাণটা তাই সব স
অস্থির হয়ে থাকে। তুমি তো ওর সব কিছুই জানো বাবা—'

অমলেশ আস্তে করে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ জানে।

'পাকিস্তান হবার পর চলে এলাম। এমনই অদৃষ্ট এখানে এসে উনি পক্ষাঘাত হয়ে বিছা
পড়লেন। আর সারা সংসারটার দায়িত্ব গিয়ে পড়ল নবুর ওপর। চাকরি-টাকরি না পে
খারাপ পথে ওকে যেতে হল। অথচ—'

এ সব কথা অমলেশের জানা। কী বলবে ভেবে পেল না।

নবেন্দুর মা বিষাদময় স্বরে সমানে বলে যাচ্ছেন, 'অথচ কত ভাল ছাত্র ছিল আমার ন
ম্যাট্রিক, আই.এ.ফার্স্ট ডিভিসনে পাশ করেছিল, দুটো করে লেটার পেয়েছিল। কিন্তু কী
তাতে, কিছুই না। আচ্ছা—'

'বলুন—'

'বোম্বাইতে ও কী করে বল তো? কিছুই জানায় না।'

খানিকক্ষণ থতিয়ে থেকে অমলেশ বলল, 'অফিসে অফিসে ছোটখাটো জিনিস সা
করে।'

নবেন্দুর মা বললেন, 'নবু লিখেছিল তুমি ওর জন্যে একটা চাকরির চেষ্টা করছ। এব
কাজ জুটিয়ে দিয়ে আমাদের বাঁচাও অমলেশ।'

কী একটা বলতে চেষ্টা করল অমলেশ কিন্তু গলার ভেতর দিয়ে অবরুদ্ধ গোঙানির মতো াওয়াজ ছাড়া আর কিছুই বেরিয়ে এল না। খাওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হাত কিয়ে কড়কড়ে। এক সময় উঠে পড়ল অমলেশ। আর উঠেই নীলার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গল। সেই চোখ তেমনই তীক্ষ্ণ, তেমনই দূরভেদী। এই মুহূর্তে তাতে কিসের ছায়া যেন ঘন য়েছে।

৬

আঁচিয়ে দক্ষিণ-দুয়ারী সেই ঘরখানায় এসে শুয়ে পড়ল অমলেশ। সকালবেলা টানা চ্ছুক্ষণ ঘুমিয়েছে, তবু তিন দিনের ক্লান্তির বেশ খানিকটাই শরীরময় ছড়িয়ে রয়েছে। ছানায় নিজেকে সঁপে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম আসার কথা, কিন্তু এল না। চোখের পাতায় াজাব কাঁটা বিঁধছে রক্তের দ্রুতগামী ঢল হৃৎপিণ্ডে অবিরাম ঘা দিয়ে যাচ্ছে।

অমলেশকে পালাতে হবে। এখনই, এই মুহূর্তে। নবেন্দু যা বলেছিল তার সত্যাসত্য যাচাই রার সাধ তার কেন যে হয়েছিল? এখানে আর কিছুক্ষণ থাকলে সে উন্মাদ হয়ে যাবে।

আজকের বর্ষাটা যেন বহুরূপী। খেতে যাবার আগে আকাশ জুড়ে যার আয়োজন েখেছিল অমলেশ, এখন তার চিহ্ন নেই। হঠাৎ উত্তুরে বাতাস ছেড়ে মেঘগুলোকে উড়িয়ে য়ে যাচ্ছে।

একটু সুযোগ পেলেই অমলেশ পালাবে। নিজের হাতে গলায় যে ফাঁস পরেছে তা তাকে টাতেই হবে। এলোমেলো বিশৃঙ্খল নানা ভাবনা ঝড়ের মতো তার ওপর দিয়ে বইতে াল।

দু-চোখের ওপর হাত রেখে শুয়ে ছিল অমলেশ। হাল্‌কা পায়ের শব্দে হাত সরিয়ে াকাল, নীলা এসে দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে কেন জানে না, মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে বরফের াত বয়ে গেল, ধড়মড় করে উঠে বসল অমলেশ।

নীলা বলল, 'ঘুমুচ্ছিলেন?'

'না।' আস্তে মাথা নাড়ল অমলেশ।

একটু চুপ করে থেকে নীলা বলল, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম। মেঘ কেটে চ্ছে, একটু দেরি করে বেরুলেও ট্রেন ধরতে পারব। তাই—'

বুকের ভেতবকার অসহ্য কাঁপুনি গোপন রেখে অমলেশ বলল, 'বেশ তো বসুন না—'

একটা মোড়া টেনে অমলেশের বিছানার অদূরে বসল নীলা। বলল, 'আলাপ অবশ্য ালই হয়েছে; কেউ কারো নাম-ধাম কিংবা পরিচয় জানতাম না।'

'হ্যাঁ।'

'আমার পরিচয় জানবার পর কী রকম লাগল?'

সঠিক উত্তরটা জানা ছিল, বলতে গিয়ে থমকে গেল অমলেশ।

নীলা বিচিত্র হাসল, 'আমাকে এ বাড়িতে দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছেন।'

'তা একটু হয়েছি।'

'অবাক হবার কিন্তু কিছু ছিল না।'

বিমূঢ়ের মতো অমলেশ বলল, 'কেন?'

'আপনি আমার দাদার কথা কতটুকু জানেন?' নীলা সোজাসুজি অমলেশের চোখের ভতর তাকাল।

মেয়েটা কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল অমলেশ।

কণ্ঠস্বর অতলে নামিয়ে নীলা এবার ফিসফিস করল, 'আপনি কি জানেন আমার দ নামকরা ওয়াগন-ব্রেকার, এই ডিস্ট্রিক্ট থেকে তাকে এক্সটার্ন করে দেওয়া হয়েছে?'

'শুনেছি।'

'যার ভাইয়ের ব্যাকগ্রাউন্ড এইরকম তার বোন আর কী হতে পারে? কাল রাত্রির ট্রে যা দেখেছেন—'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। অমলেশ বলল, 'আচ্ছা—'

'কী?'

'কালকের ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ওভাবে পুলিশ লেগেছিল কেন আপন পেছনে?'

'বুঝতে পারেন নি!' দু-চোখে অপার বিস্ময় ফুটিয়ে একমুহূর্ত তাকিয়ে রইল নীলা। পরক্ষ চাপা রিনরিনে শব্দ করে হেসে উঠল। কিছুক্ষণ ; তারপর হাসিটা থামিয়ে দিয়ে সেই আগে মতো ফিসফিস গলায় বলল, 'আপনি দেখছি একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু!'

নীলার ধিক্কার গায়ে মেখে রইল অমলেশ।

নীলা আরো গলা নামাল, 'আমার মতো মেয়ের পেছনে পুলিশই লাগে রাজপুত্তুর ঘুর করে না। বুঝলেন?'

অমলেশ স্তম্ভিত, হতবাক।

নীলা স্বর পাল্টে বলল, 'সে যাক গে, আপনার সঙ্গে একটা চুক্তি কর এসেছি—জেন্টল্‌ম্যান্‌স্‌ এগ্রিমেন্ট।'

অমলেশ চমকে গেল, 'কিসের চুক্তি?'

'কাল ট্রেনে যা দেখেছিলেন আমার মা-বাবাকে বলবেন না।'

'বলা যে বারণ তা আগেই বুঝেছি।'

'কখন বুঝলেন?'

'ঐ যে তখন ইশারা করলেন।'

এই সময় ঝুনু ঘরে এল। বলল, 'দিদি তুমি বেরুবে না আজ? মা জিজ্ঞেস করল। দেড় কিন্তু বাজে—'

চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল নীলা। বলল, 'ইস, কথায় কথায় অনেক দেরি হয়ে গেছে। এক্ষু আমাকে ছুটতে হবে।'

কথা ক'টা বলেই ঝুনু চলে গিয়েছিল। নীলা বলল, 'আপনার সঙ্গে আরেকটা কথা আছে

'কী?' অমলেশ চোখ তুলে তাকাল।

'দাদার সম্বন্ধে।'

রুদ্ধস্বরে অমলেশ বলল, 'নবেন্দুর?'

আস্তে মাথা হেলাল নীলা, 'হ্যাঁ।'

'কী কথা?'

'ফিরে এসে বলব। তার আগে চলে যাবেন না যেন।' নীলা বেরিয়ে গেল।

৭

অমলেশ যেখানটায় বসে আছে তার মুখোমুখি বাঁশের চৌকো খোপ-কাটা একটা জানল তার বাইরে সেই রাস্তাটা; সোজা দক্ষিণ-গামিনী হয়ে যেটা স্টেশনের দিকে চলে গেছে। খানি আগে ঐ পথটা ধরেই সে এখানে এসেছে।

বুকের ভেতর অসীম উদ্বেগ নিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিল অমলেশ। কিছুক্ষণ পর চোখে পড়ল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে নীলা ঐ রাস্তাটায় গিয়ে উঠল, তারপর অলস মন্থর পায়ে স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল। হাতে এখনও অঢেল সময়—প্রায় পঁয়ত্রিশ মিনিটের মতো। কাজেই ছোটাছুটির প্রয়োজন কী? আয়েশ করে নিশ্চিন্তে এই পথটুকু পাড়ি দিলেই চলবে।

অমলেশ লক্ষ্য করল অতি সাধারণ বেশবাস নীলার। একটা ফর্সা হলুদ শাড়ি আর লাল জামা পরেছে। প্রসাধনের নমুনা তো খেতে বসেই দেখেছে। সেদিনকার ট্রেনে দেখা রাজেন্দ্রাণীর বেশের চিহ্নমাত্র তার ভেতর খুঁজে পাওয়া গেল না।

দেখতে দেখতে বাড়িঘর আর গাছপালার আড়ালে নীলা মিলিয়ে গেল। তারপরও অনেক্ষণ বসে থাকল অমলেশ। আর অনুভব করতে লাগল, দেহের প্রতিটি রক্তকণা চিৎকার করে বলছে, 'পালা—পালা—'

পালাতে তাকে হবেই। ঐ মেয়েটা—নীলা—নীলা চ্যাটার্জি ফিরে আসার আগেই বীজপুরের চৌহদ্দি পেরিয়ে বহু বহু দূরে চলে যাবে অমলেশ।

আরো খানিক ঘুমিয়ে নিতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে হয়ে যেত; সারা গায়ে এখনও অনেকখানি ক্লান্তি মাখা। কিন্তু এবার আর শুতে পারল না অমলেশ। ক্লান্ত শরীরকে বিশ্বাস নেই, শুলে কতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়বে কে বলবে। হয়তো বিকেল পেরিয়ে যাবে, হয়তো সন্ধ্যে নেমে যাবে। ঘুমোতে গিয়ে অতখানি ঝুঁকি নেওয়া উচিত হবে না তার।

বসে বসে ভাবতে লাগল অমলেশ, কোন্ ছলে এ বাড়ি থেকে বেরুনো যায়। তার ডান ধারে সেই সস্তা টেবিলটা; তার ওপর চীনেমাটির ফুলদানি, টাইমপিস, খানকতক গল্পের বই। বুলাদের বাড়ি থেকে ঝুনু যে খবর-কাগজখানা এনেছিল, সেটা আর দিয়ে আসা হয় নি; টেবিলের ওপরেই পড়ে আছে। এ সবের ফাঁকে একটা পুরনো অ্যালবাম অমলেশের চোখে পড়ল। মলাটটা কোন এক সময় কালোই ছিল, রং জ্বলে গিয়ে সেটা এখন ধূসর।

অন্যমনস্কের মতো অ্যালবামটা তুলে নিয়ে ওলটাতে লাগল অমলেশ। তার চোখের সামনে দিয়ে ছবির পর ছবি চলে যেতে লাগল। নীলা, নবেন্দু, মহীতোষ কিংবা তাঁর স্ত্রী ছাড়া অন্য সব মুখ তার অচেনা। দেখেই বোঝা যায় ছবিগুলো অনেক কাল আগের তোলা; সাদা অংশগুলো হাতে হাতে নোংরা হয়ে গেছে। যে সময়ে এগুলো তোলা হয়েছে তখন নবেন্দুদের সংসার বেশ সচ্ছলই ছিল অনুমান করা যায়; প্রাণে শখের অবকাশ ছিল।

ছবি দেখছে ঠিকই কিন্তু অমলেশের মনে কিংবা ভাবনায় সেগুলো বিন্দুমাত্র রেখাপাত করছে না। মাথার ভেতর পালানোর চিন্তাটাই চরকির মতো সমানে ঘুরপাক খাচ্ছে।

হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে মুখ তুলল অমলেশ। দরজার কাছে মীনা দাঁড়িয়ে আছে; চোখাচোখি হতে হাসল। বলল, 'এখান দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম ঘুমোন নি। তাই দাঁড়িয়ে পড়লাম।'

পালানোর চিন্তাটা আপাতত মুলতুবী রেখে অমলেশও হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, ঘুম আসছে না।'

'চান করে অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলেন। তাই হয়তো—'

'হয়তো—'

'জলটল কিছু দরকার আছে?'

'না।'

'না' বলা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকল মীনা। অমলেশের মনে হল, কিছু বলতে চায় সে। বলল, 'ওখানে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো না—'

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল মীনা; টেবিলের ওধার পর্যন্ত এসে দাঁড়িয়ে পড়ল।

অমলেশ বলল, 'ওখানে কেন, কাছে এসে বোসো—'

লাজুক চোখে একবার অমলেশকে দেখে নিয়ে তক্তপোষের দূর প্রান্তে বসল মীনা। আর তখনই তার কোলের ওপর অ্যালবামটা দেখতে পেল সে। উৎসুক সুরে বলল, 'ছবি দেখছেন?'

'হ্যাঁ।' অমলেশ ঘাড় কাত করল, 'কিন্তু—'

'কী?'

'দু একজন ছাড়া আর কারোকেই চিনতে পারছি না।'

'কেমন করে চিনবেন? আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের তো আপনি কখনো দ্যাখেন নি।'

'তা বটে।'

'দাঁড়ান চিনিয়ে দিচ্ছি।' নিজের অজান্তেই বুঝি-বা কাছে এগিয়ে এল মীনা। তারপর কে তার মাসিমা, কে তার পিসিমা, কে দাদার বন্ধু, কে মেশোমশাই, কে কাকা ইত্যাদি ইত্যাদি চেনাতে লাগল। চেনাতে চেনাতে মীনা বলল, 'এ সবই পুরনো ছবি। মা-বাবাকে দেখেছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'আর এই দেখুন ওঁদের ছবি। কী চেহারা ছিল আর কী দাঁড়িয়েছে!'

বিচিত্র এক বিষাদ আলতোভাবে অমলেশকে ছুঁয়ে গেল। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একেবারে নতুন একখানা ফটো বেরিয়ে গেল; সেটা মীনার। মাইকের সামনে বসে গান গাইছে সে—এইরকম ভঙ্গিতে ফটোটা তোলা। দু রকমের বিস্ময় দু দিক থেকে অমলেশকে ঘিরে ধরল। প্রথমত, নতুন ফটো তোলার সখ এ বাড়িতে এখনও আছে! দ্বিতীয়ত, মীনা গায়িকা? মীনার চোখের দিকে তাকিয়ে অমলেশ বলল, 'তুমি যে গাইতে পার তা তো জানতাম না। নবেন্দু তোমাদের সংসারের সব কথা বলতো, এই কথাটাই বলে নি।'

মীনা চোখ নামিয়ে লাজুক সুরে বলল, 'ছাই গাইতে পারি।'

'ছাই-ই যদি হবে মাইকের সামনে কেউ গাইতে বসে। কোথায় গেয়েছিলে।'

'এখানকারই একটা ফাংশানে। ওরাই ফটোটা তুলে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'ফাংশানে গেয়েছ! তবে তো দারুণ আর্টিস্ট। তোমার গান না শুনলে চলছে না।'

অমলেশ মাথা নাড়তে লাগল।

মীনা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি আর কী গাইতে পারি। আমার চাইতে ঢের ভাল গায় দিদি।'

দিদি বলতে নীলা। অমলেশ চকিত হয়ে উঠল, সেই সঙ্গে অবাকও। বিস্ময় এবং উৎকণ্ঠা মেশানো গলায় খানিক দূরমনস্কের মতন বলল, 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় হেলিয়ে দিল মীনা।

'জানা থাকল।' আবার পাতা ওল্টাতে লাগল অমলেশ। ওল্টাতে ওল্টাতে অ্যালবামের ভেতর থেকে ছোট একটি ফটো ঝপ করে মাটিতে পড়ে গেল। তাতে সুদর্শন একটি তরুণের ছবি; কোমল কচি ভাবের সঙ্গে মুখখানিতে মনোরম লাবণ্য মাখানো।

অমলেশ ঝুঁকবার আগেই প্রায় ছোঁ মেরে ফটোটা কুড়িয়ে নিল মীনা, নিমেষে আঁচলের তলায় চালান করে দিল।

প্রথমটা বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল অমলেশ। সেই ভাবটা খানিক কাটলে বলল, 'ওটা কার ফটো?'

মীনার মুখ লাল হয়ে উঠল, মাথাটা অনেকখানি নামিয়ে সলজ্জ বিব্রতভাবে ফিস ফিস করল, 'কারো না।'

'কারো না মানে? পরিষ্কার এক নবীন যুবাকে দেখলাম।'

আগের মতোই না-না করতে লাগল মীনা।

ব্যাপারটা খানিক আন্দাজ করে মনে মনে কৌতুক বোধ করল অমলেশ। হেসে হেসে বলল, 'কারো যখন না তখন লুকোচ্ছ কেন? দাও দেখি—'

'উঁহু—উঁহু—'

'দাও না—'

'আমি কিন্তু তা হলে চলে যাব।' মীনা উঠে পড়ল।

অমলেশ আর পীড়াপীড়ি করল না। তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'থাক্, ওটা দেখাতে হবে না। তুমি বোসো।'

মীনা কুণ্ঠিতভাবে আবার বসল। এলোমেলো অসংসগ্ন দু-চারটে কথার পর আবার ছবি দেখা শুরু হল। একেকটা ফটো বেরুচ্ছে; অমলেশ জিজ্ঞাসা কবছে, 'কে?' মীনা কখনও বলছে, খুড়তুতো ভাই,' কখনও 'দাদামশাই', ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইভাবে চলতে চলতে একবাব অমলেশ বলল, 'এটা কার ছবি?'

মীনা উত্তর দিল না।

আবার জিজ্ঞেস করল অমলেশ। এবারও মীনা চুপ।

অমলেশের চোখ ছিল অ্যালবামে নিবদ্ধ। মুখ তুলতেই দেখতে পেল, মীনা গলা উঁচু করে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। তার মুখে গভীর রেখায় উৎকণ্ঠা আর ভীত চকিত একটা ভাব আঁকা। শুধু তাকিয়েই নেই, চোখ এবং হাতের ইশারায় কাকে যেন চলে যেতে বলছে মীনা।

বাইরে তাকাতেই অমলেশ দেখতে পেল. নীলাদের বাড়ির সীমানা উঁচু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা; তার ওধারে একটা মাথা চট করে নেমে গেল।

অমলেশ শুধোল, 'ও কে?'

মীনা চমকে উঠল, 'কই, কেউ না তো।'

'আমার যেন মনে হল—'

শ্বাসরুদ্ধের মতো মীনা বলল. 'কী, কী?'

'কে যেন নেমে গেল।'

মীনা বলল, 'বাঁদর-টাদর হবে।'

'এখানে বুঝি বাঁদরেব খুব উৎপাত?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ, খুব!'

অমলেশের খুব হাসি পাচ্ছিল। মুখটা দেখতে পায় নি। কিন্তু পরিপাটি টেরি কাটা কুচকচে কালো চুলে ভর্তি একটা মাথা নিমেষের জন্য হলেও তা চোখে পড়েছে। সেটা মনুষ্য জাতিরই কোন একজনের; তার আদি পুরুষদের কারো নয়। মীনার আরক্ত বিব্রত মুখ, তার ত্রস্ত চমকিত ভাবভঙ্গি, বেড়ার ওপারের অদৃশ্য কারোকে নিয়ে লুকোচুরি অমলেশের প্রাণের ভেতরকার সবচাইতে কৌতুকময় অংশটিকে উস্কে দিল। সে অবশ্য আর কিছু বলল না; তবে মধুর মনোহর কিছু কল্পনা করে হাসতে লাগল।

মীনা বলল, 'হাসছেন যে—'

অমলেশ বলল, 'ইচ্ছে হল।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল মীনা! বলল, 'আচ্ছা অমলেশদা—'

'বল—' অমলেশ তার দিকে তাকাল।

'বোম্বাইতে রোজ আপনার সঙ্গে তো দাদার দেখা হয় না?'

আবার সেই নবেন্দুর কথা। অ্যালবামের ছবি, মীনার লুকোচুরি—এসব কিছুক্ষণের জন্য অমলেশকে অন্যমনস্ক করে রেখেছিল। নবেন্দুর নাম শুনতেই চঞ্চল হল। নাঃ, এ বাড়িতে সে যতক্ষণ আছে ঘুরে ফিরে নবেন্দুর কথা আসবেই। কাঁপা গলায় বলল, 'রোজ হয় না, তবে মাঝে মাঝে হয়।'

মীনা বলল, 'দাদাকে একটা কথা বলবেন?'

'কী?'

'আমি গান-বাজনা ভালবাসি বলে দাদা একটা হারমোনিয়াম কিনে দেবে বলেছিল। যদি—' এই পর্যন্ত বলে চুপ করল মীনা।

তার মনের কথা পড়তে পারল অমলেশ। বলল, 'একটা হারমোনিয়াম চাই, এই তো?'

৮

ছবি দেখে, গল্প-টল্প করে এবং হারমোনিয়ামের কথা বলে কখন মীনা চলে গিয়েছিল আর কখন ভাদ্র মাসের দিনটা বিকেলের দেউড়িতে এসে থেমেছে, অমলেশের খেয়াল নেই। এই মুহূর্তে বিছানায় গা এলিয়ে জানালার বাইরে আকাশের ক'টা চৌকো নীল টুকরোর দিকে তাকিয়ে আছে অমলেশ। এতক্ষণ সূর্যটাকে দেখা যাচ্ছিল, কখন নিঃশব্দে সেটা পশ্চিম আকাশের ঢালু বেয়ে চোখের আড়ালে নেমে গেছে কে বলবে। তাকে দেখতে না পেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল অমলেশ। এ বাড়িতে আর বেশিক্ষণ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না; সন্ধ্যের আগে আগেই পালানো উচিত। ঘড়ির কাঁটার ফাঁক দিয়ে একেকটি মুহূর্ত টুপ টুপ করে ঝরে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে নীলার ফিরে আসার সময়ও কাছে এগিয়ে আসছে। এখনই, এখনই অমলেশের বেরিয়ে পড়া উচিত। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে জামা-কাপড় পরে ফেলল অমলেশ। দেওয়ালে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে যাবে সেই সময় ঝুনু এল। অমলেশ বলল, 'কী ব্যাপার, সারা দুপুর তোমার যে পাত্তাই নেই।'

ঝুনু বলল, 'বা রে, কী করে আসি।'

'কেন?'

'কতবার আপনার ঘরের সামনে দিয়ে ঘুরে গেছি। আপনি তাকানই নি।' ঠোঁট প্রায় উল্টে দিল ঝুনু।

অমলেশ অবাক, 'তুমি আবার কখন এখান দিয়ে ঘোরাঘুরি করলে।'

'আপনার কি তখন হুঁশ ছিল! মেজদির সঙ্গে ছবি দেখছিলেন। আর—'

'আর কী?'

'অজয়দার ছবি নিয়ে মেজদিকে কী সব বলছিলেন—'

'অজয়দার ছবি কোনটা?'

'ঐ যে পড়ে গেল। আর মেজদি তাড়াতাড়ি কুড়িয়ে নিয়ে কাপড়ের ভেতর লুকিয়ে ফেলল।'

এ বাড়িতে ঢোকার পর ঝুনুকে লাজুক আর জড়সড় মনে হয়েছিল অমলেশের। এখন দেখছে বেশ সাবলীলা, অনায়াসগামিনী।

অমলেশ বলল, 'আচ্ছা ঝুনু—'

'কী বলছেন?'

'অজয়দাটা কে?'

'মেজদির—' বলতে বলতে থেমে গেল ঝুনু।

অমলেশ বলল, 'মেজদির কী?'

'জানি না যান—'

'জানো জানো। আহা বলই না—'

চোখ নামিয়ে ফিস ফিস করল ঝুনু, 'মেজদির সঙ্গে অজয়দার খুব ভাব।' বলেই ফিক করে হেসে ফেলল।

অমলেশও চোখ বড় বড় করে বলল, 'খুবই সুখবর।'

কী মনে পড়তে তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে ঝুনু বলে উঠল, 'একথা কিন্তু বাবা-মাকে বলবেন না।'

'কেন?'

'মা-বাবা অজয়দাকে দেখতে পারে না।'

'কেন?'

'কেন আবার। চাকরি নেই বাকরি নেই, তার কি না—'

'তার কী?'

'জানি না যান—' বিচিত্র ভ্রূভঙ্গ করে ফিক করে আবার হাসল ঝুনু। তারপর বলল, 'চলুন—'

'কোথায়?'

'বাবা আপনাকে ডাকছে।'

'কেন?'

'তা কী করে বলব। এমনিই হয়তো: গল্প-টল্প করবে—'

একটুক্ষণ ইতস্তত করল অমলেশ। শেষ পর্যন্ত চুল আঁচড়ে বলল, 'চল—'

মহীতোষের ঘরে আসতে নবেন্দুর মাকেও দেখতে পেল অমলেশ। মহীতোষ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'বোসো বাবা বোসো। সে বসলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথা জেনে নিলেন। তার খাওয়া হয়েছে কিনা, পেট ভরেছে কিনা, দুপুরবেলা বিশ্রাম করেছে কিনা, কোনরকম অসুবিধা হচ্ছে কিনা, ইত্যাদি ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন। নিজে তার খাওয়া-দাওয়া স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে পারছেন না বলে দুঃখ করলেন। বললেন, 'ভগবান আমাকে মেরে রেখেছে, বুঝলে অমলেশ।' যথারীতি নবেন্দুর কথাও কিছু হল। তারপর মহীতোষ স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, 'বিকেল হয়ে গেল; অমলেশকে চা দিয়েছ?'

'না!' নবেন্দুর মা বললেন, 'এই করে আনছি।' তিনি চলে গেলেন।

একটুপর চা এল। খেতে খেতে অমলেশ ভাবল, এ বাড়িতে এই তার শেষ চা খাওয়া। পেয়ালাটি শেষ করে বেড়াতে যাবার ছলে বেরিয়ে পড়বে। তারপর পায়ে পায়ে সোজা স্টেশন; সেখান থেকে কলকাতার একখানা টিকিট কেটে ট্রেনে উঠে বসবে। কলকাতায় পৌঁছে—

ভাবনাটা সম্পূর্ণ হবার আগেই মহীতোষ ডাকলেন।

'আজ্ঞে—' শয্যাশায়ী পঙ্গু মানুষটির দিকে তাকাল অমলেশ।

'এই অন্ধকারে রুগীর ঘরে বসে থাকতে হবে না। বেশিক্ষণ বসলে নিজেও অসুস্থ হয়ে পড়বে। যাও, বেড়িয়ে টেড়িয়ে এসো—'

সুযোগটা এভাবে এসে যাবে, অমলেশের পক্ষে ছিল তা অকল্পনীয়। উৎফুল্ল হয়ে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, যাব!' এক চুমুকে চা নিঃশেষ করে উঠে দাঁড়াল অমলেশ।

'কিন্তু—'

'কী?'

'তুমি তো এখানকার কিছুই চেনো না।' বলেই গলা তুলে মহীতোষ ডাকতে লাগলেন, 'মীনা মীনা, ঝুনু ঝুনু—'

মীনা আর ঝুনু কাছাকাছিই ছিল, ডাকামাত্র ছুটে এল। মহীতোষ বললেন, 'অমলেশকে ঘুরিয়ে টুরিয়ে আমাদের এই জায়গাটা একটু দেখিয়ে নিয়ে আয়। ও তো এখানকার কিছুই চেনে না।'

যতখানি উৎফুল্ল হয়েছিল ঠিক ততখানিই চুপসে গেল অমলেশ। সন্ত্রস্তভাবে বলল, 'না-না, ওরা আবাব কষ্ট করবে কেন? আমি একাই যেতে পারব।'

মহীতোষ বললেন, 'কষ্ট আবার কি! পায়ে হেঁটে তো একটু যাবে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'ওরাও বিশেষ বেরোয় টেরোয় না। কার সঙ্গেই বা বেরুবে। দুটো অপগণ্ড অবশ্য আছে। কিন্তু সে দুটো কি একদণ্ড বাড়ি থাকে।' বলতে বলতে স্ত্রীর দিকে ফিরে উত্তেজিত সুরে বললেন, 'হীরু আর নিতু কোথায়?'

অমলেশ আগেই জেনেছিল, হীরু নিতু-নবেন্দুর দুই ছোট ভাই। অবশ্য তাদের চেহারা এখনও দেখে নি। অমলেশ লক্ষ্য করল নবেন্দুর মা খুবই বিব্রত বোধ করছেন। বললেন, 'খেয়েদেয়ে বিশ্রাম কবে একটু আগে কোথায় যেন বেরুল।' বলে তার দিকে ফিরে চোখের ইশারা করলেন। ইঙ্গিতটা বুঝল অমলেশ। হীরু নিতু যে এখনও আসে নি সেটা তিনি স্বামীর কাছে গোপন বাখতে চান এবং অমলেশও যেন তা না বলে দেয়। ভেবে বিমূঢ় হল সে, ছেলেমেয়েদের নিয়ে ভদ্রমহিলাকে মহীতোষের সঙ্গে নিয়ত কী লুকোচুরিটাই না খেলতে হয়!

যাই হোক ছেলেদের সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করলেন না মহীতোষ। তবে মীনা এবং ঝুনুকে অমলেশের হাজার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্গী হিসেবে জুড়ে দিলেন। পালাবার যে আশা ছিল এক ফুঁয়ে তা নিভে গেল।

রাস্তায় বেরিয়ে দূরমনস্কের মতো নিঃশব্দে হাঁটছিল অমলেশ। তার মুখটা নিচের দিকে নামানো।

ঝুনু ডাকলো, 'অমলেশদা—'

অমলেশ তাকাল।

ঝুনু বলল, 'মনে মনে খুব রেগে গেছেন তো।'

'কেন?'

'আপনার ইচ্ছে ছিল না, তবু বাবা জোর করে আপনার সঙ্গে আমাদের দিয়ে দিল—'

মেয়েটা কি অন্তর্যামী? তাড়াতাড়ি ব্যস্তভাবে অমলেশ বলে উঠল, 'আরে কি আশ্চর্য, ইচ্ছে ছিল না এমন কথা কি বলেছি?'

'বলেন নি, তবে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থেমে গেল ঝুনু।

'তবে কী?'

'আপনার মুখ দেখে কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলছেন না।'

জোব করে হাসল অমলেশ, 'আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী কথা?'

অমলেশ উত্তর দিল না।

ঝুনু বলল, 'বলতে মানা বুঝি?'

অমলেশ মৃদু হাসল।

বীজপুরের নতুন পাড়া পেছনে ফেলে স্টেশনের দিকে অমলেশরা অনেকখানি এসে পড়েছিল। দিকটা পুরনো অঞ্চল। ভাঙাচোরা বাড়িঘর, মাঝে মাঝে এক-আধটা মজা পুকুর, গাছ-গাছালি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পথের দুধারের এ দৃশ্য আজ সকাল বেলাতেই দেখেছে অমলেশ।

শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্য স্টেশনে গেল না। মীনারা অমলেশকে নিয়ে বাঁ দিকে ঘুরল। খুব বশি দূর যেতে হল না, তার আগেই কি আশ্চর্য, পুরনো প্রাচীন বীজপুরের মাঝখানে এক বস্ময়ের খেলা দেখা গেল। কোন এক জাদুকরের ছোঁয়ায় এ জায়গাটা যেন ইন্দ্রলোক। খানকার সব বাড়িই নতুন, তাদের গায়ে আধুনিক স্থাপত্যরীতির ছাপ, কলকাতার ধাঁচে সারি সারি দোকানপসার, রেস্টুরেন্ট, সিনেমা হল, লন্ড্রী। কাচের শো-উইন্ডোতে লোভনীয় নানা জনিসের প্রদর্শনী, নিয়ত সেগুলো হাতছানি দিয়ে চলেছে। চারিদিকে স্থবিরতার দুর্গ খাড়া করে বীজপুর তার প্রাণের মধ্যিখানে এই রকম একটা মনোরম অংশ আড়াল করে রেখেছিল, কে জানত। ভাদ্রমাসের এই শেষ বিকেলে আকাশে যখন নিরীহ লঘু মেঘের খেলা, চারদিকে ছায়াচ্ছন্ন, বৃষ্টির আর সম্ভাবনা নেই, তখন এই জায়গাটা জমজমাট। মানুষের ভিড় আছে, দুটো মাইকের দোকান পাল্লা দিয়ে হিন্দি ফিল্মের রেকর্ড বাজাচ্ছে। একটা সিনেমা হলে এই বুঝি ইন্টারভ্যাল হল, কাজেই মাঝের ফাঁকটা হিন্দি গান দিয়েই ভরিয়ে রাখা হচ্ছে।

অবাক বিস্ময়ে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল অমলেশ। তার ডান পাশে ঝুনু, তারপর মীনা। হঠাৎ ঝুনুর গলা কানে এল। চাপা গলায় ফিসফিসিয়ে সে মীনাকে বলছে, 'দ্যাখ মেজদি, দ্যাখ—পেছন দিকে—'

কিচ্ছু না বলে চট করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল অমলেশ। হাত পঞ্চাশেক দূরে সেই ছেলেটা—যার ফটো চকিতের জন্য তখন চোখে পড়েছিল; তারপরেই অবশ্য সেটা লুকিয়ে ফেলেছিল মীনা।

অমলেশ লক্ষ্য করল, ছেলেটি তাকে দেখছে। তার দৃষ্টি কেমন যেন ক্রুদ্ধ, অসন্তুষ্ট, তীব্র এবং সন্দিগ্ধও। অমলেশের খুব হাসি পেতে লাগল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিপাট ভালমানুষটি সেজে গভীর মনোযোগে দুধারের সৌন্দর্য দেখতে লাগল সে। কিন্তু কান দুটো রইল ঝুনুদের দিকে।

আগের মতো গলায় ঝুনু বলল, 'অজয়দাটা কী রে—'

মীনা কী বলল, অমলেশ বুঝতে পারল না।

ঝুনু আবার বলল, 'তুই বেরুলেই পিছু নেয়, ভারি হ্যাংলা—'

মীনার উত্তর এবারও অবোধ্য।

ঘাড় নিচু করে হেসে ঝুনু বলল, 'ডাকব?'

ঠিক এই সময় অমলেশ বলে উঠল, 'এই জায়গাটার নাম কী মীনা?'

মীনা যেন অকূলে কূল পেয়ে গেছে এমন ভাবে বলল, 'রানীবাজার।'

আরেকবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিল অমলেশ। হ্যাঁ, অজয় ঠিক পিছু পিছু আসছে। চোখে সেই দৃষ্টি। ছোকরা তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ঠাওরাল নাকি?

যাই ভাবুক, মাথা ঘুরিয়ে অমলেশ বলল, 'জায়গাটা কিন্তু খুব সুন্দর।'

ঝুনু বলল, 'একেবারে কলকাতার মতো।'

'তুমি কলকাতায় গেছ?'

'গেছি দু'চারবার।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

'তারপর আবার ঝুনুর ফিসফিসানি শুনতে পেল অমলেশ, 'মেজদি—'

মীনা বলল, 'কী বলছিস?'

'অজয়দাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল?'

'যেখানে ইচ্ছে যাক। তুই বকবক করিস না তো; অমলেশদা শুনতে পাবে।'

ঝুনু ভুরু কুঁচকে ঠোঁট বাঁকিয়ে জিভটি সরু করে মীনাকে একবার ভেংচে দিল। তারপর ভেঙিয়ে ভেঙিয়েই বলল, 'যেখানে ইচ্ছে যাক! আহা রে, মরে যাই রে—'

আরো কিছুক্ষণ ঘুরবার পর ঝুনু অমলেশকে বলল, 'জানেন অমলেশদা—'

'বল—' অমলেশ তাকাল।

'অনেকদিন পর আমরা এখানে এলাম।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ; দাদা মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে আসত। দাদা বোম্বাই চলে যাবার পর আর কে আনবে বলুন—'

আবার সেই নবেন্দুর প্রসঙ্গ। অমলেশ চুপ করে থাকল।

ঝুনু আবার বলল, 'এখানে দাদার সঙ্গে যে দিনই আসতাম সেদিনই রেস্টুরেন্টে যেতাম, না রে মেজদি?' সমর্থনের আশায় মীনার দিকে তাকাল সে।

মীনা মুখ নিচু করে নখ খুঁটতে লাগল।

ঝুনুর মনের কথাটা পড়তে পারল অমলেশ। আরো একটু ঘুরে টুরে বলল, 'তোমাদের এখানে সব চাইতে ভাল রেস্টুরেন্ট কোন্‌টা?'

বিপুল উৎসাহে ঝুনু বলল, 'ঐ যে পান্থপাদপ—'

'পান্থপাদপ!' বেশ কাব্য কাব্য গন্ধ আছে তো নামটায়। ঝুনুর আঙুল অনুসরণ করে ঝকঝকে একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেল অমলেশ। বলল, 'চলো, একটু চা খেয়ে আসি—'

এবার ঝুনু লজ্জা পেয়ে গেল, 'না-না, আমি খাবার কথা বলেছি নাকি?' মীনাও তার সঙ্গে সুর মেলাল।

'দাদারা বললে 'না' বলতে নেই। এসো—'

জোর করেই মীনাদের নিয়ে 'পান্থপাদপে' এল অমলেশ। মেয়েদের জন্য পর্দা ঢাকা ছোট ছোট কেবিনের ব্যবস্থা আছে। একটা কেবিনে ঢুকে বসতেই পর্দার ফাঁকে বয়ের মুখ দেখা গেল। সে বলল, 'কী আনব বাবু?'

অমলেশ মীনাদের দিকে তাকাল, 'কী খাবে বল।'

মীনা ঝুনু দুজনেই চুপ।

অমলেশ বলল, 'কি হল, বল। খাবার ব্যাপারে লজ্জা করলে নিজেদেরই কিন্তু ঠকতে হয়।'

এবারও ওরা উত্তর দিল না।

অমলেশ বলল, 'যাক গে, তোমরা যখন বলবেই না, আমিই বলছি।' বয়টাকে শুধোল, 'কী কী পাওয়া যাবে?'

গড় গড় করে নামতা মুখস্থের মতো একগাদা নাম বলে গেল ছোকরা। সব শুনে অমলেশ বলল, 'আগে তিনটে ফিশ ফ্রাই নিয়ে এসো। বেশ গরম আনবে—' পর্দার ও পাশে বয়ের মুখে অদৃশ্য হল। মীনাদের সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে বলতে পকেটে হাত পুরল অমলেশ; অনেকক্ষণ সিগারেট খাওয়া হয় নি। পকেট হাতড়ে একটা প্যাকেট বেরুল বটে, কিন্তু সেটা একেবারে

কা। কখন যে প্যাকেটটা শূন্য করে ফেলেছে নিজেই জানে না। বয়কে ডাকিয়ে অবশ্য গারেট আনিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তা কবল না অমলেশ; নিজেই উঠে পড়ল। মীনাদের ল, 'তোমরা একটু বোসো, আমি চট করে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে আসি।'

'পান্থপাদপে'র ঠিক গা ঘেঁষেই একটা পান-বিড়ি-সিগারেট এবং সোডা-লেমনেডের দোকান। গারেট কিনে ঘুরে দাঁড়াতেই একটু দূরে সেই ছোকরাকে দেখতে পেল অমলেশ—অর্থাৎ জয়কে। ব্যাকুলভাবে চারদিকে তাকিয়ে সে যেন কাকে খুঁজছে। খুব সম্ভব মীনাদের। অজয় কে দেখতে পায় নি। আয়েশ করে সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে তার ব্যাকুলতা ভোগ করতে লাগল অমলেশ। কিছুক্ষই পর পেছন দিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে তার কাঁধে তো করে টোকা দিল।

চমকে তার দিকে ফিরল অজয়। অনেকক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকল। এখানে এভাবে অমলেশকে বে, সে যেন কল্পনাই করে নি। বিমূঢ়তা কাটলে তার চোখে সেই পুরনো তীব্র সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বে এল। চোখ কুঁচকে সতর্কভাবে বলল, 'আপনি---আপনি—'

হেসে অমলেশ বলল, 'আমি কী?'

'আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।'

'আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।'

'চেনেন!'

'ইয়েস—' ঘাড় একেবারে অনেকখানি হেলিয়ে দিল অমলেশ।

অমলেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার ভাল করে দেখে নিয়ে অজয় বলল, 'আপনাকে গে আর কখন দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'আমি কিন্তু দেখেছি। আপনার নামও জানি—'

'কী নাম আমার?'

অমলেশের মাথায় রাজ্যের দুষ্টুমি ভর করেছে। বলল, 'আপনার নাম শ্রীযুক্ত অজয়কুমার ।' পদবীটা জানত না, আন্দাজে জুড়ে দিল।

খানিকটা স্তম্ভিত হয়ে থাকল অজয়। অমলেশের মতো অচেনা মানুষের মুখ থেকে নিজের শুনবে, তা যেন ভাবতেও পারে নি। আস্তে আস্তে সে বলল, 'আমি মিত্র না, মুখোপাধ্যায়।'

'ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলাম।'

একটু চুপ। তারপর অমলেশ বলল, 'সিগারেট চলে?' প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।

চোখ আবার আগের মতো তীক্ষ্ণ বিদ্বেষপূর্ণ হয়ে উঠল অজয়ের, 'না, ধন্যবাদ।'

ভুরু কুঁচকে ঈষৎ ভাবার ভাণ করে অমলেশ বলল, 'আপনি তো বীজপুরের ছেলে—'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।'

'আমার সঙ্গে আবার আপনার কী দরকার থাকতে পারে!'

অমলেশ লক্ষ্য করেছে, তার কথার উত্তর অজয় ঠিকই দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অত্যন্ত বিরক্তভাবে; রুণ অনিচ্ছায়। অমলেশের সঙ্গ যে তার অসহ্য তা অনুমান করতে পারছে। আর সেই াই প্রাণের ভেতর কৌতুক উথলে উথলে উঠছে তার। বলল, 'আছে, আছে—'

'কী কথা?'

'মহীতোষ চাটুজ্জেদের চেনেন?'

একটু চুপ করে থেকে অজয় বলল, 'চিনি। কেন?'

'ফ্যামিলিটা কেমন?'

'ভালই।'

'মহীতোষবাবুর মেয়েরা?'

'ভাল।'

'আচ্ছা বিশেষ করে ঐ মেয়েটা, যার নাম মীনা?'

চকিত চোখে অমলেশের দিকে একবার তাকিয়ে অজয় বলল, 'হঠাৎ ঐ মেয়েটির জিজ্ঞেস করছেন?'

মুখের বিচিত্র ভঙ্গি করে অমলেশ বলল, 'বিশেষ দরকার। আসুন না, চা খেতে খেতে বলা যাক।'

অমলেশের সঙ্গে আসার ঘোরতর অনিচ্ছা, আবার দুর্বার আকর্ষণও রয়েছে। কি দ্বিধান্বিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল অজয়। তাকে নিয়ে সোজা মীনার কেবিনে বসে ছিল সেখানে চলে এল অমলেশ। পর্দা ফাঁক করে মীনাকে বলল, 'দ্যাখো ি একে চিনতে পারো কি না—' অজয়ের হাত ধরে সামনে এনে দাঁড় করাল সে।

মীনা তাকিয়েই চোখ নামাল। ঝুনু ঠোঁট টিপে টিপে হাসতে লাগল।

অমলেশ বলল, 'একে চিনতে পার মীনা?'

মীনার ঘাড় আরো নীচু হল, পারলে মাটির সঙ্গে সে মিশিয়ে যায়।

অমলেশ আবার বলল, 'দুপুরবেলা যে বাঁদরটা তোমাদের বেড়ার ওপর দিয়ে উঁকি-দিচ্ছিল তার সঙ্গে এর চেহারার মিল আছে বলে মনে হচ্ছে?'

মীনা এবারও নিরুত্তর।

এইসময় বয়টা প্লেটে ফিশ ফ্রাই কাঁটা-চামচ সাজিয়ে এসে হাজির। অমলেশ বলল, 'আরে ফ্রাই আনবে। দুটো এই কেবিনে দাও। আর দুটো পাশের কেবিনে রাখো—' বলে ঝু ডাকল, 'ঝুনু উঠে এসো। আমরা পাশের কেবিনে বসে খাব। তোমার আমার পক্ষে এ ক নিষিদ্ধ এলাকা।'

হাসতে হাসতে ঝুনু উঠে এল।

এ রকম একটা অবস্থার মধ্যে এসে পড়বে, অজয় তা কল্পনা করে নি। বিস্ময়, বিমূ হঠাৎ পাওয়ার আনন্দ—সব মিলিয়ে তার মুখখানা এই মুহূর্ত অবর্ণনীয়। চোখের ইশ তাকে মীনার মুখোমুখি বসতে বলল অমলেশ। বাধ্য ছেলের মতো গিয়ে বসল অজয়। এব অমলেশের দিকে তাকাল, এবার আর দৃষ্টিতে বিদ্বেষ বা শত্রুতা নেই। যা আছে তার কৃতজ্ঞতা।

ফিস ফিস করে অমলেশ বলল, 'চীয়ার আপ লাকি বয়। চালাও পানসি। কিন্তু বেশি না, হাফ এন আওয়ার।' ঝুনুকে নিয়ে পাশের কেবিনে চলে গেল অমলেশ। খাওয়া-দাও পর মীনাদের কেবিনের বাইরে এসে গলায় খাঁকারি দিল, 'আধ ঘণ্টার জায়গায় পঁয়ত মিনিট হয়ে গেছে কিন্তু। আর নয়।'

ওরা বেরিয়ে এল। অজয়ের মুখে লাজুক হাসি, মীনার চোখ মাটিতে নিবদ্ধ।

বিল টিল মিটিয়ে বাইরে আসতেই টিপ করে একটা প্রণাম করে বসল অজয়। চ অমলেশ বলল, 'কী ব্যাপার, কী ব্যাপার।'

হাত কচলাতে কচলাতে অজয় বলল, 'আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম। তারপর মীনার সব শুনলাম।' একটু থেকে আবার বলল, 'আমি এখন যাব দাদা—একটা টিউশানি আ

'এসো—'

মীনার দিকে আরেকবার তাকিয়ে অজয় চলে গেল। যেতে যে খুব কষ্ট হচ্ছে তা টের াওয়া যাচ্ছে। অপ্রত্যাশিত এই সঙ্গলাভের আয়ু এত কম বলে মনে আক্ষেপের শেষ নেই াব।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যে হয়ে এসেছিল। অমলেশ বলল, 'এবার বাড়ি ফিরবে তো?'

ঝুনুর আরেকটু বেড়াবার ইচ্ছে ছিল। সে বলল, 'আর কিছুক্ষণ বেড়াই না—'

মীনা বলল, 'না-না, মা একা রাতের রান্না-বান্না, সংসারের কাজ সামলাতে পারবে না। খুনি ফিরব।'

বাড়ির দিকে যেতে যেতে অমলেশ মীনাকে বলল, 'ছেলেটা কদ্দুর পড়াশুনা করেছে?'

মীনা অমলেশের দিকে তাকাতে পারছিল না। মাটিতে চোখ রেখেই বলল, 'বি. এ. পাশ—'

'চাকরি-বাকরি তো নেই?'

'না। টিউশানি করে।'

'বাড়িতে আর কে আছে?'

'দাদা, বৌদি আর তাদের ছেলেমেয়েরা।'

'দাদা, বৌদি কেমন?'

'খুব ভাল।'

একটু ভেবে অমলেশ বলল, 'অজয়কে কতদিন ধরে দেখছ?'

মীনা বলল. 'অনেক দিন। দাদার বন্ধু—'

'ভবিষ্যতে ঠকবে না তো?'

মীনা চুপ।

অমলেশ বুঝল অজয় সম্বন্ধে সে মন স্থির করে ফেলেছে।

৯

এতক্ষণ বিচিত্র এক খেলায় মেতে ছিল অমলেশ। তার স্বভাবই এই—এক কথায় যার নাম প্রিয়তা। কৌতুক বা পরিহাসের কোন ব্যাপার হাতের কাছে পেয়ে গেলে কোনদিকে আর খেয়াল থাকে না।

মীনাদেব পাশাপাশি হেঁটে বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ সেই কথাটা মনে পড়ে গেল মলেশের—পালাতে হবে। অজয়কে পেয়ে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল, পালাবার কথা বাব অবকাশ ছিল না।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল অমলেশ। ও বাড়ি সে আর ফিরছে না। ফেরা মানেই তো নীলার খে গিয়ে পড়া। নীলার মুখোমুখি দাঁড়াবার মতো এতটুকু সাহসও তার বুকের ভেতর নেই।

সন্ধ্যে নেমে গেছে। চারিদিকে দ্রুত ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে; খানিক পরেই গাঢ় অন্ধকারে সব াকার হয়ে যাবে। এখন কলকাতার ট্রেন আছে কিনা কে জানে। থাক না-থাক, ও বাড়ি মলেশ আর ফিরছে না।

অমলেশকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে মীনারাও দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঝুনু শুধলো, 'কী হল, ড়ালেন যে?'

অমলেশ বলল, 'আচ্ছা তোমাদের যদি একটা রিক্সা করে দিই, বাড়ি যেতে পারবে?'

ঝুনু জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'কেন, আপনি যাবেন না?'

'যাব বৈকি। তবে একটু দেবি হবে। আমি একবার স্টেশনে যাব।'

'স্টেশনে কেন?'

'শুনেছ তো, কাল রাত্তিরবেলাটা আমি স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে কাটিয়ে গেছি?

'শুনেছি।'

'ওখানে একটা জিনিস ফেলে এসেছি; আনতে হবে।'

'ও—'

'তা হলে একটা রিক্সা ডাকি?'

'ডাকুন।'

মীনা আর ঝুনুকে রিক্সায় তুলে আগেভাগেই রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া মিটিয়ে দিল অমলে গাড়ি চলতে শুরু করল। মুখ ফিরিয়ে ঝুনু বলল, 'তাড়াতাড়ি আসবেন অমলেশদা—'

অমলেশ বলল, 'আসব'।

মেয়ে দুটির সঙ্গে কপটতা করতে ভাল লাগছিল না। কিন্তু এছাড়া নিজেকে বাঁচাতে হ আর কী-ই বা করা যায়। মনের ওপর চকিতে একটু ছায়া পড়েই মিলিয়ে গেল। একটা রি ডেকে অমলেশও উঠে বসল। বলল, 'স্টেশন—'

স্টেশনে এসে দেখল অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। চায়ের স্টলে এবং স্টেশন মাস্টারের ঘ আলো জ্বলছে। প্ল্যাটফর্মের একধারে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে; কামরায় কামরায় আলো; বি যাত্রীকেও তাতে বসে থাকতে দেখল অমলেশ।

স্টেশন মাস্টার তাকে দেখে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'সারাদিন তা হ মহীতোষ চাটুজ্জের বাড়ি কাটিয়ে এলেন?'

অমলেশ হাসল, 'হ্যাঁ।'

নিজের নানারকম কাজ সারতে সারতে একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলেন স্টে মাস্টার। অক্ষত দেহে অমলেশ ফিরে আসতে পেরেছে কিনা, সাগর ছেঁচা মুক্তোগুলোকে রকম দেখল, মহীতোষ চাটুজ্জের ছেলে-মেয়েরা তার প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলেছে কিনা ইত্য ইত্যাদি হাজার প্রশ্ন। অমলেশ পর পর উত্তর দিয়ে গেল। তারপর বলল, 'এখন কলকাত কোন ট্রেন আছে?'

প্ল্যাটফর্মের ওধারে সেই গাড়িটা দেখিয়ে স্টেশন মাস্টার বললেন, ঐ তো রথ প্রস্তু আজকের মতো ওটাই লাস্ট ট্রেন। তা আজই চলে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যে দরকারে এসেছিলেন তা মিটে গেল?'

'হ্যাঁ।' অমলেশ বলল, 'ক'টায় ট্রেনটা ছাড়বে?'

স্টেশন-মাস্টার বললেন, 'কলকাতা থেকে মিনিট পনেরর ভেতর একটা ট্রেন এসে পড়ে ওটা এলেই দশ মিনিট পর এটা ছেড়ে দেব।'

'আমাকে একখানা টিকিট দিন।'

'তাড়া কি; ছাড়বার আগে আগে নেবেন।'

অমলেশরা গল্প করতে লাগল। তার ফাঁকে চা এল, সিগারেট এল, পান এল।

দেখতে দেখতে হুড়মুড় করে কলকাতায় ট্রেন এসে পড়ল। জলোচ্ছ্বাসের ঢলের মতো যা নামতে লাগলো কামরাগুলো থেকে।

স্টেশন মাস্টার বললেন, 'টিকিট কাউন্টারটা ওধার দিয়ে। অনুগ্রহ করে আপনি যদি বাই গিয়ে টিকিটটা নেন—'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—'

বাইরে এসে টিকিট কেটে রেজকিগুলো গুনে নিচ্ছিল অমলেশ। সেই সময় ফিস ফিস করে ক যেন ডাকল, 'অমলেশবাবু—'

চমকে পেছন ফিরতেই যাকে দেখা গেল এই মুহূর্তে সে ছিল অভাবনীয়া। যাকে ফাঁকি দিয়ে ালাবে বলে অমলেশের এত লুকোচুরি, এত কপটতা, তার হাতেই ধরা পড়ে গেল। তার ামনে যে দাঁড়িয়ে সে নীলা—নীলা চ্যাটার্জী। কিছুক্ষণের জন্য অমলেশের হৃৎপিণ্ড যেন মকে রইল। তারপর হাসতে হাসতে চেষ্টা করল, হাসিটা ফুটল কিনা সে বলতে পারবে না।

নীলা বলল, 'এখানে কী করছিলেন?'

তো তো করে রুদ্ধস্বরে কী উত্তর দিল, অমলেশের নিজেব কাছেই তা স্পষ্ট না।

নীলাই তাকে বাঁচিয়ে দিল, 'টাকা ভাঙাচ্ছিলেন বুঝি?'

এত জায়গা থাকতে তিন মাইল রাস্তা পাড়ি দিয়ে স্টেশনে টাকা ভাঙাতে এসেছে, ব্যাপারটা জের কানেই তেমন বিশ্বাসযোগ্য ঠেকল না অমলেশের। কোন্‌টা বিশ্বাস্য কোন্‌টা অবিশ্বাস্য, খন তা বিচার করে দেখার সময় নেয়। হাতের কাছে যা পেল তাই চেপে ধরে সে তাড়াতাড়ি লে উঠল—'হ্যাঁ—হ্যাঁ—'

নীলা আবার বলল, 'এখানে আপনার আর কাজ নেই তো? থাকলে সেরে নিন, আমি ড়াচ্ছি।'

রুদ্ধস্বরে অমলেশ বলল, 'না, কী আর কাজ।'

'আসুন তাহলে—'

নীলার পাশাপাশি মন্ত্রচালিতের মতো হাঁটতে লাগল অমলেশ। ভয় হতে লাগল, পাছে স্টশন মাস্টার দেখে ফেলে ডাকাডাকি শুরু করে দেন। নাঃ, সে ফাঁড়াটা কাটল। স্টেশন াস্টার তাঁর কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত হয়ে আছেন যে তাদের দিকে তাঁর তাকাবার অবকাশ নেই।

স্টেশনের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলেই রিক্সা-স্ট্যান্ড। সেদিকে যেতে যেতে নীলা বলল, ামার কেন যেন মনে হচ্ছিল, ফিরে এসে স্টেশনেই আপনার দেখা পাব। নিশ্চয়ই পাব।'

অবরুদ্ধ গলায় অমলেশ বলল, 'হঠাৎ আপনার এরকম মনে হল!'

'তা বলতে পারব না। তবে—'

'তবে কী?'

ইতিমধ্যে অমলেশরা রিক্সা-স্ট্যান্ডে চলে এসেছিল। কাল রাত্তিরে অশ্রান্ত বর্ষণের ভেতরে থিবী যখন ভেসে যাচ্ছিল তখন একটা রিক্সারও দেখা মেলে নি; আজ অমলেশ দেখল রিক্সার লা বসে গেছে। সবাই ডাকাডাকি করছে, 'আসুন বাবু আসুন—'

নীলা বলল, 'একটা রিক্সা নিয়ে নি, কী বলেন?'

'হ্যাঁ, এতখানি পথ—'

রিক্সা ঠিক করে অমলেশরা উঠে বসল। যেতে যেতে নীলা বলল, 'তখন যা বলছিলাম। জ আমি একটা তিরিশের ট্রেন ধরেছিলাম। তারপর এখান থেকে কলকাতার ট্রেন আছে ড়ে ছ'টায়; তার মানে এখন। ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, স্টেশনে আপনার দেখা পাব। কন এমন মনে হল বলতে পারব না। ভাবনাটা কিন্তু সত্যি হল।'

অমলেশ চুপ। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করল, কাল রাত্রে ট্রেনে যে রাজেন্দ্রাণী বেশে নীলাকে েখেছিল, তার সর্বাঙ্গে এখন সেই সাজ-পোশাক। অথচ দুপুরবেলা সে বেরিয়েছিল অতি ধারণ বেশবাসে। এর ভেতর কোথায় যে জামা-কাপড় পাল্টাল, কোথায় প্রসাধন সাবল, কে লবে।

নীলাও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আচ্ছা অমলেশবাবু, আপনি একটা কবি জানেন?'

'কী কবিতা?'

নীলা গুন গুন করে আবৃত্তি করতে লাগল :

'বসন্তে শীতে দিবসে নিশীথে
সাথে সাথে তোর থাকিব বাজিতে
এ কঠিন প্রাণ চিরশৃঙ্খল
চরণ জড়ায়ে ধরে।
একবার তোরে দেখেছি যখন
কেমনে এড়াবি মোরে?'

আবৃত্তি শেষ করে নীলা বলল, 'কার কবিতা বলুন তো?'

অমলেশ চকিত হয়ে উঠেছিল। নাম কিছুতেই মনে করতে পারল না। তবে কবিতা মধ্যে এবং নীলার কণ্ঠস্বরে যে ইঙ্গিতটা রয়েছে তা তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ করে আনতে লাগ

নীলা ঈষৎ ঝুঁকে বলল, 'কবিতাটা বেশ, না?'

অমলেশ নিরুত্তর।

বীজপুরের রাস্তার ওপর দিয়ে রিক্সার চাকা দুরন্ত গতিতে ঘুরে যাচ্ছিল। অমলেশের মাথ ভেতর ঐ রকম কিছু একটা ঘুরছিল। ভাবছিল. নীলা তখন তার মাকে বলে গিয়েছিল, ফির দেরি হবে। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলাতেই সে ফিরে এল কেন? অমলেশ পালাবে, তা কি টের পে গেছে মেয়েটা?

আচমকা নীলার গলা শুনতে পেল অমলেশ। রিক্সাওলাকে সে বলছে, 'এই—এইদিবে রাস্তায় একটু যাও তো—'

অমলেশের ভাবনায় ঝাঁকুনি লাগল যেন। মুখ তুলে বলল, 'ওখানে কী?'

'চলুন না, আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

হঠাৎ এই রাত্রিবেলা বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার কী এমন জরুরী প্রয়োজন হ পড়ল নীলার, বুঝতে পারল না অমলেশ। সীমাহীন আশঙ্কা নিয়ে সে তার গা ঘেঁষে ব থাকল।

১০

নীলার নির্দেশমত রিক্সাটা ঘুরে ডান দিকের রাস্তায় ঢুকল। দুধারে মিউনিসিপ্যালিটি টিমটিমে আলো। কোন্‌টা জ্বলছে. কোন্‌টা আবার একেবারেই অন্ধ। দুপুরবেলা আকাশ জু মেঘেদের যে সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছিল, বিকেলে তাদের চিহ্নও ছিল না; উত্তুরে বাতাসে মুখে কে কোথায় উঠে গিয়েছিল। এখন আবার দিগন্তের ওধার থেকে তারা ফিরে আসতে শু করেছে।

আকাশ মেঘ-মলিন; রাস্তার আলোগুলোও নিষ্প্রভ—কাজেই গাঢ় অন্ধকারে চারদি নিরাকার।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর নীলা হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'আপনি খুব রাগ করেছেন

অমলেশ চকিত হল, 'না-না, রাগ করব কেন?'

'আপনার ওপর জুলুম করেছি বলে।'

'কিসের জুলুম?'

'এই যে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।'

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে অমলেশ শুধোল, 'জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন?'

অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। তবু অমলেশের মনে হল স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে লা। সে বলল, 'নয়তো কী। আমার বন্ধুর বাড়ি যাবার ইচ্ছা তো আপনার ছিল না।'

যাক; অমলেশ যে কলকাতায় পালিয়ে যাচ্ছিল সেটা অন্তত ধরতে পারে নি নীলা। বন্ধুর ড়ি ধরে নিয়ে যাবার কথাই বলেছে। বুকের আবদ্ধ বাতাস সহজ নিঃশ্বাসে বার করে দিয়ে মলেশ বলল, 'না, মানে—'

অমলেশের কথার উত্তর না দিয়ে নীলা রিক্সাওলাকে বলল, 'এই এই, ডানদিকে ঐ বগাটায় থামাও।'

আরেকটু এগিয়ে চাকায় ঘ্যাস্-স্ শব্দ তুলে রিক্সাটা থেমে গেল। যেখানে থামল তার গা য়ে একটা পুরনো একতলা বাড়ি। বাড়িটা রাস্তার ঠিক ওপরে না; খানিকটা ভেতরে। তার বদিকে নোনা-ধরা ইটের দেয়াল; অনেক জায়গায় ভেঙে চুরে গেছে। সামনের দিকে একদা াখিন বাগান-টাগান ছিল, এখন ঝুপসি জঙ্গল। তার ওধারে বাড়িটা।

বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকে ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে মৃদু আলোর রেখা সছে। নীলা রিক্সা থেকে নেমে পড়ল। বলল, 'আসুন—' বলেই পরক্ষণে কী ভেবে বলল, াচ্ছা থাক, আপনার যখন অনিচ্ছা—'

সত্যিই অনিচ্ছা ছিল। তবু একেবারে বাড়ির দুয়ারে এসে যাবে না, তা তো আর হয় না। দ্রতার খাতিরে অমলেশ বলল, 'না-না, অনিচ্ছা কিসের—'

কথা না বাড়িয়ে নীলা বলল, 'ট্রেন জার্নি করে এসেছি, খুব ক্লান্ত লাগছে। বেশিক্ষণ এখানে কতে পারব না। নেহাত খুব জরুরি দরকার আছে বলে এসেছি। আজ থাক, পরে আপনার ঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব'খন কেমন?'

'আচ্ছা—'

'আপনি একটু একলা বসুন। আমি যাব আর আসব।'

অমলেশ উত্তর দিল না। আলাপ করিয়ে দেবে বলে নিয়ে এসে হঠাৎ মত বদলে ফেলল ন নীলা, বুঝতে পারল না। যাই হোক সে চলে গেল।

বেশিক্ষণ বসতে হল না। একটু পরই ফিরে এল নীলা। রিক্সায় উঠে অমলেশের পাশে তে বসতে বলল, 'আপনাকে কষ্ট দিলাম—'

'না, কষ্ট আবার কী—'

'এতক্ষণ একা একা বসে থাকতে হল।'

'ও কিছু না।'

নীলা উঠবার পরই রিক্সা চলতে শুরু করেছিল। ওদের বাড়ি খানিকটা দূরে থাকতেই একটা ইট পোস্টের তলায় সে রিক্সা থামাল। অমলেশের উদ্দেশে বলল, 'রিক্সায় করে আপনি বাড়ি ল যান; আমি হেঁটে যাচ্ছি।'

অমলেশ হতবাক, 'কেন?'

নীলা হাসল, 'দুজনকে এক রিক্সা থেকে নামতে দেখলে সবাই কী ভাববে? সাত সতেরো নেক জবাবদিহি করতে হবে। অত হাঙ্গামায় কী দরকার।'

ঠিকই বলেছে নীলা। অমলেশও হাসল, 'আচ্ছা।' তারপরেই একটা কথা মনে পড়তে ড়াতাড়ি বলল, 'আমি বরং হেঁটে যাচ্ছি, আপনি গাড়িতে যান।'

'উঁহু-উঁহু—' নীলা যেন চমকে উঠল, 'তাই কখনো হয়; আপনি আমাদের অতিথি রিক্সা, চালাও—'

এতক্ষণ খেয়াল করে নি, চলন্ত রিক্সা থেকে হঠাৎ একটা ব্যাপার নজরে পড়তেই অ বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল অমলেশ। দুপুরে সাধারণ সাজে নীলাকে বেরুতে দেখেছিল। প ছিল হলুদ রঙের ছাপা শাড়ি আর ফুলপাতা আঁকা জংলা ছিটের জামা। সন্ধ্যেবেলা ট্রেন ে যখন নামল তখন তার রাজেন্দ্রাণী বেশ; কাল বীজপুর আসার সময় যেমনটি দেখে অবিকল তেমনি। আবার এখন লাইটপোস্টের আলোয় দুপুর বেলার সাধারণ বেশবাস দেখ এর ভেতর কখন যে নীলা পোশাক বদলাল, কে বলবে। নাকি স্টেশনে খানিক আগে রাজে বেশে তাকে যে দেখেছিল, সেটা সত্যি না। কাল রাতের দেখাটাই অমলেশের চোখের ভে আটকে ছিল? স্টেশন বা ট্রেনের কাছাকাছি নীলাকে দেখেই, রূপের ঐ বেশের ছবিটা ওপর বসিয়ে দিয়েছে? কিন্তু অমলেশের পরিষ্কার মনে পড়ছে রিক্সায় পাশাপাশি বসে ভাঙা বাড়িটায় যাবার সময়ও নীলা রাজেন্দ্রাণীই ছিল। সেই বাড়িটায় ঢুকবার আগে অ পরে তাব পোশাক বদলে গিয়েছিল কিনা লক্ষ্য করেনি। মেয়েটাকে আশ্চর্য এক জাদুকরী হতে লাগল অমলেশের। বেশিক্ষণ নীলাকে দেখতে পেল না অমলেশ; তাকে পেছনে যে রিক্সা অনেকদূর এগিয়ে গেল।

১১

বাড়ি ফিরে মুখ-টুখ ধুয়ে কাপড়-টাপড় বদলাতে বদলাতে অমলেশ দেখল, নীলা পড়েছে। তার সঙ্গে একটি কথাও না বলে নিতান্ত অপরিচিতার মতো দক্ষিণ দিকের একে শেষ ঘরখানায় গিয়ে ঢুকল।

এ বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো আছে; তবে সে গুলোর জোর কম।

কাপড় বদলানো হয়ে গিয়েছিল। অমলেশ তক্তপোষে বসতে যাবে, নবেন্দুর মা এে বললেন, 'ঘুরে-টুরে এলে; একটু চা খাবে?'

অমলেশ বলল, 'আজ্ঞে না। আমি খুব বেশি চা খাই না। বেরুবার সময় খেয়ে গে বাইরেও খেয়েছি।'

'হ্যাঁ; ঝুনু মীনা বলছিল।' একটু থেমে নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'তুমি ওদের অ খাইয়েছ।'

'অনেক কোথায়; এই সামান্য। ওরা বড্ড লাজুক, খেতেই চায় না।'

অন্যমনস্কের মতো নবেন্দুর মা বললেন, 'অনেকদিন পর ওরা আজ বেরুল। খুব আ হয়েছে। ফিরে এসে সারাক্ষণ তোমার কথাই বলছিল।'

অমলেশ চুপ।

নবেন্দুর মা আপন মনে বলে যেতে লাগলেন, 'সারাদিন তো বাড়িতেই থাকে। বড় সব মেয়ে, একা একা বেরুতে দিই না। মাঝে মাঝে বেরুলে, বাইরের পাঁচটা দেখলে শু মন ভাল থাকে। তুমি আজ বেড়িয়ে আনলে, খুব খুশি হয়েছি বাবা।' বলতে বলতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, 'ঝুনু-মীনাকে বেরুতে দিই না। তুমি হয়তো ভাবতে পার, নীলা তো বেরে কী করব বল, চাকরি। ঘরে বসিয়ে রাখলে চাকরি কী করে করবে? ভগবান আমাদের ে রেখেছে অমল। মেয়ের রোজগারও খেতে হচ্ছে।'

আলতো ভাবে বিচিত্র এক বিষাদ অমলেশকে ছুঁয়ে গেল; উত্তর না দিয়ে সে বসে থাব

নবেন্দুর মা বললেন, 'তা হলে আর চা বসাবো না?'

'আজ্ঞে না। বেশি চা খেলে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না। মাথার শিরাগুলো দপ্ দপ্ করতে থাকে।'

'যাই। রান্না চাপিয়ে এসেছি। তোমার সঙ্গে দু দণ্ড বসে যে কথা বলব তার উপায় নেই। ঝুনু-মীনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি; নীলাও ফিরেছে—ওকেও আসতে বলেছি।'

নবেন্দুর মা চলে গেলেন। একটু পর ঝুনু এসে বলল, 'বাবা আপনাকে ডাকছেন।'

অগত্যা কী আর করা; অমলেশ মহীতোষের ঘরে গেল। তিনি শুধোলেন, 'আমাদের বীজপুর শহর দেখলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—' অমলেশ মাথা নাড়ল।

'কেমন লাগল?'

'ভালই।'

'ভাল আর কী লাগবে? কী আছে এখানে? তোমরা বোম্বাইয়ের বাসিন্দা; অত বড় শহর থেকে এসে বীজপুরের মত জায়গা আর কতটা ভাল লাগতে পারে।'

অমলেশ চুপ।

নবেন্দুর মায়ের মতো মহীতোষও ঝুনু-মীনাকে বেড়িয়ে আনার জন্য খুশি হয়েছেন, জানালেন। তারপর নানা প্রসঙ্গে কথা হতে লাগল। দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-বাজারদর-আজকালকার ছেলেমেয়ে ইত্যাদি ইত্যাদি। একবার দেশভাগের কথাও বললেন। পার্টিসনের ফলে কী বিপুল ক্ষতি তাঁর হয়ে গেছে, দিনের পর দিন কিভাবে চুর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পথের ধুলোয় মিশিয়ে যাচ্ছেন—সে কথাও। এর ভেতর দুই ছেলে, হীরু-নিতুর ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁকে খুবই চিন্তিত দেখাল। মেয়েদের কিভাবে বিয়ে দেবেন, নীলার চাকরি-বাকরি, নবেন্দুর কথা—নানা বিষয়ে কখনও তাঁকে উত্তেজিত, কখনও বিষাদগ্রস্ত, কখনও করুণ, আবার কখনও বা উদ্‌ভ্রান্ত দেখাতে লাগল।

হঠাৎ একসময় সব আলোচনা থামিয়ে দিয়ে মহীতোষ বিষণ্ণ হাসলেন, 'দ্যাখো কি কাণ্ড, তুমি দু দিনের জন্য এসেছ। কোথায় একটু আনন্দ দেব, তা নয়। দুঃখের কাঁদুনি নিয়ে বসেছি। যাও বাবা, যাও। ওদের সঙ্গে গল্প-টল্প কর গিয়ে। রুগীর ঘরে বসে থাকতে হবে না।'

শুনে খুব কষ্ট হচ্ছিল; মুক্তি পেয়ে নিঃশব্দে উঠে পড়ল অমলেশ।

১২

নিজের ঘরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দিল অমলেশ। খানিকটা সময় কেটে গেল। নবেন্দুর মা গিয়েছিলেন, ঝুনু-মীনা-নীলাকে গল্প করার জন্য পাঠিয়ে দেবেন। ঝুনু অবশ্য একবার এসেছিল; মহীতোষ ডাকছেন; এই খবরটা দিয়েই চলে গেছে। তা ছাড়া আর কেউ আসে নি। মেয়েদের পাঠিয়ে দিতে হয়তো ভুলে গেছেন নবেন্দুর মা।

ঝুনুরা আসবে, সে জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল অমলেশ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরও যখন তারা এল না, ধীরে ধীরে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সেই ভাবনাটা যেন কোত্থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে ধরল—পালাতে হবে। কিন্তু কেমন করে?

বিকেলে ঝুনুদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পালাবার নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিল অমলেশ। ট্রেনের টিকিটটা পর্যন্ত কাটা হয়ে গিয়েছিল। এক মিনিট, মাত্র একটা মিনিট সময় পেলেই সে ট্রেনে উঠে পড়তে পারত কিন্তু তার আগেই নীলার হাতে ধরা পড়ে গেল। অমলেশের কেন

জানি মনে হতে লাগল, হাজারটা অদৃশ্য চোখ মেলে নীলা তার দিকে তাকিয়ে আছে। তাকে এড়িয়ে কোথাও পালাবার পথ নেই। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে হল অমলেশের।

ঘরের আলোটার জোর যদিও কম তবু চোখে বিঁধছিল। বিছানায় এলিয়ে ছিল অমলেশ; এবার চোখের ওপর আড়াআড়ি দুই হাত রেখে টান টান শুয়ে পড়ল। একটু পর হঠাৎ কানে এল, টিনের চালে টুপটাপ শব্দ। সেই দুপুর থেকে যার আয়োজন চলছিল এতক্ষণে তা শুরু হয়ে গেল।

হাত চাপা দিয়ে আলো ঠেকানো গেছে কিন্তু ভাবনা আটকাবে কী দিয়ে? প্রতিটি রোমকূপের ফাঁক দিয়ে অসংখ্য চোরা পথে চুঁইয়ে চুঁইয়ে তা ভেতরে ঢুকতে লাগল। অমলেশের মনে হতে লাগল, নরম নিভাঁজ বিছানায় না, সে যে লক্ষ লক্ষ ধারাল কাঁটার ওপর শুয়ে আছে।

কতক্ষণ এইভাবে কাটল, খেয়াল নেই। হঠাৎ পায়ের এবং চাপা গানের শব্দে চমকে উঠল অমলেশ। চোখ থেকে হাত অবশ্য সরাল না। ঈষৎ ফাঁক করে দেখল, চোদ্দ-পনের বছরের একটি ছোকরা ঘরে এসে ঢুকেছে; মুখের কাটালো ছাঁচ দেখে নীলাদের ভাই বলেই মনে হল। পরনে চাপা ছুঁচলো প্যান্ট এবং চিত্রবিচিত্র টী শার্ট। উল্টে-দেওয়া ঢেউখেলানো চুল। হিন্দী গানের একটা কলি সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গাইছিল, 'বড়ে মিঞা দিওয়ানে—'

হঠাৎ অমলেশের দিকে চোখ পড়তেই ছোকরার গান থেমে গেল। একটুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর কাছে এগিয়ে এসে চারদিক থেকে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল।

উঠে বসে অনায়াসেই তার সঙ্গে আলাপ-টালাপ জমিয়ে ফেলতে পারত অমলেশ। কিন্তু কি এক দুষ্টুমি অমলেশের ওপর ভর করল যেন; যেমন ছিল তেমনি চোখ ঢেকে চুপচাপ পড়ে রইল।

ছোকরা আরো কিছুক্ষণ একদৃষ্টে দেখে বেরিয়ে গেল। একটু পর বাইরে দুটো গলা শোনা গেল। একটা ঝুনুর, আরেকটা নিশ্চয়ই এই ছেলেটার।

ছেলেটা বলছে, 'কে রে?'

ঝুনু বলল, 'অমলেশদা—'

'অমলেশদা আবার কোন্ মাস্তান?'

'চাষার মতো ভাষা! মাস্তান আবার কি রে উল্লুক!'

ছোকরা হাসল, 'ঐ হল, অমলেশদা'টা কে বলবি তো—'

ঝুনু বলল, 'দাদার বন্ধু।'

'বুঝেছি বুঝেছি, সেই বোম্বাইকা বাবু—'

ঝুনু ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'আবার বাঁদরামি; শুনতে পাবে না?'

'আরে না-না, ঘুমুচ্ছে।'

'তোকে বলেছে!'

'হ্যাঁ রে, আমি ভাল করে দেখেছি।'

ঝুনু দরজার কাছে এসে উঁকি দিয়ে একবার অমলেশকে দেখে গেল। তারপর আবার তাদের গলা ভেসে এল।

ছোকরা বলল, 'কখন এসেছে রে?'

'সকালে।'

'থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'ক'দিন?'

'দু-চার দিন।'

আর কোন কথা শুনতে পেল না অমলেশ। ওরা কি চলে গেল? ওদিকে বৃষ্টিটা প্রথমে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছিল; এখন বেশ জোরেই পড়ছে। টিনের চালে তার একটানা ঝমঝমানি বেজে যাচ্ছে।

একটু পর আবাব পায়ের শব্দ। হাত অল্প ফাঁক করতেই অমলেশ দেখতে পেল, ছোকরা আবার এসেছে। নাচের ভঙ্গিতে এক পাক ঘুরে চাপা গলায় সুর ভাঁজতে লাগল, 'লা-লা-লা, আজনবী, মেরে আজনবী—' তার ফাঁকে চনমন করে একবার অমলেশের দিকে, পরক্ষণে ঘরেব চারদিকে তাকাতে লাগল।

তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দেয়ালে অমলেশের জামাটার দিকে ছোকরার নজর পড়ল। তৎক্ষণাৎ নৃত্য এবং সংগীত থেমে গেল। তারপর চকিতে অমলেশের দিকে একবার ফিরল; কাছে এসে খুব ভাল করে দেখল অমলেশ ঘুমিয়েছে কিনা, পরখ করবার জন্য পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দিল, নাকের কাছে আঙুল বুলোলো। অমলেশ দাঁত চেপে পড়ে থাকল। তার সম্বন্ধে অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়ে ছোকরা জামার কাছে চলে গেল এবং ঘুরে অমলেশের দিকে চোখ রেখে নিমেষে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল। যথাসর্বস্ব বুক পকেটেই আছে। অমলেশ দেখতে পেল মনিব্যাগ খুলে এক গোছা নোট বার করে ফেলেছে ছোকরা।

সেই দুষ্টুমিটা অমলেশের মাথার ভেতর কুট কুট করে উঠল। একটা হাত চোখের ওপর রেখে আরেকটা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দুটো আঙুল দেখিয়ে ইশারা করল।

নোটগুলো তুলতে তুলতে থমকে গেল ছোকবা। বিভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে আবার সব পকেটে রেখে ইঙ্গিতমতো দুটো টাকা নিয়েই ছুট লাগাল।

কেন যে নবেন্দু বারশ' মাইল দূরে বসে তার ভাইবোনদের জন্য অস্থির হয়ে থাকত, কেন তাব মায়ের শরীর এমন ধ্বংসময়, কেন তাঁর পঙ্গু স্বামী সব সময় উদ্‌ভ্রান্ত—তার কিঞ্চিৎ নমুনা নিজের চোখেই দেখতে পেল অমলেশ।

১৩

এক সময় খাবার ডাক পড়ল।

এ বেলা আর একা না। রান্নাঘরে এসে অমলেশ দেখতে পেল, সারি সারি আসন পাতা। নীলা-ঝুনু-মীনা এবং সেই ছোকরা আগেই বসে পড়েছে; তারই জন্য অপেক্ষা করছে।

অমলেশ বসতেই নবেন্দুর মা থালায় থালায় ভাত বেড়ে সবার সামনে সাজিয়ে দিতে লাগলেন। অমলেশ লক্ষ্য করল, নীলা এবং সেই ছেলেটা অনেক দূরে, ঘরের শেষ মাথায় বসেছে। নিস্পৃহ উদাসীন ভঙ্গি তাদের, অমলেশের দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। ঝুনু মীনা কাছেই বসেছে, মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে।

খাওয়া শুরু হল।

খেতে খেতে ঝুনু অমলেশের দিকে তাকাল। বলল, 'আচ্ছা অমলেশদা—'

'কী বলছ?' অমলেশও তাকাল।

'সেই জিনিসটা এনেছেন?'

'কোন্‌টা বল তো?'

'ঐ যে মেজদি আর আমাকে রিক্সায় তুলে দিয়ে তখন বললেন, স্টেশন মাস্টারের কোয়ার্টারে কাল রাত্তিরে কী ফেলে এসেছেন। সেটা আনতেই তো স্টেশনে গেলেন—'

নবেন্দুর মাও এই সময় বলে উঠলেন, 'ঝুনু-মীনা ফিরে এসে তখন বলল, তুমি স্টেশনে কী আনতে গেছ। এনেছ?'

চমকে উঠে কী বলতে যাচ্ছিল অমলেশ, আর তখনই নীলার সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। এতক্ষণ মুখ নীচু করে খেয়ে যাচ্ছিল সে; এখন তীক্ষ্ণ দূরভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

নীলাব চোখ অদৃশ্য চিকন তীরের মতো অমলেশের বুকের ভেতর গেঁথে গেল যেন। হকচকিয়ে গিয়ে সে বলল, 'স্টেশন মাস্টারেব সঙ্গে দেখা হয় নি, তাই আনতে পারি নি।'

নীলার দিকে তাকাতে পারছিল না অমলেশ। তাব ঘাড় ভেঙে থালার ওপর ঝুলে পড়েছিল। তবু সে টের পাচ্ছিল, স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে।

যাই হোক, নবেন্দুর মা অমলেশকে আর কিছু বললেন না। একটু চুপ করে থেকে সেই ছেলেটিকে নিয়ে পড়লেন, 'এই নিতু—'

এরই নাম তা হলে 'নিতু'। ছেলেটি পাত থেকে চোখ তুলল, 'কী বলছ?'

'সারাদিন ছিলি কোথায়? দুপুরে এলি না যে?'

'কাজ ছিল।'

'কী এমন রাজকার্য যে বাড়িতে থাকতে পার না?'

নিতুর চোখমুখ উদ্ধত হয়ে উঠল। নেহাত বাইরের একজন লোক রয়েছে বলে সে কিছু বলল না। অমলেশ অনুমান করল, সে না থাকলে একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটে যেত।

নবেন্দুর মা রুক্ষ কটু কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'এ বাড়ির সঙ্গে তোমার সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে খাবার; গেলার সময় ছাড়া ঐ পোড়া মুখ একবারও যদি দেখা যায়। এদিকে ঐ বুড়ো তো হীরু কোথায় নিতু কোথায় করে আমার মাথা খেয়ে ফেললে। তোদের জন্য রোগা অসুস্থ লোকটাকে যে দিনরাত কত মিথ্যে বলছি! পারব না, আর ছলচাতুরি করতে কিছুতেই পারব না।' একটু থেমে বললেন, 'কাল থেকে বাড়ি ছেড়ে আর বেরুবে না।'

উগ্রস্বরে নিতু বলল, 'বাড়িতে থেকে কী রাজকার্য করব শুনি?'

'কেন বইটইগুলো একটু নাড়াচাড়া করলেও তো পারিস। মহাভারত তাতে অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

'বই নাড়াচাড়া করবে! পড়বে!' নিতু কুৎসিত মুখভঙ্গি করে ভেংচে উঠল, 'মাসের পর মাস স্কুলে মাইনে বাকি ফেলবে! নাম কেটে আমাকে তাড়িয়ে দিলে। পড়বে!'

আহত সুরে নবেন্দুর মা বললেন, 'কেন, গরীব সংসারের ছেলেবা পড়ে না? বাড়িতে পড়ে প্রাইভেটেও তো ম্যাট্রিকটা দিতে পারিস। কত ছেলে কত কষ্ট করে পড়ে।'

'জ্ঞান দিও না, জ্ঞান দিও না—'

নবেন্দুর মা রেগে গিয়ে আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, সেই সময় নীলা বলল, 'চুপ কর মা, চুপ কর। ওসব কথা এখন থাক।'

অমলেশ যে এখানে আছে, সে কথা বুঝি বা খেয়াল ছিল না। মুহূর্তে সচেতন হয়ে নিজেকে সংযত করে নিলেন নবেন্দুর মা। একটু নীরব থেকে এবার অমলেশের উদ্দেশে বললেন, 'ভালো কথা—'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো অমলেশ।

নবেন্দুর মা বললেন, 'তোমার সঙ্গে তো টাকা-পয়সা আছে।'
'আছে।'
'কোথায় রেখেছ?'
'জামার পকেটে। কেন?'
'খেয়ে উঠে টাকাটা আমার কাছে দিও; সকালবেলা দিয়ে দেব'খন।'
'কেন?' খানিক অবাক হয়ে অমলেশ শুধলো।
নবেন্দুর মা বললেন, 'চুরি টুরি হয়ে যেতে পারে তো। দু দিনের জন্য এসেছ; এ বাড়ি ...কে যদি তোমার টাকা খোয়া যায় আমার মাথা কাটা যাবে।'
'টাকা খোয়া যাবে, ভাবছেন কেন?' বলতে বলতে নিতুর দিকে তাকাল অমলেশ। চোখাচোখি ...ই দ্রুত থালার দিকে ঝুঁকে পড়ল নিতু।
এ দিকে বিব্রতভাবে নবেন্দুর মা বললেন, 'না, এমনি—'
অমলেশ বলল, 'ভয়ের কিচ্ছু নেই। নিতুর মতো পালোয়ান যখন এ বাড়িতে আছে তখন ...া চুরি যাবে না; কী বল, নিতু?'
নিতু চোখ তুলতে পারছিল না। ভেতরে ভেতরে তার আব অমলেশের যে অদৃশ্য গোপন ...াটা চলছে তা তো আর কেউ জানে না।
নবেন্দুর মা বললেন, 'নিতুর সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে?'
ঠোঁট টিপে ঘাড় হেলিয়ে দিল অমলেশ, 'হুঁ—'
'কখন?'
'একটু আগে। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখুন না—'

১৪

রাত্রিবেলা অমলেশের জন্য নির্দিষ্ট ঘরখানায় দু জনের শোবার ব্যবস্থা হল। তার এবং ...র। অমলেশের বিছানা তক্তপোষে, নিতুরটা তলায়। মীনাই মশারি-টশারি টাঙিয়ে দিয়ে ...ছে। বলেছিল, 'আপনি শুয়ে পড়ুন অমলেশদা, আমি মশারি ফেলে গুঁজে টুঁজে দিয়ে যাই।'
অমলেশ তক্ষুণি শোয় নি। মীনাকে বলেছে, 'শোবার সময় আমি গুঁজে নেব'খন। তোমার ...া নেই।'
মীনা বলেছে, 'মনে করে গুঁজে-টুঁজে নেবেন কিন্তু; এখানকার যা মশা!'
'একেবারে জেট প্লেনের ভায়রাভাই, কি বল—'
'তাই। আমাদের একেবারে ছিঁড়ে খায়।'
মীনা চলে গিয়েছিল।
খেয়েদেয়ে আসার পর মীনাকেই শুধু এ ঘরে দেখা গেছে। ঝুনু বা নীলা আসে নি। নিতুও ...সে নি।
এই মুহূর্তে অমলেশ বিছানায় বসে আছে। বলা যায়, নিতুর জন্যই অপেক্ষা করছে। ...করার সঙ্গে আলাপটা জমিয়ে নেবার খুব ইচ্ছে তার।
অনেকক্ষণ পর দরজায় নিতুর ছায়া পড়ল। তার হয়তো ধারণা ছিল এতক্ষণে ঘুমিয়ে ...ড়ছে অমলেশ। তাকে বসে থাকতে দেখে চমকে উঠল নিতু। অদৃশ্য কোন্ ফাঁদে তার পা ...া যেন আটকে গেছে।
একমুহূর্ত তাকিয়ে থাকল অমলেশ। তারপর ডান চোখটা ঈষৎ ছোট করে সকৌতুকে ...ল, 'আসুন, আসুন ইওর এক্সেলেন্সি; আপনার জন্যই আমি অপেক্ষা করছি।'

নিতু হকচকিয়ে গেল; কিছু বলতে পারল না।

অমলেশ আবার বলল, 'এসো—'

কুণ্ঠিতভাবে পায়ে পায়ে ভেতরে এসে ঢুকল নিতু।

অমলেশ বলল, 'কিচ্ছু লজ্জা নেই। টাকার সেই ব্যাপারটা একদম ভুলে গেছি।'

মাথা নিচু করে নিতু দাঁড়িয়ে থাকল।

অমলেশ ডাকল, 'এখানে এসে বসো—'

চোখ মাটিতে রেখেই অমলেশের কাছে এসে বসল নিতু। এতক্ষণে তার গলার স্বর ফুটল 'আপনি যে ঐ কথাটা মাকে বলে দ্যান নি—'

'কোন্ কথাটা?'

'টাকার—'

'পাগল; ওসব কখনও বলতে আছে। তা ছাড়া আমি ভুলেই গেছি যে—'

চোখ তুলে চকিতে অমলেশকে একবার দেখে নিল নিতু। বুঝতে চেষ্টা করল অমলেশ বিদ্রূপ অথবা আর কিছু করছে কিনা। তারপর ঘাড় নিচু করে বলল, 'মানে আমার ক'টা টাকার দরকার হয়েছিল—'

'নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই—' মাথা নেড়ে সহানুভূতির সুরে অমলেশ বলল, 'ক্যাশের দরকার তো আছেই।'

একটু চুপ। তারপর অমলেশই আবার শুরু করল, 'সারাদিন ছিলে কোথায়?'

নিতু বলল, 'আমাদের একটা ফাংশান আছে কি না—

'কিসের ফাংশান?'

'এই গানটান হবে।'

'মানে জলসা?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'তাই কী?'

'একবার মাইকের দোকানে, একবার ডেকরেটরের ওখানে ছোটাছুটি করতে হয়েছে।'

মুখ গম্ভীর করে অমলেশ বলল, 'ব্যাপারটা সত্যিই খুব জরুরি।'

নিতু বলল, 'কলকাতা থেকে বড় বড় আর্টিস্ট আসছে। এ্যায়সা ফাংশান এখানকার কোন শালাকে করতে হবে না। দেখবেন, যীশুপুরের নাকে একেবারে ঝামা ঘষে দেব।' বলতে বলতে হঠাৎ কী মনে পড়ে গেল, আচ্ছা অমলেশদা—'

'বলে ফেল—'

'আপনারা বোম্বাইতে যে জায়গায় থাকেন তার নাম কী?'

'খার।'

'ওখান থেকে বান্দ্রা আর পালি হিল কদ্দূর?'

'কাছেই। কেন?'

নিতুর চোখ চকচক করে উঠল, 'ওখানেই তো ফিল্ম আর্টিস্টরা থাকে। দিলীপকুমার, আশা পারেখ, সায়রাবানু, দেব আনন্দ—'

অমলেশ অবাক, 'তুমি জানলে কেমন করে?'

'সিনেমার কাগজে পড়েছি। বলুন না, ওরা ওখানে থাকে কি না?'

'থাকে বলেই শুনেছি।'

'দেখেন নি?'

'এক-আধবার দেখেছি হয়তো।'

'ওঃ! লাক একখানা করেছিলেন দাদা!' বলে একটু থামল নিতু। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'ঐ যে দিলীপকুমার—গুরু, গুরু, গুরু—' স্বরে সবটুকু আবেগ এবং ভক্তি ঢেলে 'গুরু' শব্দটা উচ্চারণ করল।

অমলেশ স্তম্ভিত, 'কার গুরু হে।'

'কার না! সব শ্লার, সারে দুনিয়ার।'

হাঁ করে তাকিয়ে থাকল অমলেশ।

নিতু বলতে লাগল, 'গুরুকে একবার দেখিয়ে দেবেন দাদা?'

'দেখে কী হবে?'

এমন অদ্ভুত কথা আগে আর কখনও বুঝি-বা শোনে নি নিতু! অপার বিস্ময়ে বলল, 'আরে ব্যস্, এ কী বলছেন! গুরুকে রাত্তিরে আমি স্বপ্ন দেখি। চোখে দেখতে না পেলে লাইফ একেবারে পটাসিয়াম হয়ে যাবে।' একটু থেমে, 'আমি হিন্দী শিখছি দাদা, বোম্বাইতে যাবই। ফিল্মে নামবার বড্ড ইচ্ছে। আমায় একটু হেল্প করবেন?'

'কোথায় হিন্দী শিখছ?'

'সিনেমা দেখে। একটা হিন্দী ফিল্মও আমি বাদ দিই না।'

নিতুর চোখের দিকে তাকিয়ে অমলেশ এবার বলল, 'অনেক রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়া যাক।'

'না-না, খুব বেশি রাত হয় নি।' নিতু বলতে লাগল, 'একেক দিন এর চাইতেও রাত করে আমরা শুই। আচ্ছা অমলেশদা—রাজ কাপুর কোথায় থাকে?'

অমলেশ বলল, 'শুয়ে পড়।'

তার কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চকিত হয়ে উঠে পড়ল নিতু। দ্রুত মশারি ফেলে শুয়ে পড়ল। অমলেশও লাইট নিভিয়ে মশারির ভেতর ঢুকল।

কিছুক্ষণ পর আস্তে আস্তে নিতু ডাকল, 'অমলেশদা—'

ইচ্ছে করেই অমলেশ সাড়া দিল না। ফিল্মস্টারের ব্যাপারে ছোকরার যে রকম উৎসাহ তাতে সারা রাত আর ঘুমোতে দেবে না।

একটু পরেই নিতুর নিঃশ্বাস গাঢ় হয়ে এল, সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

১৫

অমলেশ কিন্তু ঘুমোতে পারল না। সেই দুশ্চিন্তাটা সরীসৃপের মতো চারদিক থেকে নিঃশব্দে তাকে আবার ঘিরে ধরল—পালাতে হবে, পালাতে হবে।

পালাবে তো, কিন্তু কেমন করে? হঠাৎ বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটা কথা অমলেশের ভাবনার ওপর দিয়ে ঝলকে গেল। এই রাত্রিবেলাতেই তো পালাবার সব চাইতে বড় সুযোগ। সবাই যখন গাঢ় ঘুমে অচেতন হয়ে থাকবে, চুপচাপ চোরের মতো পা টিপে টিপে চলে যাবে সে। তার জন্য অমলেশকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। প্রথমত, এখনও বৃষ্টি পড়ছে; ওটা থামুক। দ্বিতীয়ত, এ বাড়ি আরেকটু নিঝুম হোক। চোখ টান টান করে অমলেশ শুয়ে থাকল। যেভাবেই হোক, অন্ধকারের এই সুযোগটা তাকে নিতেই হবে। কোনমতেই হাতের মুঠো থেকে তাকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে না।

শুয়ে শুয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে টিনের চালে জল পড়ার শব্দ শুনতে লাগল অমলেশ ঝমঝমিয়ে অনেকক্ষণ পড়বার পর বৃষ্টিটা একসময়ে ধরে এল। বিছানা থেকে সে নামতে যাবে বারান্দায় নবেন্দুর মায়ের চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'বল্, কোথায় চাকরি করিস তুই?'

নীলা উত্তর দিল, 'তুমি তো জানই। কলকাতায়—'

'কলকাতায় তো সবাই কাজ করে। তোর অফিসের নাম কী?'

'অফিসের নাম দিয়ে তুমি কী করবে?'

'দরকার আছে।'

'কী দরকার?'

'আমি যাব।'

'তুমি সেখানে গিয়ে কী করবে?'

নবেন্দুর মা বললেন, 'গিয়ে দেখব সত্যিই তুই চাকরি করিস কিনা!'

নীলা বলল, 'চাকরি না করলে মাসে মাসে তোমাকে টাকা দিচ্ছি কী করে?'

'কী করে দিচ্ছিস তুই জানিস।'

নীলা এবার বোঝাতে চেষ্টা করল, 'তুমি কিছু ভেবো না মা। মাস মাস টাকা পেলেই তে তোমার হল।'

'না।' তীক্ষ্ণ আর্তসুরে মা বললেন, 'তা হয় না, তা হয় না।'

'কেন?'

'আমি যে মা রে নীলি। দেখাতে তো পারি না। দেখালে বুঝতে পারতিস সবসময় তো চিন্তায় আমার বুক কাঁপে। মাসে ক'টা করে টাকা ছুঁড়ে দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করতে চাস না বল্ কী করিস তুই?'

'তোমাকে তো কতবার বলেছি চাকরি করি।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।'

'কেন?'

'বুলার বাবা তোকে অনেকদিন অনেক জায়গায় ঘুরতে দেখেছে। ঘুরলে চাকরি করিস কী করে?'

'আমার তো ঘুরবারই কাজ।'

অমলেশের মনে হল, একটু ভেবে নিয়ে নবেন্দুর মা এবার বললেন, 'ফিরতে এত দেরি হয় কেন?'

নীলা বলল, 'কই, আজ তো তাড়াতাড়ি ফিরেছি।'

'আজ মোটে একদিন। অন্যদিন রাত বারোটার আগে ফেরার কথা মনে পড়ে তোর এদিকে ঐ বুড়ো অসুস্থ মানুষটাকে তোর জন্য মিথ্যে বলে বলে আর পারি না। নবুটার তে ঐ অবস্থা, সব সময় লোকটা চিন্তায় চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে। তুই আবার কী সর্বনাশ কে ঘটিয়ে বসিস—'

'কী করব বল মা, ওভার টাইম থাকলে ফিরতে দেরি তো হবেই।'

'রোজ তোর ওভার টাইম!'

'আমার ইচ্ছায় তো কিছু হবে না; অফিসের কর্তারা বললে রোজই ওভার টাইম না দিয়ে উপায় কী?'

'তোর কোন কথা আমি শুনতে চাই না। আমাকে তোদের অফিসে কবে নিয়ে যাবি?'

'যাব যাব। এখন শোবে চল তো। অনেক রাত হয়ে গেল।'
নীলাদের গলা আর শোনা গেল না। তারা বোধহয় শুতে চলে গেছে।

দেখতে দেখতে চারিদিক নিশুতিপুর হয়ে এল। নীলারা চলে যাবার পর কতক্ষণ কেটেছে, ত্র আয়ু কতটা ক্ষয়েছে, বলতে পারব না। রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িটা অবশ্য হাতেই বাঁধা; ট বড় মাপগুলো অনায়াসেই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ওটার দিকে তাকানোই বৃথা; ানা ঘড়িটার গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে; আজ দম দিতে ভুলে গিয়েছিল অমলেশ।

সময়টা ঠিক বলতে না পারলেও অমলেশ বুঝতে পারছে রাতটা তৃতীয় যামের দেউড়িতে স থেমেছে। বৃষ্টিটা বেশ কিছুক্ষণ থমকে আছে। ব্যাঙেদের একটানা কণ্ঠসাধনা শোনা যাচ্ছে; ঝঁদের অবিশ্রান্ত বিলাপও কানে ভেসে আসছে। সব মেঘ গলে গলে ঝরে গেছে বুঝিবা; ালার ফাঁক দিয়ে অমলেশ দেখতে পাচ্ছে তারায় তারায় আকাশ ভরে গেছে। রাত্রিটা যেন ্লা জামদানি শাড়ি; তারাগুলো তার গায়ে জরির ফুল।

এ বাড়িতে এখন আর কেউ জেগে নেই। চারদিক নিঝুম, স্তব্ধ। ব্যাঙ আর ঝিঁঝিদের তর্জার ন্না ছাড়া বীজপুর অতল ঘুমের আরকে ডুবে আছে।

এর চাইতে চমৎকার সুযোগ আর আসবে না। দিনের বেলায় এদের চোখের সামনে দিয়ে ানো সহজ নয়। ঐ মেয়েটা—নীলা—নবেন্দুর বোন নীলা, তাকে ফাঁকি হয়তো দিতে পারে অমলেশের লুকোচুরির খেলা হয়তো সে ধরে ফেলেছে; এখান থেকে স্বাভাবিকভাবে ায় নিতে হলে তার কাছে নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদ বলতেই হবে। না বলে এক পা-ও যাওয়া ম্ভব। সব দিকের সব পথ জুড়ে সে দাঁড়িয়ে আছে।

কাজেই এই হচ্ছে সময়। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে উঠে প্যান্টটা ঠিক করে গুছিয়ে পরে অমলেশ, শার্টটা পরল। তারপর জুতোটা পরে নিঃশব্দে বিড়ালের মতো মখমল-মসৃণ য় বাইরে বেরিয়ে এল।

বারান্দায় এসে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল, ঘাড় ফিরিয়ে সতর্ক চোখে এদিক-ওদিক দেখে অমলেশ। অবশেষে যেই উঠোনের দিকে পা বাড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে চাপা গলায় ডাক তে পেল, 'অমলেশবাবু—'

চমকে ভাল করে ডানদিকে তাকাতেই অমলেশের চোখে পড়ল, বারান্দায় আবছা অন্ধকারে া প্রায় অলৌকিক মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তার হৃৎপিণ্ড লাফ দিয়ে হাত খানেক ওপরে এল বুঝি; রক্তস্রোত ধমনীতে কি প্রচণ্ডবেগেই না আঘাত হানতে লাগল!

পায়ে পায়ে অমলেশের কাছে এসে দাঁড়াল নীলা। বলল, 'কী ব্যাপার, এত রাত্রে এখানে ড়য়ে—'

আড়ষ্ট অস্পষ্ট গলায় কী উত্তর দিল, নিজেই বুঝতে পারল না অমলেশ।

নীলা বলল, 'আমার ঘুম আসছিল না, বাইরে এসেছিলাম পায়চারি করতে। দেখি আপনি ড়য়ে আছেন।, ঘুমটা কি আপনাকেও এড়িয়ে গেছে?'

সত্যিই কি ঘুম আসছিল না নীলার? নাকি রাত জেগে সে অমলেশকে পাহারা দিয়ে ছে।

আজ সন্ধ্যেবেলা স্টেশন থেকে অমলেশকে ধরে এনে রিক্সায় তুলেছিল নীলা। তার বন্ধুর ড়ব দিকে যেতে যেতে একটা কবিতাও আবৃত্তি করেছিল। কবিতাটি যে এত ইঙ্গিতবহ এবং র্ময় তা কে জানত।

অমলেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'হ্যাঁ; ঘুম আসছিল না। তাই বেরিয়েছি—' বলেই নিজে দিকে তাকিয়ে থতিয়ে গেল। যে পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে সেটা ঘুমেরই পোশাক বটে।

একপলক অমলেশের দিকে তাকিয়ে থাকল নীলা। সাজসজ্জা বেশবাস কিছুই যেন দ্যা নি এমন একটা উদাসীন মুখভঙ্গি তার। খুব আন্তরিক সুরে বলল, 'ভাবছি একটা ঘুমের ব খাব। আপনি খাবেন নাকি?'

শিথিল সুরে অমলেশ বলল, 'দিন।'

ঘর থেকে পিল এনে দিল নীলা। সেটা খেয়ে শ্লথ পায়ে আবার দক্ষিণদুয়ারী ঘরে গি ঢুকল অমলেশ। নাঃ, এখান থেকে তার মুক্তি নেই।

ঘুমের বড়িটা কতখানি তেজী, বলতে পারবে না অমলেশ। পরের দিন অনেক বেলা পর্য সেটা তাকে বেহুঁশ করে রাখল।

১৬

ঘুম ভাঙতেই অমলেশের চোখে পড়ল, কালকের মতো টলটলে সোনালী রোদে চারদি ভরে আছে। মেঘবৃষ্টির চিহ্নটুকু কোথাও নেই।

বাঙলাদেশে পা দেবার পর দু-রাত পোহাল। দু দিনই অমলেশ দেখল সকালবেল শরৎকালের দখলে। কাল দুপুরের পর থেকে বাকি দিনটা ছিল বর্ষার, আজ দুপুরের ক অবশ্য এখনও বলতে পারছে না সে।

ঘুম ভাঙার পরও অনেকখানি আলস্য অমলেশকে জড়িয়ে থাকল। উঠতে ইচ্ছা করছি না তার। কিন্তু বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা অমলেশের কপালে নেই। বাইরের বারান্দায় প্রচ চেঁচামেচিতে উঠে পড়তে হল। কান খাড়া করতেই টের পেল, ঝুনু আর নিতু গলা সব চাই উঁচুতে তুলে ঝগড়া করছে। কী বলছে, অমলেশ বুঝতে পারছে না। এর মধ্যে নবেন্দুর মা ত মীনার গলাও কানে আসছে। ওধারেব ঘর থেকে মহীতোষের গলাও শুনতে পেল অমলে

মীনা বলছে, 'ছাড় বাঁদর, ছেড়ে দে বলছি—'

নবেন্দুর মা চেঁচাচ্ছেন, 'বদমাশ উল্লুক ছেলে, আস্পর্ধা তোমার দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ভ চাস তো ছেড়ে দে, নইলে তোকে আজ খুনই করে ফেলব।'

ওধারের ঘর থেকে মহীতোষ জড়িত গলায় গেঙিয়ে গেঙিয়ে কী বলছেন, বোঝে ক সাধ্য।

অতএব আর শুয়ে থাকা গেল না। তাড়াতাড়ি বাইরে আসতেই অমলেশ দেখতে পে নিতু আব ঝুনুতে খণ্ডযুদ্ধ চলছে। মুঠি পাকিয়ে নিতু ঝুনুর চুল ধরেছে। তার এক হাতে এব পাউডাবের কৌটো। ঝুনুও ছাড়ে নি, পাউডারের কৌটোটা একহাতে সে ছাড়িয়ে নিয়ে চাই এবং অন্য হাতটা দিয়ে সমানে নিতুকে খিমচে যাচ্ছে। মীনা ওদেব ছাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে

মারামারি করতে করতে নিতু-ঝুনু এদিক-ওদিক ঘুরপাক খাচ্ছিল। নবেন্দুর মায়ের হা একটা পেতলের হাতা; খুব সম্ভব রান্না কবতে করতে উঠে এসেছেন। ঝুনুরা ঘুরছিল, স সঙ্গে তিনিও ঘুবছিলেন আর সুযোগ পেলেই নিতুকে একটা কবে হাতার বাড়ি কষাচ্ছিলে নীলাকে অবশ্য অমলেশ দেখতে পেল না।

অমলেশ বাইবে এসে দাঁড়াতেই নিতু থমকে গেল। এক মুহূর্ত দেখে নিয়ে কড়া সু অমলেশ তাকে বলল, 'কী হচ্ছে? ছেড়ে দাও ঝুনুকে।'

অমলেশের কণ্ঠস্বরে কী ছিল, ঝুনুর চুলের ঝুঁটি এবং পাউডারের কৌটোটা ছেড়ে দি একটু দূবে গিয়ে দাঁড়াল নিতু।

মুক্তি পেয়ে ঝুনু চেঁচাতে লাগল, 'চোর, গুণ্ডা। পুলিশ দিয়ে তোকে জেল খাটাব।'

কুৎসিৎ ভেংচি কেটে নিতু বলল, 'যা-যা, সব করবি।'

নবেন্দুর মা বললেন, 'দ্যাখো অমলেশ, দ্যাখো কী সুখে আছি। পেটে কী আপদ ধরেছি খো। এর চাইতে জন্ম জন্ম বাঁজা হয়ে থাকা ভাল।'

অমলেশ জানতে চাইল, 'কী হয়েছে?'

নবেন্দুর মা সংক্ষেপে যা বললেন তা এই রকম। ঝুনু দুটো চারটে পয়সা যা পায়, উডারের খালি একটা কৌটোয় জমিয়ে রাখে। বছর খানেক ধরে পয়সা জমাচ্ছে সে। টোটা খোয়া যাবার ভয়ে সারাক্ষণই প্রায় চোখে চোখে রাখে। হীরু নিতুও তাকে তাকে কে। যা গুণধর দুই ভাই! আজ সুযোগ বুঝে কৌটোটা সরিয়ে ফেলেছিল নিতু কিন্তু যবস্থা করতে পারে নি, তার আগেই ধরা পড়ে গেছে। আর তাই নিয়েই এই খণ্ডযুদ্ধ।

নবেন্দুর মা বললেন, 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না অমলেশ; এই যমের অরুচিগুলো মাব হাড় কালি করে দিল।'

অমলেশ এবার নিতুর দিকে তাকাল, 'ছি-ছি—'

নিতু কিছু বলল না। দুর্বিনীত ভঙ্গিতে অমলেশের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অমলেশের যেন হঠাৎ কী হয়ে গেল। তীক্ষ্ণ কঠিন সুরে বলল, 'এসব করতে তোমার জ্জা করে না! পড়া নেই শোনা নেই—'

অমলেশের কথা শেষ হবার আগেই উদ্ধতস্বরে নিতু বলল, 'আমাকে ধমকাবেন না স্যার। পনি আমার গার্জেন নন।'

অমলেশ খানিকটা থতিয়ে গেল। নবেন্দুর মা প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, 'কার সঙ্গে ভাবে কথা বলতে হয়, জানো না। যাও, বেরোও। এ বাড়িতে তোমার আর জায়গা নেই। যা, চোখের সামনে থেকে দূর হ আপদ---'

খানিকটা সামলে নিয়ে অমলেশ বলল, 'ধমকাব কি মারব, সেটা এখনও বুঝতে পারছি কালকের রাত্রির ব্যাপারটা ভেবেছিলাম, ভুলে যাব। কিন্তু তুমি আমাকে ভুলতে দেবে দেখছি।'

অমলেশ লক্ষ্য করল নিতুর চোখে মুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। চকিতে সে অমলেশ এবং র মাকে দেখে নিয়ে ছুট লাগাল। অমলেশ বুঝল, মাকে এখনও খানিকটা ভয় করে ছোকরা।

উদ্বিগ্ন নবেন্দুর মা শুধোলেন, 'কাল রাত্তিরে কী হয়েছিল, অমলেশ?'

'না, কিছু না। সে কথা আপনাকে শুনতে হবে না।'

নবেন্দুর মা আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। তাঁর মুখচোখ দেখে মনে হল, উদ্বেগটা কাটে

ওদিকের ঘর থেকে মহীতোষের একটানা চিৎকার ভেসে আসতে লাগল।

ধীরে ধীরে উত্তেজনা কেটে গেল। ওদিকের ঘরে মহীতোষের চিৎকার থামল।

মীনা দাঁড়িয়ে থাকল আর ঝুনু উত্তর দিকের একখানা ঘরে গিয়ে ঢুকল। এত চেঁচামেচি ঝগড়া হয়ে গেল, তবু নীলাব দেখা নেই। সে কি তবে বাড়ি নেই?

নবেন্দুর মা অমলেশকে বললেন, 'মুখটুক ধুয়ে নাও বাবা। চা খাবে।' মীনাকে বললেন, মশারি খুলে অমলেশদার বিছানা-টিছানা ঠিক করে দিয়ে আয়।'

মীনা চলে গেল।

মুখ ধুয়ে একটু পর ঘরে এসে অমলেশ দেখল, বিছানাটা ফিটফাট। মশারি খু বালিশ-টালিশ সাজিয়ে চাদরটা টান টান নিভাঁজ করে রেখে গেছে মীনা। অমলেশ বিছান বসল

বেশিক্ষণ একা-একা বসে থাকার সুযোগ হল না। চা-খাবার নিয়ে যে এ ঘুরে এসে ঢুক এই মুহূর্তে অমলেশের কাছে সে ছিল অভাবনীয়া। অর্থাৎ নীলা এসেছে। অমলেশ চকিত হ উঠল।

টেবিলের ওপর কাপ-প্লেট রেখে নীলা বলল, 'খান।' বলে একটা মোড়া টেনে এ কালকের মতো অদূরে অমলেশের মুখোমুখি বসল।

অমলেশ লক্ষ্য করল এরই ভেতর স্নান সেরে নিয়েছে সে; পরনে হলুদ রঙের একটা শা আর জংলা ছিটের জামা। মেঘের মতো একরাশ ভিজে নবম চুল পিঠময় ছড়িয়ে আছে।

নীলা শুধলো, 'কাল কি রকম ঘুম হল?'

তার দিকে চোখ রেখেই অমলেশ বলল, 'বেশ ভালো। এই তো একটু আগে উঠলাম

'আমার বড়িটায় তা হলে বেশ কাজ হয়েছে বলুন।'

অন্যমনস্কের মতো অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ, তা হয়েছে। আচ্ছা—'

'বলুন—' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অমলেশের দিকে তাকাল নীলা।

'আপনি এতক্ষণ বাড়িতেই ছিলেন?'

'ছিলাম বৈকি। হঠাৎ এ প্রশ্ন?'

'না, মানে ঝুনু নিতু ঝগড়া করছিল। আপনাকে তো তখন দেখলাম না।'

নীলা বলল, 'আমাদের বাড়িতে এরকম ঝগড়া দিনে দশবার হচ্ছে। দেখতে দেখতে শুনা শুনতে গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাই আর ঘর থেকে বেরুই নি। আপনি নতুন দেখছেন কি অবাক হয়ে গেছেন।' একটু থেকে আবার বলল, 'খুনোখুনি করে একটা মরে, তবে আমি শা পাই।'

অমলেশ উত্তর দিল না।

নীলা হঠাৎ সচেতন হয়ে বলল, 'আপনার চা কিন্তু জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

অমলেশ তাড়াতাড়ি কাপটা হাতে তুলে নিল।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর নীলাই শুরু করল। বিচিত্র চাপা গলায় বলল, 'আজ বেরু আমার দেরি হবে। হাতে অনেকটা সময় আছে। আসুন সেই কথাটা সেরে নিই।' বলে পরি দূরভেদী চোখে অমলেশের দিকে তাকাল।

অমলেশের অস্তিত্বের ভিত দুলে উঠল যেন। খানিক আন্দাজ করে স্খলিত সুরে অমলে বলল, 'কী কথা বলুন তো?'

'ঐ যে কথাটা কাল দুপুরে শেষ করতে পারলাম না। আমার ট্রেনের সময় হয়ে গেল

বুকের ভেতরকার অস্থির কাঁপুনি গোপন রেখে চুপ করে থাকল অমলেশ।

নীলা তাকিয়ে ছিল। বলল, 'কটা প্রশ্ন করব। তার আগে আপনাকে একটা কথা দি হবে?'

'কী?'

'আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সবগুলো প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেবেন?'

মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে নীলার মুখে নিদারুণ কিছু উচ্চারিত হবে। নিদারুণ এবং অমো বুকের ভেতর শ্বাস আটকে যতটা সম্ভব সহজ থাকতে চেষ্টা করল অমলেশ। বলল, 'বেঠি উত্তর দিই, আমাকে এমন মনে হয় কী?'

'যাচাই না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে পারছি না।'

'যাচাই কিভাবে করবেন?'

'আমার কথার কী জবাব দেন তাই শুনে। মিথ্যে বলে আমার কাছে কেউ পার পায় না।'

ভয় যে পেয়েছে সে সম্বন্ধে অমলেশ নিজেই নিঃসংশয়। ভেতরকার দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্ত বস্থাটাকে প্রাণপণে গোপন রাখতে চাইছে সে। সামান্য হেসে বলল, 'আপনার কী কথা ‌ুন না—'

নীলা অমলেশের চোখে চোখ রাখল, 'দাদার কথা জানতে চাইছি।'

সে কি ধরা পড়ে গেছে? অমলেশ অনুভব করল, মুহূর্তে তার জিভ শুকিয়ে একরাশ ‌খবে ধারাল বালির মতো হয়ে উঠেছে। সে ঢোঁক গিলতে পারছে না। অস্ফুট ক্ষীণ গলায় ‌মলেশ শুধলো, 'দাদা, মানে নবেন্দু?'

'হ্যাঁ। সে ছাড়া আমার আর কোন দাদা নেই।'

'কেন, নবেন্দুর কথা তো ‌ ‌ই বলেছি।'

'কী বলেছেন?'

'সে বেশ আছে, ভাল আছে।' বলেই অমলেশের মনে হল এ কণ্ঠস্বর তার নিজের না। ‌র ওপর কেউ ভর করে খাপছাড়া অলৌকিক গলায় ঐ কথাগুলো যেন বলে উঠল।

'দাদা ভাল নেই।' নিস্তরঙ্গ স্বরে নীলা বলল।

ঘরের ভেতর বাজ পড়ল যেন। বিমূঢ়ের মতো নীলার প্রতিধ্বনি করল অমলেশ, 'নবেন্দু ‌ল নেই!'

'না। আমার মনে হয়—'

'কী মনে হয়?'

'দাদার কোন ক্ষতি হয়েছে।'

দু-হাত দিয়ে অমলেশ যা আড়াল করতে চায় ঠিক সেইখানটাতে লক্ষ্যভেদ করে বসেছে ‌লা। আর শরবিদ্ধ রক্তাক্ত জন্তুর মতো অমলেশ বোধহয় আর্তনাদ করে উঠল, 'কেমন করে ‌লে নবেন্দুর ক্ষতি হয়েছে, সেকথা কি আমি একবারও বলেছি?'

'বলেন নি। তবে—'

'কী?'

'বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'আমি?'

'—হ্যাঁ—হ্যাঁ, আপনি।' নীলার চোখের তারা দপ্ দপ্ করতে লাগল, 'যখনই দাদার কথা ‌ঠেছে, লক্ষ্য করেছি, আপনি শিউরে উঠেছেন, হকচকিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। ভয় ‌য়ে গেছেন। আর—'

'আর কী?' অবরুদ্ধস্বরে জানতে চাইল অমলেশ।

'আর মনে হয়েছে দাদার ব্যাপারে সবসময় আপনি কিছু লুকোতে চাইছেন। বলুন সত্যি ‌না—'

কী উত্তর দেবে অমলেশ? ফাঁদে পড়া পশুর মতো যখন ছটফট করছে, সেইসময় ‌দ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে নবেন্দুর মা ঘরে এসে ঢুকলেন। সন্ত্রস্ত গলায় বললেন, 'নীলি, ‌লি—সর্বনাশ হয়ে গেছে। অবিনাশ পালধি এসেছে—'

নীলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখন যে শরৎকালের মেজাজ মুছে গিয়ে দিনটার গায়ে

বর্ষার রঙ ধরেছে খেয়াল করে নি অমলেশ। কখন থেকে আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু ক
কে বলবে।

এদিকে নীলার ঠোঁটে তীব্র ধারাল রেখায় বিচিত্র হাসি খেলে গেল, 'সর্বনাশের কী
মা? অবিনাশবাবুকে ক'দিন আর ঠেকিয়ে রাখতে পারবে? আদর করে ঘরে এনে বসা

'তোর বাবার ঘরে বসিয়েছি।'

'বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছ।'

'তুই একবার চল্—'

'চলো—' নীলা উঠে দাঁড়াল। অমলেশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনিও চলুন না,
ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিচ্ছি।'

কোন প্রয়োজন নেই। তবু কিসের এক আকর্ষণে নীলাদের সঙ্গী হল অমলেশ। মহী
চাটুজ্জের ঘরে আসতেই ভদ্রলোককে দেখা গেল।

ময়দার স্তূপের মতো থসথসে ফর্সা চেহারা। বয়েস পঞ্চাশোর্ধ্বে। মাথার চুল তা
সৌখিন প্রজাপতি-মার্কা গোঁফ কিন্তু ভ্রমর কৃষ্ণ। ওগুলো দামী কলপের বিজ্ঞাপন। প
ফিনফিনে গিলেকরা পাঞ্জাবি। পাম্প-শুতে এত পালিশ যে মুখ দেখা যায়, তার ওপর কুঁ
মিহি ধুতি জুঁই ফুলের মতো ছড়িয়ে আছে। দু হাতের পাঁচ ছ'টা আংটি থেকে হীরে-মু
আলো ঝলকাচ্ছে। গলায় সোনার সরু বিছে হার। ভদ্রলোক সারা গায়ে তিন চার শিশি এ
নিশ্চয় ঢেলে এসেছেন। উগ্র গন্ধে বর্ষার ভিজে ভিজে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

অমলেশরা গিয়ে ঢুকতেই ভদ্রলোক নীলার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন আছ নী

'ভাল—' ঘাড় হেলিয়ে নীলা বলল, 'খুব ভাল। আপনি?'

'ঐ একরকম। অনেকদিন পর তোমাদের বাড়ি এলাম।'

'রোজ এলেই বা আপনাকে আটকাচ্ছে কে অবিনাশবাবু?'

খুব একটা রসিকতার কথা যেন হয়েছে, ভদ্রলোক থলথলে শরীর দুলিয়ে খ্যা-খ্যা
হেসে উঠলেন, 'যা বলেছ—' হাসবার সময় মুখের বিশাল গহ্বরটি দেখা গেল আর
গেল গোটা আট-দশেক দাঁত তাঁর সোনা-বাঁধানো।

নীলা বলল, 'আসুন, আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই।' অমলেশের সঙ্গে অবিনাশ পা
আলাপ করিয়ে দিল সে।

পরিচয়ের সূত্রে অমলেশ জানতে পারল, এ শহরে অবিনাশ পালধির খান দশেক ব
সাত-আটটা লরি, ব্রিক ফিল্ড, ধানকল, তেলকল ইত্যাদি ইত্যাদি আছে। তা ছাড়া বীর
মিউনিসিপ্যালিটির তিনি ভাইস চেয়ারম্যান। আসছে ইলেকশনে বিধান-সভায় যাবে
অঞ্চলের প্রতিনিধি হতে পারেন, মনে মনে সেরকম বাসনা রয়েছে। সেজন্য তোড়জো
শুরু করেছেন।

পরিচয় পর্বের পর নিঃশব্দে হাতজোড় করল অমলেশ। অবিনাশবাবুও অবিকল
করে অপরিষ্কার লালচে চোখে কিছুক্ষণ অমলেশের দিকে তাকিয়ে থেকে নীলাকে বলে
'এঁকে তো চিনতে পারলাম না—'

নীলা অমলেশের নামটাই শুধু বলেছিল। বিশদ পরিচয় দ্যায়নি। এবার বলল, 'উনি দ
বন্ধু।'

'নবেন্দুর?'

'হ্যাঁ।'

'আগে আর কখনও এঁকে তোমাদের বাড়ি দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না।'

'কোথেকে দেখবেন। উনি আমাদের বাড়ি এই প্রথম এলেন।'

'অ; নবেন্দুর বন্ধু। তা উনি থাকেন কোথায়?'

'বোম্বাইতে—'

সন্ধিগ্ধ দৃষ্টিতে আরেকবার অমলেশকে দেখে নিয়ে অবিনাশ পালধি একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেলেন, 'আমি আসবার পর তোমার বাবার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। মহীতোষবাবু বড় কষ্ট পাচ্ছেন।'

'তা পাচ্ছেন—' নীলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল।

'কী চিকিৎসা করাচ্ছ?'

'আমাদের মতো লোকের পক্ষে কী চিকিৎসা করাই বা সম্ভব।'

'বেশ তো—' অবিনাশ পালধি বললেন, 'ও ভারটা আমার ওপর দাও। আজকাল কতরকম ওষুধ-বিষুধ বেরিয়েছে; মহীতোষবাবু ঠিক সেরে উঠবেন—'

'তা হয়তো উঠবেন, কিন্তু—'

'বল—'

'আমার বাবার রোগ সারাবার জন্য আপনার এত গরজ কেন?'

'হে-হে, এটা কী বললে নীলা! এটা কী বললে!' টেনে টেনে কাষ্ঠহাসি হেসে অবিনাশ বলতে লাগলেন, 'এক জায়গায় থাকি। তোমাদের সঙ্গে আলাপ-সালাপ হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। প্রতিবেশী হয়ে একটু যদি না করি, মানে গিয়ে এ তো আমাদের কর্তব্য—'

'আপনার কর্তব্যবোধটা বেশ টনটনে।' ধারাল গলায় নীলা বলতে লাগল, 'সেজন্য ধন্যবাদ। বে বাবার ভারটা এখুনি আপনার হাতে দেবার ইচ্ছা নেই। যদি তেমন দিন আসে, আমরাই আপনার কাছে ছুটে যাব। আপনাকে যেচে উপকার করতে আসতে হবে না।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর নীলাই আবার শুরু করল, 'আসল ব্যাপারটা কী বলুন তো অবিনাশবাবু?'

অবিনাশ নড়েচড়ে বসলেন, 'আসল ব্যাপারটা আবার কী?'

বাইরে আঙুল বাড়িয়ে নীলা বলল, 'দেখছেন?'

বিমূঢ়ের মতো অবিনাশ বললেন, 'হ্যাঁ, বৃষ্টি পড়ছে।'

'এ বৃষ্টিতে কুকুর বেড়াল বেরুতে পারে না; আর আপনি কিনা হাজার কাজ ফেলে আমার বাবার চিকিৎসার জন্য উতলা হয়ে ছুটে এসেছেন—একথা বিশ্বাস করব, আমি কি এমনই খুকি!'

টেনে টেনে হাসতে লাগলেন অবিনাশ, 'হেঁ-হেঁ-হেঁ; তোমার কথাগুলো বড্ড চাঁছা-ছোলা, একটুও রসকষ নেই। মাইরি বলছি তোমার বাবার খবরই নিতে এসেছিলাম। তবে—'

'কী?'

'আরেকটু দরকারও আছে।'

'বলে ফেলুন।'

একটু ভেবে নিয়ে অবিনাশ পালধি শুরু করলেন, 'আমার তেলকলের আজ পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। রজত-জয়ন্তী উৎসব হবে।'

'বেশ।'

'তাই একটু গান বাজনা আর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছি।'

'বেশ।'

'মীনা তো বেশ গাইতে পারে। আমার খুব ইচ্ছা ও গিয়ে ক'টা গান গাইবে। সেই জন নিতে এসেছি। তোমরা কিন্তু না বলতে পারবে না।'

অমলেশ লক্ষ্য করল সমস্ত ঘরখানায় ইঙ্গিতময় স্তব্ধতা নেমে এসেছে। মহীতোষ চাটুজ্জে যে দিকটা সুস্থ সেটা থরথরিয়ে কাঁপছে। নবেন্দুর মায়ের চোখের তারা স্থির, চোয়াল শক্তবদ্ধ হাতদুটো মুঠি পাকানো।

কিছুক্ষণ পর নীলা আস্তে করে ডাকল, 'আচ্ছা অবিনাশবাবু—'

উৎসুক চোখে তাকিয়ে ছিলেন অবিনাশ। বললেন, 'কী?'

'মীনাকে নিয়ে যাবার জন্য কতদিন ধরে চেষ্টা করছেন বলুন তো!'

অবিনাশ হকচকিয়ে গেলেন, 'হেঁ-হেঁ-হেঁ, কি যে বল—তোমাদের সঙ্গে আমার যা সম্প তাতে হেঁ-হেঁ-হেঁ—তা ছাড়া গান বাজনাটা আমি বড্ড ভ

নীলা বলল, 'আপনার রজত জয়ন্তী উৎসব কখন?'

'সন্ধ্যেবেলা—'

'তবে এখন নিতে এসেছেন?'

'মানে একটু আগে যাবে। আমাদের ওখানে দুপুরবেলা খাবে। তারপর গানটান গে একেবারে রাত্তিরের খাওয়া সেরে ফিরবে। আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাব, আবার সঙ্গে করে দি যাব।'

চাপা গলায় নীলা বলল, 'আর কারো হাত দিয়ে যে পাঠাবেন না তা আমি জানি।'

'তা আর জানবে না। হেঁ-হেঁ, তুমি বুদ্ধিমতী মেয়ে।'

নীলা বলল, 'আপনার বিবেচনাটা কেমন বলুন দিকি—'

'কেন, কেন?' অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন অবিনাশ।

'একা মীনাই যাবে? আমাদের নেমন্তন্ন করলেন না?'

অবিনাশ পালধি কী করবেন ভেবে উঠতে পারলেন না। বিব্রত অপ্রতিভ ভাবটা অব মুহূর্তে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'আহা, আমার কথা তো শেষ হয় নি। নেমন্ত তোমাদেব সব্বাইয়ের নেমন্তন্ন বৈকি। সব্বাই যাবে তোমরা।'

'আমি বললাম বলে তো—'

দু হাত আর মাথা একসঙ্গে প্রচণ্ডবেগে নেড়ে অবিনাশ বললেন, 'তুমি না বললেও নেমন্ত করতাম। সে খেয়াল আমার ছিল।'

'থাকলেই ভাল।'

'তা আমার আবার দেবি হয়ে যাচ্ছে। মীনাকে তৈরি হয়ে নিতে বল।'

'কিন্তু—' একটু চিন্তিতভাবে নীলা বলল।

'কী?'

'আমি বললে তো হবে না। যাকে নিতে এসেছেন তার মতামতটা একবার নেওয়া দরকার

'তার আবাব কী মতামত?'

'বা রে, সে বড় হয়েছে। ভালমন্দ বুঝতে শিখেছে। আপনার সঙ্গে যাবে কি যাবে না, সে জানতে হবে না?'

অবিনাশের চোখের তাবা স্থির হয়ে গেল। খুব আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, ত জেনে এসো।'

নীলা বেরিয়ে গেল। তার পেছন পেছন নবেন্দুর মাও গেলেন। ঘরের ভেতর এখ মহীতোষ, অবিনাশ আব অমলেশ।

একটুক্ষণ চুপচাপ থেকে অবিনাশ পালধি কথা শুরু করলেন। মহীতোষের উদ্দেশে একটানা একতরফা কথা। মহীতোষ একটা কথারও উত্তর দিলেন না।

অবিনাশের একটা কথাও অমলেশ বুঝতে পারছে না; শুনতেও বোধহয় পাচ্ছে না। তিনি এ বাড়িতে অবাঞ্ছিত এবং নিদারুণ ভয়েরও বস্তু, টের পাচ্ছে অমলেশ। ভয়ের কারণটা যে কী অমলেশের অজানা। আকণ্ঠ অস্বস্তি নিয়ে সে বিভ্রান্তের মতো বসে থাকল।

এদিকে মহীতোষ চাটুজ্জে একটা কথা তো বলছেনই না, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে বুঝি-বা দম বন্ধ করে আছেন। তার সুস্থ সবল দিকটা আগে থেকে কাঁপছিলই, অসাড় অংশটায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে মনে হল।

অমলেশ আর বসে থাকতে পারছিল না। একসময় উঠে দাঁড়িয়ে পায়ে পায়ে বেরিয়ে পড়ল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে তাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল।

এক লাইনে পরপর চারখানা ঘর। উত্তর দিকের শেষ ঘরখানা মহীতোষের। তারপর দুখানা ঘর। শেষেরটা অমলেশের। উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয় ঘরখানায় নীলা আর তার মা চাপা গলায় কথা বলছিল।

নবেন্দুর মা বলছেন, 'অবিনাশ পালধিকে তুই চলে যেতে বল্ নীলা। মীনা যাবে না—'

নীলা বলল, 'একথাটা তুমিই তো বললে পারতে।'

নবেন্দুর মা চুপ করে থাকলেন।

নীলা আবার বলল, 'অত সহজে ওকে বিদায় করা যাবে না মা। এক বছর ধরে অবিনাশ পালধি আসছে; যতবার এসেছে ততবারই ওকে বিদায় করেছি। খুব বেশিদিন ওকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।'

'কিন্তু—'

'কী বলছ?'

'ও কিরকম মানুষ জানিস না?'

'জানি বৈকি মা। জানি বলেই তো বলছি, দুদিন আগে হোক আর পরে হোক, মীনাকে ওর সঙ্গে পাঠাতে হবেই।'

নবেন্দুর মা কী বললেন, অমলেশ বুঝতে পারল না।

নীলা আবার বলল, 'তুমি ভেবো না মা, মীনার কানে আমি মন্ত্র দিয়ে দেব। ও ঠিক অবিনাশের হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলবে। আর যদি না পাবে কী করা যাবে।' একটু থেমে আবার বলল, 'আমাদের মতো সংসারের মেয়েরা কতক্ষণ ঘরে থাকবে, কতক্ষণ তুমি আগলে রাখতে পারবে?'

নবেন্দুর মা উত্তর দিলেন না। শুধু বলতে লাগলেন, 'তোরা সবাই মিলে আমাকে মেরে ফ্যাল, মেরে ফ্যাল—'

অমলেশ আর দাঁড়াল না। সন্তর্পণে নীলাদের চোখ এড়িয়ে নিজের ঘরে চলে এল। ভেতরে পা দিয়ে অমলেশ চমকে উঠল। তার বিছানার এককোণে জড়সড় হয়ে বসে আছে মীনা; মুখখানা শুকিয়ে গেছে, ভীত চোখের মণিতে পড়েছে মৃত্যুর ছায়া, ঠোঁটদুটো নীল হয়ে গেছে। বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার আগে পশুকে যেমন দেখায় অবিকল সেই রকম দেখাচ্ছে মীনাকে।

অমলেশকে দেখেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মীনা; তারপর দুহাতে মুখ ঢাকল।

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান্নার অস্থির শব্দ শুনল অমলেশ। তারপর কি একটা স্রোত একটানে তাকে মীনার কাছে টেনে নিয়ে গেল। মীনার পিঠে একখানা হাত রেখে সস্নেহে বলল, 'কী হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

মীনা উত্তর দিল না। তার কান্নাটা স্নেহের সামান্য একটু স্পর্শে একেবারে উচ্ছ্বসিত হ উঠল।

অমলেশ আবার বলল, 'কেঁদো না মীনা, কেঁদো না। কী হয়েছে, আমাকে বলো।'

মুখ থেকে হাত সরিয়ে অমলেশের দিকে তাকাল মীনা। এই মুহূর্তে তার চোখ ভেজাভে আরক্ত। কান্নাভাঙা জড়ানো স্বরে সে বলতে লাগল, 'ঐ লোকটা এসেছে—'

'কার কথা বলছ?'

'অবিনাশ পালধির। পাঁচ-সাত দিন পর পর এসে আমাকে নিয়ে যেতে চায়।'

'কেন?'

'বলে তো গান শুনবে। আসলে—'

'কী?'

মীনা উত্তর দিল না। তার নীরবতা অনেক কিছু বুঝিয়ে দিল। ভেতরে ভেতরে অমলে শিউরে উঠল।

একটু ভেবে নিয়ে অমলেশ জিজ্ঞেস করল, 'বীজপুরে নিশ্চয়ই তুমি একলা গান জানো ন আরো অনেক মেয়ে জানে।'

'জানে তো!'

'এত গাইয়ে মেয়ে থাকতে তোমার গান শুনবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে কেন?'

উদাস সুরে মীনা বলল, 'কি জানি, আমরা গরীব বলে হয়তো।'

একটু চুপ করে থেকে অমলেশ বলল, 'অবিনাশ পালধি তোমাকে চিনল কেমন কর মানে আলাপ-টালাপ কী করে হয়েছে?'

মীনা বলল, 'বছর খানেক আগে বীজপুরে একটা ফাংশান হয়েছিল। আমি তাতে গ গেয়েছিলাম; ফাংশানের প্রেসিডেন্ট ছিল অবিনাশ পালধি। আমার গান শুনে যেচে আল করেছিল। কোথায় থাকি, কে কে আমার আছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল। তারপ একদিন আমাদের বাড়ি এসে হাজির। সেই থেকে প্রায়ই আসছে।

অমলেশ চুপ।

মীনা থামে নি। অস্থিরভাবে বলতে লাগল, 'আমি ওর সঙ্গে যাব না, কিছুতেই না। ম গেলেও না। অজয় যদি জানতে পারে ওর সঙ্গে গেছি—' বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গে তারপর অমলেশের একখানা হাত দু-হাতে আঁকড়ে করুণ মিনতিপূর্ণ সুরে বলল, 'আমা আপনি বাঁচান অমলেশদা, বাঁচান—'

গভীর আশ্বাসের সুরে অমলেশ বলল, 'ভয় নেই। দেখি আমি কী করতে পারি।'

মীনা কী বলতে যাচ্ছিল, এইসময় নীলা এসে ঘরে ঢুকল। বোনের উদ্দেশে বলল, 'তু এখানে বসে আছিস! আমি সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

মীনা চুপ।

নীলা আবার বলল, 'তা হ্যাঁ রে, অবিনাশের সঙ্গে যাবি নাকি?'

দাঁতে দাঁত চেপে মীনা বলল, 'না।'

'যাবি না কেন রে? এত আদর করে নিয়ে যেতে চাইছে! আমি তো ভাবছি অবিনাশ আমাদের ভগ্নিপতি করে নেব।'

বুকফাটানো চিৎকার করে উঠল মীনা, 'দিদি!' তারপরেই আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল

নীলা হাসছিল। এমন অবস্থায় কেউ যে হাসতে পারে, রসিকতা করতে পারে—অমলেশে পক্ষে এ একেবারে অকল্পনীয়।

যাই হোক হাসতে হাসতে নীলা বলল, 'এমন একটা ভাল কথা বললাম আর তুই কিনা কেঁদে একেবারে নদী বইয়ে দিলি!'

মীনা আরেকবার চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'দিদি!' বলেই উঠে দাঁড়াল।

নীলা বলল, 'তুই যখন চাস না তখন আজ ওকে বিদায় করে আসি। কিন্তু মনে রাখিস বোন, একদিন না একদিন তোকে অবিনাশের সঙ্গে বেরুতেই হবে।'

মীনা আর কিছু বলল না। ছুটে পালাল। তার পিছু পিছু নীলাও বেরিয়ে গেল।

একসময় খোপ-কাটা জানালার ফাঁক দিয়ে অমলেশ দেখতে পেল, ছাতা মাথায় দিয়ে বৃষ্টির ভেতর বড় রাস্তার দিকে চলে গেলেন অবিনাশ। একটু পর রাস্তায় মোটরের স্টার্ট নেবার আওয়াজ পাওয়া গেল। অমলেশ বুঝল, তাকে বিদায় করেছে নীলা। অমলেশ বিমূঢ়ের মতো বসে ছিল। নীলা আবার এ ঘরে এল। অমলেশের মুখোমুখি বলে বলল, 'কী ভাবছেন?'

অমলেশ চকিত হয়ে বলল, 'কিছুই না।'

একটু ভেবে নীলা আবার শুধলো, 'নটবরটিকে কেমন দেখলেন?'

'কে নটবর?'

'ঐ যে মনোহরণ বেশে বাবার ঘরে বসে ছিল। মানে অবিনাশ পালধি।'

'বুঝেছি। কিন্তু—'

'কী?'

'আমি লোকটাকে ভাল করে লক্ষ্য করিনি, তবে—'

'কী?'

'আপনাদের দিকে তাকিয়েছিলাম।'

'আমাদের দেখছিলেন!'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল আপনার বাবা, আপনি আর আপনার মা অবিনাশকে পছন্দ করেন না। সাঙ্ঘাতিক ঘৃণা করেন।'

'বাবা-মার কথা বলতে পারব না। তবে আমি অপছন্দ করি কে বললে? কে বললে আমি ঘৃণা করি? ঘৃণাই যদি করব, অপছন্দই যদি করব, তাহলে ঐ লোকটাকে ভগ্নিপতি করতে চাই?'

'ও তো ঠাট্টা।'

'নাকি?'

'নিশ্চয়ই।' একটু ভেবে নিয়ে অমলেশ বলল, 'আপনিই বলুন না, লোকটা কেমন?'

চোখ কুঁচকে নীলা বলল, 'চমৎকার। একেবারে আদর্শ ব্রহ্মচারী—'

তার স্বরে ধারালো ফলার মতো এমন ঝকমকানি ছিল যাতে চমকে উঠল অমলেশ, 'মানে?'

'মানে বিয়ে-টিয়ে করে নি, একেবারে চিরকুমার। তবে বীজপুরের অনেক মেয়ের, বিশেষ করে রিফিউজি মেয়েদের সর্বনাশ করেছে। দু-চারটে রক্ষিতা আছে—সন্ধ্যের পর মদের সাগরে নাকি সাঁতার কাটে।'

'এইরকম একটা লোকের সঙ্গে মীনাকে একদিন না একদিন যেতে হবে বলছেন!'

'বলছি—' অক্লেশে ঘাড় হেলিয়ে দিল নীলা।

অমলেশ হতবাক।

নীলা গলার স্বর গভীরে নামিয়ে বলতে লাগল, 'আপনি আমাদের সংসারের অবস্থা কতখানি

জানেন, জানি না। যদি জানতেন বুঝতে পারতেন কেন অবিনাশের মতো লোকের সঙ্গে ও যেতে হবে।'

অমলেশ এবারও নিরুত্তর।

নীলা আবার বলল, 'তবে ভয় নেই।'

'ভয় নেই!' অমলেশ প্রতিধ্বনি করল।

'না।' নীলা কেমন করে অমলেশের দিকে যেন তাকাল। চাপা শিসের মতো আওয়াজ ক বলল, 'দেখতেই ঢুসকো, আসলে ঢোঁড়া সাপ, বিষ নেই। আমার কাছে খবর আছে, অত্যাচ করে করে ওর দাঁত-নখের ধার পড়ে গেছে। বড়জোর একটু আদর, একটু গা-চাটা—এর বে কিছু করার ক্ষমতা ওর নেই। মীনার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগবে না।'

এমন অনায়াসে এবং স্বচ্ছন্দে একজন অনাত্মীয় প্রায়-অপরিচিত যুবকের সঙ্গে কে মেয়ে—যে মেয়ে রূপসী, তরুণী—এ জাতীয় আলোচনা করতে পারে তা ছিল অমলেশে পক্ষে অভাবনীয়। স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে বোবা হয়ে থাকল।

বাইরে বৃষ্টিটা মাঝে মাঝে প্রবল বেগে ঝরে যায়, কিছুক্ষণ কমে, আবার নতুন উদ্যমে শু হয়। বঙ্গোপসাগরকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে তার সবটুকু জল না ঢালা পর্যন্ত বর্ষার মেঘগু থামবে, এমন মনে হয় না।

এখন বেশ রোজই বৃষ্টি পড়ছে। জানালার বাইরে উদাস চোখে তাকিয়ে কিছুক্ষণ অঝো বর্ষণ দেখতে লাগল নীলা। আর সত্তার অতল স্তরে জগতের সমস্তটুকু কাঁপুনি জড়ো ক অমলেশ অপেক্ষা করতে লাগল।

সারা পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে বৃষ্টি পড়ছেই, পড়ছে। সৌরলোকের এই গ্রহটি জুড়ে বৃষ্টি লক্ষকোটি ধূসর ধারা আর তার একটানা ঝমঝমানি ছাড়া আর বুঝি কিছু নেই।

নীলা হঠাৎ বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে আনল, 'তারপর—'

উৎকণ্ঠের মতো অমলেশ বলল, 'কী বলছেন?'

'আপনার সঙ্গে সেই বোঝাপড়াটা সেরে নিই আসুন। তখন কথার মাঝখানে অবিনাশ এ হাজির হল।'

নীলার ইঙ্গিত অমলেশ বুঝতে পেরেছে। তবু শ্বাসরুদ্ধের মতো জিজ্ঞেস করল, 'কো বোঝাপড়াটা বলুন তো?'

'আপনার স্মৃতিশক্তি দেখছি খুবই দুর্বল।' নীলা বিচিত্র হাসল, 'নাকি বুঝেও না বোঝা ভাণ করছেন?'

অমলেশ যেখানে পৌঁছেছে সেখান থেকে ফেরা সম্ভব না। সে কপটতার আশ্রয় কর থাকল। বলল, 'ভাণ করব কেন?'

নীলা এ ব্যাপারে অমলেশকে আব বিব্রত করল না। সোজা নবেন্দুর প্রসঙ্গে চলে গে 'আমি দাদার কথা জানতে চাই। সে কোথায় আছে, কেমন আছে, তার কোন ক্ষতি হয়ে কিনা, সব স্পষ্ট করে বলুন—'

গভীর সরোবরে কেউ যেন অমলেশকে অথৈ অতলে টানতে লাগল। মরিয়ার মতো নী বলল, 'মা-বাবার চোখে ধুলো ছিটোতে পেরেছেন ঠিকই, কিন্তু আমাকে যা হোক কিছু বুঝি দেওয়া অত সহজ না। আমার চোখে আপনি ধরা পড়ে গেছেন।'

অমলেশ কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় বাধা পড়ল। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে মেয়ে-গলা ভে এল, 'নীলা—নীলা—'

ঘাড় ফিরিয়ে অনেকটা আপনমনে নীলা বলল, 'আবার কে এল—'

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না; প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় এসে যে দাঁড়াল তার সারা গা ওয়াটারপ্রুফ দিয়ে মোড়া। ভিজে ওয়াটারপ্রুফটা একেবারে জবজবে হয়ে আছে; সেটা দিয়ে জলের স্রোত নামছে।

বর্ষাতিটা খুলতেই যে বেরিয়ে পড়ল সে নীলারই প্রায় সমবয়সিনী। গোল চাকার মতো মুখ, গায়ের রঙখানি শ্যামলা, প্রচুর চুল, ভাষাময় উজ্জ্বল চোখ। মেয়েটা সুদেহিনী। তার মাঝারি গড়নের সুন্দর শরীরখানি ঘিরে মধুর লাবণ্য মাখা।

নীলা খানিক অবাক হয়ে বলল, 'এই বৃষ্টিতে তুই!'

'হ্যাঁ, আমিই!' মেয়েটি ব্যস্তভাবে বলল, 'তুই এখনও বসে আছিস! বেরুবি কখন? এগারটার ট্রেনে আমাদের বেরুবার কথা ছিল না? তোর জন্য অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত আসতে হল।'

'আমি একদম ভুলে গেছলাম রে। আমার ধারণা ছিল আজও দুটোর ট্রেনে গেলে চলবে।'

'নে নে, তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে। খেয়েছিস?'

'না।'

'আর বসে থাকিস না বাপু—' বলতে বলতে হঠাৎ অমলেশের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল মেয়েটা। আস্তে করে বলল, 'ইনি?'

নীলা পরিচয় করিয়ে দিল, 'অমলেশ বসু—দাদার বন্ধু। বোম্বাইতে থাকেন। পরশু দিন আমাদের বাড়ি এসেছেন।'

'কই, এঁর কথা তো আমায় বলিস নি! আজকাল খুব চেপে যেতে শিখেছিস।'

উত্তর না দিয়ে নীলা অমলেশের উদ্দেশে বলল, 'আর এ হল নূপুর—নূপুর সান্যাল। আমার বন্ধু। কাল রাত্তিরে এদের বাড়ির গেট পর্যন্ত আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলাম।'

স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে অমলেশ নূপুরের দিকে তাকাল। প্রথম পরিচয়কে চিহ্নিত করার জন্য নমস্কার করল। নূপুরও তাই করল এবং নীলাকে বলল, 'গেট পর্যন্ত গিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলি না যে?'

'অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল তাই আর নিই নি—অবশ্য ইচ্ছা ছিল তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।'

চকিত অর্থপূর্ণ চাউনি হেনে নূপুর বলল, 'অনেক রাত হল কী করে?'

নূপুরের কল্পনাকে উস্কে দেবার জন্যই হয়ত নীলা বলল, 'এই একটু এদিক-সেদিক বেড়াচ্ছিলাম। তাই—'

'উনি আছেন তো ক'দিন?'

'আছেন।'

'বেড়িয়ে টেড়িয়ে সময় পেলে আরেক দিন আমাদের বাড়ি নিয়ে যাস।'

'যাব।' বলেই একেবারে ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল নীলা, 'বেরুতে তো বলছিস মুখপুড়ি, কিন্তু বৃষ্টি! আমার আবার ছাতা-টাতা নেই।'

'তোর জন্য একটা ওয়াটারপ্রুফ নিয়ে এসেছি।'

'তাই নাকি। তবে আর বসে আছি কেন?' বলেই উঠে পড়ল নীলা, 'তোরা একটু গল্প-স্ব কর। আমি চট করে খেয়ে আসছি। জাস্ট ফাইভ মিনিটস্।'

'উঁহু—' নূপুরও উঠে পড়ল, 'বাড়ির দরজায় গিয়ে ভেতরে ঢোকাস নি। আমি ওঁর সঙ্গে এখানে কথাই বলব না। আমাদের বাড়ি যেদিন নিয়ে যাবি সেদিন গল্প করব। তার আগে না।'

'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা?'

'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।'

নীলারা হাসতে হাসতে চলে গেল। অমলেশ বসে থাকল।

মিনিট দশেক পর আবার ফিরে এল নীলা। ভেতরে ঢুকল না। দরজার বাইরে থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, 'এখনও হল না। রাত্তিরে ফিরে আমার সেই প্রশ্নটার জবাব কিন্তু চাই।'

আরো খানিক পরে জানালার চৌকো চৌকো ফাঁক দিয়ে অমলেশ দেখতে পেল দুই সখি সারা গা বর্ষাতিতে ঢেকে বড় রাস্তায় চলে গেল।

১৭

খাওদা-দাওয়ার পর নিজের ঘরখানায় এসে শুয়ে পড়ল অমলেশ। ঘুম আসছে না। জানালাব ফাঁকে বাইরের যে অংশটুকু চোখে পড়ছে সেখানে শুধু নিবিড় কালো মেঘ আর বৃষ্টি। কিছুক্ষণ আগের মতো বৃষ্টিটা অবশ্য অশ্রান্ত নয়। মাঝে মাঝে থামছে, পরক্ষণেই শুরু হয়ে যাচ্ছে।

আজ সকাল থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটে গেছে সব হুড়মুড় করে অমলেশের ভাবনার ভেতব ভিড় করে আসছে। ঝুনু আর নিতুর খণ্ডযুদ্ধ, অবিনাশ পালধি, মীনাকে নিয়ে যাবার প্রস্তাব, নীলার রসকষহীন নিদারুণ রসিকতা, নূপুর—নানা কথা, নানা ঘটনা আর অনেকগুলো মুখ অমলেশের চোখের সামনে দিয়ে মিছিল করে যেতে লাগলো।

হঠাৎ সব ভাবনা আব ঘটনা একপাশে ঠেলে দিয়ে সেই কথাটা অমলেশের মনে পড়ে গেল। কালকের মতো আজও বেরুবার সময় নীলা বলে গেছে রাত্তিরে ফিরে এসে নবেন্দুব ব্যাপারটা বোঝাপড়া করে নেবে। তার আগেই অমলেশের পালানো উচিত। কেননা যে অস্পষ্টতা ছিল এখন আর তা নেই। নবেন্দুর ব্যাপারে নীলার কাছে সে ধরা পড়ে গেছে। তার লুকোচুরি আর কপটতা সবার চোখে ধুলো ছিটোতে পেরেছে, শুধু একজন বাদ। সে নীলা।

চিন্তাটা সম্পূর্ণ হল না। তার আগে দরজার বাইরে কার আবছা গলা শুনতে পেল অমলেশ, 'অমলেশদা—'

হাতের ভব দিয়ে উঠে বসতেই অমলেশ দেখতে পেল, দরজার কাছে মীনা দাঁড়িয়ে আছে। সে ডাকল, 'ওখানে কেন, ভেতরে এসো।'

মীনা ভেতরে এসে অমলেশেব কাছে বসল। লক্ষ্য করল তার চোখ ফোলা ফোলা, ভেজা এবং আবক্ত। দেখেই অমলেশ টের পেল খুব কেঁদেছে মেয়েটা।

খেতে বসে মীনাকে দ্যাখে নি অমলেশ। সেই যে নীলার মারাত্মক রসিকতা শুনে সে পালিয়ে গিয়েছিল, তারপর আবার তাকে এই দেখল অমলেশ।

ভীত চোখে অমলেশের দিকে একপলক তাকিয়ে কাঁপা-গলায় মীনা বলল, 'আমার কী হবে অমলেশদা?'

মীনার প্রশ্নটার ভেতর কী আছে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না অমলেশের। সে বলল, 'অত ভয় পাচ্ছ কেন?'

'ওই অবিনাশের হাতে আমার বলি হবে—' বলে দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্না শুরু করল মীনা।

অমলেশের সমস্ত অস্তিত্বের ভেতর এই মুহূর্তে নিদারুণ বিপর্যয় ঘটে গেল। জগতের সবটুকু আশ্বাস গলায় ঢেলে সে বলল, 'কেউ তোমায় বলি দিতে পারবে না। অজয়েব ঠিকানাটা আমাকে দাও তো। দেখি তোমার জন্য কী করতে পারি।'

মীনার চোখে শঙ্কার ছায়া পড়ল, 'অজয়েব ঠিকানা দিয়ে কী হবে?'

'সে চিন্তা তোমার নয়। ওটা আমাকেই ভাবতে দাও।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মীনা ঠিকানাটা বলল, 'চ্যাটার্জি পাড়ায় ওরা থাকে। কাল ানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, তার কাছেই জায়গাটা। ওর দাদার নাম বিজয় গাঙ্গুলী। ওখানে য কাউকে নাম জিজ্ঞেস করলে বাড়ি দেখিয়ে দেবে।'

'ঠিক আছে।'

বৃষ্টিটা মোটামুটি ধরে এলে অজয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল অমলেশ। বেরুবার মুখে ন্দুর মার সঙ্গে দেখা। তিনি শুধোলেন, 'কোথায় যাচ্ছ বাবা?'

অমলেশ বলল, 'সারাদিন তো বাড়িতে বসে আছি। যাই একটু ঘুরে-টুরে আসি।'

'হ্যাঁ, যা বৃষ্টি। ঘরে আটকে থাকা ছাড়া উপায় কি। তা একাই যাবে, না ঝুনু মীনা সঙ্গে ব?'

'না না, ওদের আর কষ্ট দিয়ে দরকার নেই। আমি যাব আব আসব।'

নবেন্দুর মা কী বুঝলেন তিনিই জানেন। আর কিছু বললেন না। অমলেশও আর কিছু াব সুযোগ না দিয়ে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দিল।

বাইরের রাস্তায় এসে নিজের মূঢ়তায় অমলেশ নিজেই স্তম্ভিত। নিজেকে বারবার ধিক্কার ত দিতে অমলেশ ভাবতে লাগল, এক নবেন্দুর ব্যাপাবই উন্মাদ করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। । সঙ্গে কেন যে মীনার সমস্যাটা জুড়তে গেল!

এই সুযোগে অমলেশ অবশ্য অনায়াসেই পালিয়ে যেতে পারে। পালাবার কথা ভাবতে য মীনার ভীত সজল রক্তাভ চোখ দুটির কথা মনে পড়ে গেল অমলেশেব। সঙ্গে সঙ্গে তার ল হাজারটা অদৃশ্য শৃঙ্খল বীজপুরের নানা দিক থেকে তাকে যেন বেঁধে ফেলেছে। অন্তত াব একটা ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বীজপুর থেকে অমলেশ যেতে পারবে না।

গভীর অন্যমনস্কতার ভেতর কখন যে রিফিউজি কলোনীর সরু কাঁচা পথ থেকে বড় ায় এসে পড়েছিল, অমলেশের খেয়াল নেই। সাইকেল রিক্সার ঘণ্টিব শব্দে চমকে উঠল পিছন ফিবতেই দ্যাখে গাড়িটা খালি।

অমলেশকে তাকাতে দেখে রিক্সাওলা গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল। বলল, 'যাবেন বাবু?'

রিক্সায় উঠে অমলেশ বলল, 'রানীবাজার চল।'

বিক্সা চলতে লাগল। দুধারে সেই পরিচিত দৃশ্য—পুরনো ভাঙা বাড়ি, বর্ষায় ভরে যাওয়া র, ছোট ছোট খাল, সাঁকো, কচুরি পানা ইত্যাদি ইত্যাদি। যেতে যেতে হঠাৎ পাশ থেকে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা—দাদা—'

চমকে তাকাতেই অমলেশ দ্যাখে কুড়ি একুশ বছরের একটা ছোকরা রিক্সাব গা ঘেঁষে ছ। চোখাচোখি হতেই সে বলল, 'এক মিনিট বড়দা, এক মিনিট। প্লীজ গাড়িটা একটু ান।'

অমলেশ গাড়ি থামাতে বলল। থামলে, ছোকরা ছুটে এসে বলল, 'কোনদিকে যাবেন দা?'

চোখ কুঁচকে ছোকরার পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিল অমলেশ। পরনে সরু ন পাইপ প্যান্ট আর চক্কর-বক্কর টী-শার্ট। প্যান্টটা কোমরের তলাব দিকে চিত্র-বিচিত্র একটা ট দিয়ে বাঁধা। পায়ে ছুঁচলো জুতো, গলায় লাল রুমাল বাঁধা, ডান হাতে লোহার বালা। র-কাটা চুল মাথায় পেখম মেলে আছে। সব মিলিয়ে লক্কা মার্কা চেহারা। দেখেই মেজাজটা ক হয়ে উঠল। বিরক্ত গলায় অমলেশ বলল, 'কেন?'

'দরকার আছে।'

অমলেশ একবার ভাবল, উত্তর না দিয়ে রিক্সা চালিয়ে দিতে বলে। পরক্ষণে বিরক্তি গোপ করে সংক্ষেপে বলল, 'রানীবাজার যাব।'

ছোকরা দাঁত বার করে হাসল। চোখের একটা ভঙ্গি করে বলল, 'বাঁচালেন দাদা, আমি রানীবাজারেই যাব। অতখানি রাস্তা পায়দল মারতে হলে টেংরি শ্লা পাংচার হয়ে যাবে। খু বড়ে মেহেরবান, আপনাকে মিলিয়ে দিলে—' বলে অমলেশের সম্মতির অপেক্ষা না রে পাশে উঠে বসল। বসতে বসতে বলল, 'রানীবাজারের মুখে স্রেফ একটু ফেলে দিয়ে যাবে দাদা—'

অমলেশ উত্তর দিল না। দেখেই সেই যে তার মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছিল আর প্রসন্ন হ না। অমলেশ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। রিক্সা আবার চলতে লাগল।

খানিক যাবার পর অমলেশ ছোকরার ডাক শুনতে পেল, 'বড়দা—'

অমলেশ মুখ ফেরাল।

সে বলল, 'শ্লা, ভারি গাড্ডায় পড়ে গেলাম যে—'

নিস্তরঙ্গ নীরস সুরে অমলেশ জিজ্ঞেস করল, 'কী হল?' পকেট থেকে সিগারেটের এক প্যাকেট বার করে ছোকরা বলল, 'এই দেখুন, ইঞ্জিন আছে, ডিজেল নেই! ম্যাচিস্ হবে?'

অমলেশের ইচ্ছে হল টেনে এক চড় কষায়। নেহাত এ শহরে সে অচেনা আগন্তুক, হয়ে আজই এখান থেকে চলে যাবে। তাই অতি কষ্টে সদিচ্ছাটা দমন করে গম্ভীর স্বরে বলল, 'না

ছোকরা বলল, 'অনেকক্ষণ দম দিই নি, জান শ্লা পটাশিয়াম হয়ে যাচ্ছে। একটু কষ্ট কে পকেটে হাত চালিয়ে দিন। কর্নারের দিকে দেখবেন একটা ম্যাচিস্ পড়ে আছে।'

কথা না বাড়িয়ে অমলেশ পকেট থেকে দেশলাই বার করে ছোকরার হাতে দিল। এক ধরিয়ে কায়দা করে ধোঁয়ার গোল্লা ছাড়তে ছাড়তে সে দেশলাইটা ফেরত দিল। তারপ সিগারেটের প্যাকেটখানা অমলেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'একটা নিন।'

'না।'

'না কেন। একটা ধরান না। আপনার রিক্সায় চড়লাম, একটা দেশলাইয়ের কাঠি খসি দিলাম, আমার একটা সিগারেট না নিলে প্রাণে বড় ব্যথা পাব দাদা। নিন—নিন—'

অমলেশ আবারও বলল, 'না।'

'ঠিক আছে। একটা সিগারেট শ্লা বেঁচে গেল। আরেক বার দম মারা যাবে।' বলে সিগারেটে প্যাকেট পকেটে পুরল।

এক সময় অমলেশরা রানীবাজারের মুখে এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভেতর আঙু পুরে ছোকরা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে তীক্ষ্ণ সিটি দিয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ আরো অনেকগুলো সিটি শব্দ শোনা গেল। অমলেশ লক্ষ্য করল, দূরে একটা চায়ের দোকানের সামনে তার পাশে ছোকরাটির সমবয়সী ক'টি ছেলে বসে আছে। তারাই সিটি দিচ্ছে।

মুখ থেকে হাত বার করে ছোকরা বলল, 'দাদা গাড়িটা একটু বাঁধুন। আমার স্টেশন এ গেছে।'

গাড়ি থামলে চায়ের দোকানের ছোকরাদের মধ্যে উল্লাস দেখা দিল। এক পাক ঘুরে নি তারা বলে উঠল, 'রাজ্ জা আ গিয়া, মেরে রাজ্ জা—আয় শ্লা, আয়—'

আর এই ছোকরা রিক্সা লাফ দিয়ে নেমে ঝাঁকের ভেতর মিশে গেল। অমলেশের দিকে ফিরেও তাকাল না।

অমলেশ রিক্সাওলাকে বলল, 'চল—'

রানীবাজারের মাঝখানে এসে অমলেশ রিক্সাওলাকে শুধলো, 'আচ্ছা, চ্যাটার্জি পাড়াটা কোন্ দিকে বলতে পার?'

'ঐ তো, ডানদিকের রাস্তায় গেলেই পাবেন।'

ভাড়াটাড়া মিটিয়ে রিক্সাওলাকে ছেড়ে দিল অমলেশ। তারপর পায়ে পায়ে ডানদিকের রাস্তায় চলে এল।

অজয়দের ঠিকানা খুঁজে বার করতে অমলেশের বেশি সময় লাগল না। রাস্তায় দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতে তারা বাড়িটা দেখিয়ে দিল।

হলুদ রঙের একতলা ছোট বাড়ি। সামনের দিকে সামান্য বাগান। কড়া নাড়তেই যিনি এসে সামনে দাঁড়ালেন তাঁর দিকে তাকিয়ে অমলেশের চোখদুটি স্নিগ্ধ হয়ে গেল। মহিলার বয়স তিরিশ পেরিয়ে গেছে। বড় বড় দুটি চোখ ঘন পালকে ঘেরা। খুব ফর্সা নন, শ্যামাঙ্গিনী। এই বয়সেও কচি পাতার কোমল আভার মতো একটি লাবণ্য তাঁকে ঘিরে আছে। কোঁচকানো কোঁচকানো অজস্র অবাধ্য চুল্ পিঠময় ছড়িয়ে আছে। পানপাতার মতো সরু চিবুক। কপালে সিঁদুরের মস্ত টিপ; নাকটি লম্বা ছাঁদের পাতলা ঠোঁট। পরনে কমলা রঙের শাড়ি আর সবুজ জামা। মহিলাকে ঘিরে কোথায় যেন অলৌকিকের একটু ছোঁয়া আছে। মনে হয় দুপুরের ঘুম থেকে উঠে এসেছেন। এখনও চোখে-মুখে তার রেশটুকু মাখানো।

মহিলা জিজ্ঞাসু চোখে অমলেশের দিকে তাকালেন। অমলেশ তাড়াতাড়ি বলল, 'অজয় আছে?'

মীনা বলেছিল, অজয় তার দাদার কাছে থাকে। দাদা, বৌদি আর সে নিজে—এই নিয়ে তাদের সংসার। মহিলা খুব সম্ভব তার বৌদিই হবেন। বললেন, 'না। খেয়েদেয়ে বেরিয়ে গেছে। আপনি?'

'নাম বললে তো চিনবেন না। আমি এখানকার লোক নই।' একটু থেমে অমলেশ বলল, বিশেষ দরকারে অজয়ের কাছে এসেছিলাম। আচ্ছা ও কখন ফিরবে বলতে পারেন?'

'ফিরতে ফিরতে চারটে সাড়ে চারটে তো হবেই।'

চিন্তিত মুখে অমলেশ বলল, 'তাই তো, ভারি মুশকিল হল।'

একপলক অমলেশকে দেখে নিয়ে মহিলা বললেন, 'আপনি ইচ্ছে করলে বসতে পারেন। এখন দুটো বাজে। অবশ্য ঘণ্টা দু-আড়াই বসতে হবে।

খানিক ইতস্ততঃ করে অমলেশ বলল, 'তার চাইতে আমি বরং ঘুরে আসি। অজয়কে বলবেন অমলেশ বসু এসেছিল। ও যদি আগে ফেরে, যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যায়।'

'আচ্ছা।'

পায়ে পায়ে চ্যাটার্জিপাড়া থেকে বেরিয়ে এল অমলেশ। অজয়ের সঙ্গে এখনই দেখা হয়ে গেলে ভাল হ'ত। অমলেশের ইচ্ছা ছিল মীনার কথা তাকে বলে লাস্ট ট্রেনে কলকাতার দিকে পালাতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তা হল না। কলকাতার লাস্ট ট্রেন সাড়ে ছ'টা নাগাদ। সাড়ে চারটের সময় যদি অজয়ের সঙ্গে দেখা হয়, কথাবার্তা সারতে ঘণ্টাখানেক অন্তত লাগবে। তারপরেও একটা ঘণ্টা অমলেশের হাতে থেকে যাবে। ট্রেন ধরার পক্ষে তা যথেষ্ট। পরক্ষণেই তার মনে পড়ল কালকের মতো আজও যদি স্টেশনে নীলার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। চকিত হয়ে অমলেশ ভাবল, ট্রেন ছাড়া কলকাতায় আর কোন ভাবে যাওয়া যায় কিনা তার খোঁজ নিতে হবে।

যাই হোক, অমলেশ ঘুরতে ঘুরতে বীজপুরের ঝকঝকে আধুনিক পাড়া পার হয়ে অ
একটা রাস্তায় এসে পড়েছিল। একদিকে পালাবার ভাবনা, আরেক দিকে মীনার চিন্তা—এই
মেরুর মাঝখানে তার মনটা দোল খাচ্ছিল। অমলেশ অন্যমনস্কের মতো হাঁটছিল।

হঠাৎ উত্তেজিত চেঁচামেচির শব্দে অমলেশ চমকে উঠল। সামনের দিকে তাকাতেই দ্যা
কুড়ি একুশ বছরের ক'টি ছোকরা একটু পুরনো দোতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ছোকরা
পরনে ড্রেন-পাইপ প্যান্ট, টী-শার্ট। কারো পায়ে চটি, কারো-বা ছুঁচলো জুতো। সব চাই
দর্শনীয় তাদের দাড়ি। কারো পরিষ্কার চাঁছা মুখে শুধু থুতনির কাছটায় একগোছা দাড়ি; কা
-বা জুলপি থেকে সরু করে চিবুক পর্যন্ত দাড়ি নেমে এসেছে। কারো আবার দাড়ি গোঁ
বালাই নেই।

বাড়িটার সামনের দিকে একফালি রক। তার ওপর গোলাকার এক ভদ্রলোক যাঁর গ
বলতে কিছু নেই, ধড়ের ওপর মুণ্ডুটা সরাসরি বসানো—তীক্ষ্ণ সরু কণ্ঠে চিৎকার করছিলে
কী বলছিলেন, দূর থেকে বুঝতে পারছিল না অমলেশ। কৌতূহল হতে বড় বড় পা-ফে
এগিয়ে গেল।

কাছে আসতে অমলেশ শুনতে পেল ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছেন, 'কুড়ি টাকা চাঁদা? মগের মু
পেয়েছ!'

ছোকরাদের ভেতর থেকে একজন বোঝাতে চেষ্টা করল, 'চাঁদা কেন ভাবছেন? চাঁ
ভাবলেই শ্লা যত গোলমাল। ভাবুন দেশের একটা ভাল কাজে ক'টা টাকা ছাড়লেন।'

ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, 'ভাল কাজ! এর নাম ভাল কাজ!

'নয়? ভাবুন তো প্রেসটিজ কতখানি বেড়ে যাবে বীজপুরের।'

'প্রেসটিজ ধুয়ে আমি জল খাব। অ্যাঁ, জল খাব!'

ছোকরা সে কথার উত্তর না দিয়ে বলল, 'আবদার করে একবার এসেছি—'

'একবার! দু-চারদিন পর পরই তো একটা তাল তুলে চাঁদা নিতে আসছ। গভর্নমেন্টকে
তো এতবার ট্যাক্স দিতে হয় না।'

'আপনাদের কাছে ছাড়া আর কাছে যাব জ্যাঠামশাই। আপনারা না দেখলে বীজপু
প্রেসটিজ একেবারে পাংচার হয়ে যাবে।'

ভদ্রলোক চিড়বিড়িয়ে উঠলেন 'জ্যাঠামশাই! জ্যাঠামশাই কি হে! ইয়ার্কি পেয়েছ! তোমা
মতন ভাইপো আমার দরকার নেই।'

'জ্যাঠামশাই তো বলতে দেবেন না, তবে কী বলব?'

'কিছু বলবে না।'

ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন আস্তে করে বলল, 'জামাইবাবু বলব?'

ভদ্রলোক স্পষ্ট শুনতে পাননি। বললেন, 'কী, কী বললে?'

ছোকরাদের কেউ উত্তর দিল না। ঠোঁট টিপে চোখে চোখে হাসতে লাগল।

সেই ছোকরাটা আবার বলল, 'দশ টাকার দু খানা পাত্তি আপনার কাছে কিচ্ছু না। প্রে
হাত ঝেড়ে দিলে অমন পাত্তি কত উড়ে যায়।'

ভদ্রলোক আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ অমলেশের দিকে তাঁর নজর পড়ল। সমর্থ
আশায় বললেন, 'দেখুন দিকি মশায় কি ঝামেলা!'

অমলেশ শুধলো, 'কী হয়েছে?'

'আরে মশাই, এরা জলসা করবে, আর টাকা দিতে হবে আমাকে! এক আধ-টাকা না, কু
টাকা!' ভদ্রলোকের গলা ক্রমশঃ চড়তে লাগল, 'আজ দুগ্‌গা পুজো, কাল কালী পুজো, প

হাত্তর ঘণ্টা সাইকেল, তার পরের দিন মদ খাওয়া—সব কিছুর জন্য আমাদের টাকা দিতে ব। দেখুন দিকি, কি জুলুম!'

ভিড়ের ভেতর থেকে আরেকটা ছেলে ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে গেল। অমলেশ লক্ষ্য রল, সেই ছোকরা, কিছুক্ষণ আগে যে তার রিক্সায় করে খানিকটা পথ এসেছিল। সে বলল, াপনার রোয়াবি অনেক সয়েছি, আর না। বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। মাল খাবার জন্য ান শ্লার কাছে একটা পয়সা নিই না।'

ভদ্রলোক ভেংচে উঠলেন, 'চাঁদা তুলে কী করো শুনি?'

ছোকরা বলল, 'ঝুট ঝামেলা ছেড়ে দুখানা পাত্তি ছুঁড়ে দিন। জলসার দিন আপনাকে কেবারে প্রধান অতিথি করে ডায়াসে বসিয়ে দেব। মালা পাবেন, হাততালি পাবেন।'

ভদ্রলোক চেঁচালেন, 'এক পয়সা দেব না।'

'দেবেন না?'

'না।'

'পেটো চেনেন?'

হকচকিয়ে ভদ্রলোক বললেন। 'পেটো কী? অ্যাঁ, পেটো কী?'

ছোকরা হাতের বিশেষ মুদ্রা দেখিয়ে বলল, 'মোয়া; তার মাথায় পলতে থাকে। স্রেফ কখানা দেশলাইর কাঠি জ্বেলে পলতেটায় ধরিয়ে দিলেই আর দেখতে হবে না। আপনার ঐ য়ালখানা ফর্সা হয়ে যাবে।'

'তার মানে বোমা! তুমি বোমা মারতে চাও!'

'কে বললে মারতে চাই। কুড়িটা টাকা ছুঁড়ে দিন, চলে যাই।'

ভদ্রলোক এবার অমলেশের দিকে তাকালেন, 'শুনলেন মশাই, শুনলেন? বোমার ভয় খিয়ে টাকা আদায় করতে চাইছে। শুনলেন?'

হঠাৎ অমলেশের কী হয়ে গেল। বলল, 'কী হচ্ছে ভাই, উনি যখন দিতে চাইছেন না তখন ড়েই দাও না—'

ছোকরা এবাব অমলেশের দিকে তাকাল এবং দেখেই চিনতে পারল, 'আরে বড়দা, আপনি

'হাঁ, আমি। যা বললাম, শোন। ওঁকে ছেড়ে দাও—'

'ছেড়ে তো দিতে বলছেন, ফাংশানটা হবে কী করে শুনি? কলকাতা থেকে বড় বড় াটিস্ট আসবে। সে সব খরচা কে দেবে?'

'তাই বলে লোকের ওপর জবরদস্তি করবে?'

'জবরদস্তি কোথায়, উনি ভালবেসেই দেবেন।'

'তবে যে বোমার কথা বলল!'

'মাজাকি করছিলাম বড়দা, বুঝতে পারেন নি?'

'পেরেছি। পেরেছি বলেই বলছি চলে যাও।'

অমলেশের গলায় কী ছিল, ছোকরা তার দিকে স্থির চোখে তাকাল। এবার তার গলার বই গেল বদলে। বলল, 'অর্ডার দিচ্ছেন?'

অমলেশের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল। বলল, 'হ্যাঁ দিচ্ছি।'

'রুস্তমী করছেন। ও সব এখানে চলবে না।' দাঁতে দাঁত চেপে ছোকরা বলল।

'ভদ্রভাবে কথা বল।'

'আপনার কাছে ভদ্রতা শিখতে হবে! রুস্তমী তোমার ছাড়িয়ে দিচ্ছি শ্লা—' ছোকরা মার হয়ে এল।

অমলেশের মাথার আর ঠিক থাকল না। টেনে একটি চড় কষিয়ে দিল ছোকরাকে। চ বেশ জোরই হয়েছিল, ছোকরা প্রায় হাত দশেক দূরে ছিটকে পড়ল। জলে কাদায় তা মাখামাখি হয়ে গেল। বাকি ছোকরারা চিৎকার করে উঠল। তারা আক্রমণই করতো হয় অমলেশ হাতের কাছে একখানা বড় বাঁশের টুকরো পেয়ে যেতে থমকে দাঁড়াল। তা কাদামাখা সঙ্গীকে নিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে শাসাল, 'জানের মায়া ছেড়ে দিও শ্লা। আ আসছি—'

সেই গোলাকার ভদ্রলোক ভীত সুরে বললেন, 'এ কী করলেন মশাই; ওরা বীজপু মার্কামারা ছেলে। ছুরি চালায়, বোম মারে—'

অমলেশ উত্তর দিল না।

কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে চারটের সময় অজয়দের বাড়ি এসে পৌঁছুলো অমলেশ। এ অজয়ই দরজা খুলে দিল। অমলেশকে দেখে সে অবাক। বলল, 'দাদা আপনি।'

হেসে অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ আমি। আরেকবার এসেছিলাম।'

'বৌদির কাছে শুনেছি। আপনার নাম তো জানতাম না। ভেবেই পাচ্ছিলাম না, অম বসু কে?' একটু থেমে অজয় সাদরে আবার বলল, 'আসুন দাদা আসুন—'

অমলেশকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে অজয় বলল, 'সত্যি সত্যি আপনি আমাদের বাড়ি আসবেন, ভাবতেই পারি নি। কী খুশি হয়েছি!'

'হ্যাঁ, আসতে হল।'

'ঠিকানা পেলেন কার কাছে?'

হাসিমুখে রহস্যের সুরে অমলেশ বলল, 'কার কাছে পেতে পারি. তুমিই বল না—'

চোখ নামিয়ে অজয়ও হাসল, কিছু বলল না।

অমলেশ এবার বলল, 'দুপুরবেলা কোথায় বেরিয়েছিলে?'

'টাইপ করতে।' অজয় বলতে লাগল, 'পাঁচ বছর ধরে টাইপ করে যাচ্ছি! চাকরি আর না। প্রায়ই ভাবি ছেড়ে দেব। তারপরই মনে হয়, ছেড়ে দিলেই তো স্পীড কমে যাবে।'

বিচিত্র একটু বিষাদ অমলেশকে ছুঁয়ে গেল যেন।

ভেতরে এসে একটা ঘরে অমলেশকে নিয়ে এল অজয়। ঘরটার একধারে তক্তপো পরিষ্কার বিছানা পাতা। আরেক ধারে কাঠের পুরনো আলমারি, মাঝখানে বড় একটা টে ঘিরে বেতের ক'টি চেয়ার। জানালায় এবং দরজায় পুরনো কাপড়ে সুতোর নক্সা করে টাঙানো হয়েছে। সুন্দর একটি রুচি এবং পরিচ্ছন্নতা ঘরখানায় মাখানো।

অজয় বলল, 'বসুন দাদা।' অমলেশ বসলে বলল, 'এই ঘরটা আমার বেডরুম-ক বৈঠকখানা।'

অমলেশ হাসল।

অজয় আবার বলল, 'আপনি একটু বসুন, আমি আসছি।'

ব্যস্তভাবে অমলেশ বাধা দিল, 'না না, ভেতরে গিয়ে এখন আর ঝামেলা করতে হবে আমি কিচ্ছু খাব না কিন্তু। তুমি বোসো; বিশেষ দরকার আছে তোমার সঙ্গে।'

অজয় বলল, 'বসব তো নিশ্চয়ই। তার আগে বৌদিকে খবর দিয়ে আসি।'

'কিন্তু যে ব্যাপারে এসেছি সেটা খুব প্রাইভেট; একমাত্র তোমাকে বলতে চাই।'
'বৌদির কাছে প্রাইভেট বলে আমার কিছু নেই অমলেশদা।'
'তোমার সঙ্গে কথাটা সেরেই আমি চলে যাব। আমার খুব তাড়া আছে।'
একটু চুপ করে থেকে অমলেশ বলল, 'তাড়াতাড়ি করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।'
'বৌদিকে নিয়ে আমি এক্ষুনি আসছি; এক মিনিটও লাগবে না।' অমলেশকে আর কিছু
াার সুযোগ না দিয়ে অজয় বাড়ির ভেতর চলে গেল।
একটু পর সেই মহিলাটিকে নিয়ে ফিরে এল অজয়। অমলেশ যা আন্দাজ করেছিল, ইনিই
য়েব বৌদি। মহিলা বেশ সাবলীলা, স্বচ্ছন্দগামিনী। নমস্কার করে বললেন, 'আপনাকে
। চিনতে পারি নি—'
অমলেশ হাসল, 'চেনবার কথা নয়। আগে কখনও তো আমাকে দ্যাখেন নি।'
'ঠাকুরপোও কিন্তু আপনার নাম বলতে চিনতে পারে নি।'
অজয় তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আহা, তখন বুঝি আমি অমলেশদার নাম জানতাম!'
'জানেন—' অজয়ের বৌদি দেওরের দিকে ভ্রূভঙ্গি করে বললেন, 'নাম জানে না, একদিন
দেখেছে। অথচ আপনার ওপর ঠাকুরপোর যা ভক্তি।'
'আমাকে তো চিনতেই পারে নি; ভক্তি কী করে বুঝলেন?'
'আজকের কথা বলছি না।'
'তবে?'
'কালকের। মীনা বলে একটি মেয়েকে চেনেন কী?'
'আমি তাদের বাড়িতেই আছি।'
দেওরকে দেখিয়ে মহিলা বললেন, 'কাল এই ওসমান রানীবাজারে গিয়ে দ্যাখে শ্রীমতী
ব পাশে এক জগৎ সিং জুটে গেছে। পারলে তরোয়াল বাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি।
যাকে জগৎ সিং ভেবেছিল, দেখা গেল সে স্বয়ং স্বর্গের দেবতা। বর দেবার মতো
ুরেন্টের কেবিনে মীনাকে সে তার হাতে তুলে দিয়েছে।'
অমলেশ অবাক, 'আপনাকে এসব বলল, কে?'
'ঐ শ্রীমান। কোথায় কী করে বেড়াচ্ছে, রাস্তায় গিয়ে কী দেখল, কী শুনল—রাত্তিরে খেতে
আমাকে না বললে ওর সেদিন ঘুম হবে!' অজয়ের বৌদি বলতে লাগলেন, 'কাল ফিরে
খালি আপনার কথা। এমন মানুষ জীবনে কখনও দ্যাখে নি, তুমি যদি তাঁকে দেখতে বৌদি
দি ইত্যাদি—'
অমলেশ চুপ করে থাকল।
মহিলা হঠাৎ বললেন. 'আপনারা একটু গল্প-টল্প করুন, আমি চা নিয়ে আসছি—'
অমলেশ অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না-না, চায়ের দরকার নেই। আমি অজয়কে বলেছি,
ন আমাকে উঠতে হবে।'
'প্রথম দিন এসেছেন, এক কাপ চা যদি আপনার হাতে তুলে দিতে না পারি, আমাদের খুব
প লাগবে—'
মহিলার মনের কথাটা পড়তে পারল অমলেশ। বলল, 'বেশ, এক কাপ চা-ই কিন্তু, তার
৷ কিচ্ছু না।'
হেসে মহিলা চলে গেলেন।
অমলেশ অজয়ের দিকে তাকাল, 'এবার তোমার সঙ্গে দরকারি কথা সেরে নিই।'

অজয় বলল, 'চা-টা খেয়ে নিন; তারপর বলবেন।'

'কথাটা আমি তোমার কাছেই বলতে চাই। তোমার বৌদি থাকলে—'

অমলেশের মনোভাব বুঝতে পারল অজয়। বলল, 'বৌদির সামনে আপনি যা খুশি ব পারেন। ওঁর কাছে আমার কিছুই গোপন নেই।'

অমলেশ বলল, 'কথাটা যদি মীনাকে নিয়েই হয়?'

অজয় হাসল, 'মীনাকে নিয়েই যে হবে তা বুঝেছি। বৌদির সামনে স্বচ্ছন্দে বলতে পা

অজয়ের বৌদি একটু পর ফিরে এলেন। চা-ই না, তার সঙ্গে বেশ কিছু খাবারও এনে সেগুলো দেখিয়ে অমলেশ বলল, 'শুধু চায়ের কথা ছিল, আবার এ সব কেন?'

মহিলা বললেন, 'শুধু চা খেতে নেই। নিন শুরু করুন—'

ইতিমধ্যেই পনের কুড়ি মিনিট কেটে গেছে। অনাবশ্যক কথা বাড়াতে গেলে আরো নষ্ট হবে। তাড়াতাড়ি এখানকার কাজ সেরে অমলেশকে বীজপুর থেকে পালাবার চেষ্টা ক হবে। এ প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে খাবারের প্লেটটা টেনে নিল অমলেশ। খেতে মহিলাকে বলল, 'অজয়ের সঙ্গে খুব দরকারি একটা কথা বলতে এসেছিলাম। ওর আপনার সামনেই সেটা বলি—'

মহিলা উৎসুক চোখে তাকিয়ে থাকলেন।

অমলেশ বলল, 'মীনার সম্বন্ধে আপনি কতখানি জানেন?'

'অনেকখানি—' চোখের দৃষ্টি অর্থপূর্ণ করে মহিলা হাসলেন। তারপর অজয়ের একটি আঙুল বাড়িয়ে বললেন, 'সে এই যুবকটির মনোহরণ করেছে।'

অজয় মাথা নিচু করল।

অমলেশও হেসে ফেলল, 'ও কথা বীজপুরের বোধহয় সবাই জানে। যেভাবে অজয়কু রাস্তায় মীনার পিছু নেয়, যে ভাবে ওদের বাড়ি উঁকিঝুঁকি দেয়—'

অজয় তাড়াতাড়ি মুখ তুলে বিব্রত ভাবে বলল, 'দাদা—'

'আচ্ছা থাক। তুমি যখন লজ্জা পাচ্ছ!' বলতে বলতে কণ্ঠস্বর থেকে সব তরলতা ফেলে অমলেশ গম্ভীর হল, মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু একথা জানতে চাই

'তবে?'

'অবিনাশ পালধিকে আপনারা চেনেন?'

মহিলা চমকে উঠলেন। চকিত হয়ে অজয় মুখ তুলল। তারপর দুজনে একই সঙ্গে গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'চিনি। কেন?'

'লোকটা কেমন?'

অজয় চেঁচিয়ে উঠল, 'পাজির পা-ঝাড়া।'

মহিলা বললেন, 'শুনেছি অনেক মেয়ের সর্বনাশ করেছে লোকটা।'

একটু চুপ করে থেকে অমলেশ বলল, 'মীনার ওপর অবিনাশ পালধির নজর পড়ে

কিছুক্ষণ শ্বাসরুদ্ধ নীরবতা। তারপর স্খলিত সুরে অজয় বলল, 'ওদের বাড়ি মাঝে ম অবিনাশ আসে শুনেছি।'

অমলেশ বলল, 'মীনার জন্যই আসে।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'মীনা তো এসব আমায় বলেনি।'

'হয়তো লজ্জায়।'

আবার খানিকক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতা। তারপর অমলেশই আস্তে করে ডাকল, 'অজয়—'

অজয় চোখ তুলে তাকাল, তার দৃষ্টিতে ভয় উত্তেজনা, শঙ্কা। তার বৌদিরও চোখমুখের কই ভাব।

অমলেশ বলল, 'মীনা তোমার কতখানি মনোহরণ করেছে, এবার তার পরীক্ষার সময় সেছে।'

অজয় বলল, 'আপনাব কথা বুঝতে পারলাম না অমলেশদা—'

'বেশ বুঝিয়ে দিচ্ছি।' অমলেশ বলতে লাগল, 'তুমি ওদের সংসারের অবস্থা নিশ্চয় জানো?'

'শুনেছি, ভাল না।'

'খুব খারাপ। এত খারাপ যে দু-এক মাসের ভেতর মীনার একটা কিছু ব্যবস্থা না হলে বিনাশের হাতে ও বলি হয়ে যাবে। আশা করি আমি যা বলতে চাই, বুঝতে পেরেছ।'

আবছা গলায় অজয় বলল, 'পেরেছি, কিন্তু—'

'বল—'

'আমি কি ব্যবস্থা করব?'

'কী করবে ভেবে পাচ্ছো না?'

'না।' দিশেহারার মতো বলল অজয়।

অমলেশ রহস্যাচ্ছলে বলল, 'মধ্যযুগে কোন যুবক এই রকম একটা খবর পেলে কিন্তু লোয়ার হাতে ছুটে যেত।'

মহিলা মৃদু হেসে বললেন, 'এটা তো মধ্যযুগ না।'

অমলেশ হাসল, 'তা বটে।' একটু থেমে অজয়কে বলল, 'সমস্ত অবস্থাটা তোমাকে বললাম। দিনের জন্য আমি এখানে এসেছি! আজকালের ভেতরই চলে যাব। মীনার সম্বন্ধে তোমার দি কোন কর্তব্য থাকে এখনই তা করবার সময়।'

অজয়কে বিভ্রান্ত দেখাল। জলে ডোবা মানুষের মতো সে বলল, 'আমি কী করব অমলেশদা?'

অমলেশ হাসল, 'তুমি কী করবে জানি না। তবে আমি হলে কী করতাম সেটা জানি।'

অজয় কী বলতে যাচ্ছিল, সেই মহিলাটি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'মীনাকে বাঁচবার একটি পথই খালা আছে।'

অমলেশ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। অজয় তার বৌদির দিকে ফিরে কাঁপা গলায় শুধলো, কী পথ?'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মহিলা অজয়ের চোখের দিকে তাকালেন, 'তোমার উচিত মীনাকে বিয়ে রে ফেলা।'

অবরুদ্ধ গলায় অজয় বলল, 'কিন্তু আমার যে চাকরি নেই বৌদি।'

মহিলা কিছু বললেন না, বিষণ্ণভাবে আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে লাগলেন।

দুহাতে মুখ ঢেকে অসহায়ের মতো ফিসফিসিয়ে অজয় বলতে লাগল, 'একটা চাকরি'। লতে বলতে উঠে দাঁড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলল, আজই—এখনই যদি একটা চাকরি পেতাম—'

মহিলাটিও করুণ গলায় বললেন, 'তোমার দাদাও তো ছোট চাকরি করেন। মাইনে-টাইনে দি একটু ভালো হতো তোমার বিয়ে দিয়ে দিতাম।'

অজয় এবং তার বৌদির বেদনা গভীর ভাবে অমলেশকে স্পর্শ করেছিল। কি নিদারুণ এই

সময়! সামান্য একটা চাকরি, মাসের শেষে কয়েকটা মাত্র টাকা, তার জন্য একটি মেয়ে বলিদান হতে চলেছে! একটি ছেলে তার যৌবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ আর আনন্দ থেকে বঞ্চি হয়ে থাকছে। সুধার পাত্রটি তার নাগালের বাইরেই থেকে যাচ্ছে।

বিষাদগ্রস্তের মতো কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে অমলেশ উঠে দাঁড়াল। অজয়ের কা গিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'দু এক মাসের মধ্যে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারবে না?'

'দু এক মাস—' অজয় বিচিত্র হাসল; 'বাঙলাদেশের খবর আপনি জানেন না অমলেশদা পাঁচ বছর ধরে চাকরির চেষ্টা করছি। চারশো সাড়ে চারশো দরখাস্ত পাঠিয়েছি। দুবার মো ইন্টারভিউ এসেছিল। এখানে মামা-টামা না থাকলে চাকরি পাওয়া অসম্ভব। আমার তো রকম কেউ নেই, চাকরি হবে কোত্থেকে?'

অমলেশ বলল, 'চাকরির বাজার যখন এই রকম, তখন অন্য কিছু করা উচিত।'

'টিউশানি অবশ্য করি, কিন্তু তাতে আর ক'টা টাকা পাওয়া যায়।'

'টিউশানি-ফিউশানি তো সাময়িক ব্যাপার, ঠেকা দেওয়া আর কি। কিন্তু পার্মানেন্ট ইনকামে ব্যবস্থা না হলে—'

'কি ভাবে সেটা করা যায় বলুন—'

'ধর ব্যবসা-ট্যাবসা—'

'তার জন্য তো অনেক মূলধনের দরকার। দাদার মাইনেটার ওপর আমাদের ভরসা; এ মাস মাইনে না এলে না খেয়ে থাকতে হবে। কোত্থেকে ব্যবসার ক্যাপিটাল আসবে বলু তবে—'

'কী?'

'খুব কম ক্যাপিটালে একটা ব্যবসার কথা জানি—'

'কী?'

'ছোটোখাটো জিনিস সাপ্লাইয়ের ব্যবসা। অনেকগুলো জায়গায় আমার জানাশোনা আছে করতে পারলে মাস গেলে আপাতত দুশো আড়াই শো টাকা আয় হবে। যদি কিছু ক্যাপিটা পেতাম—'

এই সময় মহিলা বলে উঠলেন, 'আমি তো তোমাকে দিতেই চেয়েছিলাম ঠাকুরপো।'

জোরে জোরে প্রবল বেগে মাথা নেড়ে অজয় বলল, 'ও আমি নিতে পারব না।'

হঠাৎ অমলেশের মুখ থেকে ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কী নিতে পারবে না?'

অজয় বলল, 'বৌদির সামান্য কিছু গয়নাগাটি আছে, বৌদি সেটা নিতে বলছে।'

অমলেশ চুপ করে থাকল।

মহিলা বললেন, 'গয়নাগুলো তো এমনিই পড়ে আছে; যদি মীনাটাকে বাঁচানো যায়—

'না-না—' অজয় বলতে লাগল, 'আমাকে লোভ দেখিও না বৌদি। ও আমি কিছুতে নিতে পারবো না। কোন কারণে ব্যবসায় যদি লোকসান যায়, তোমার দিকে কোনদিন মুখ তু তাকাতে পারব না।'

'একটা মেয়ের প্রাণের চাইতে তোমার মুখ তোলাটা বড় হল ঠাকুরপো?'

অমলেশের মনে হল, এখানে এলে বেঁচে যাবে মীনা। এই তার আসল জায়গা।

অজয় বলল, 'কিন্তু বৌদি, ঐ গয়নাগুলো বেচে ছ-সাতশো টাকাব মতো টাকা পাও যাবে। তাতে যে কিছুই হবে না।'

মহিলার মুখে বেদনার ছায়া পড়ল; কিছু বললেন না তিনি।

সমস্ত পরিবেশটা চারদিক থেকে অমলেশকে যেন ঘিরে ধরছিল; তার ওপর তীব্রভা

াতিক্রিয়া করে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী এক মহানুভবতা অমলেশের ওপর ভর করল যেন। আচ্ছন্নের তো সে বলল, 'কত টাকা হলে সাপ্লাইয়ের ব্যবসাটা শুরু করতে পার?'

অজয় বলল, 'অন্তত হাজার দেড়েক।'

'ধর, আমি যদি ওটা তোমাকে দিই।'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে অজয় বলল, 'আপনি—আপনি দেবেন?'

'হ্যাঁ।'

সঙ্কুচিতভাবে অজয় বলল, 'কিন্তু—'

'তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। তুমি তো আমাকে দাদা বলেছ। ধরো ঐ টাকাটা তামাদের বিয়েতে যৌতুক দিলাম।'

মুখ নিচু করে অজয় আস্তে আস্তে বলল, 'ও ভাবে যৌতুক আমি নিতে পারব না।'

অমলেশ বলল, 'তা হলে ধরো ঋণই নিলে, Business loan. যখন তোমার সুবিধে হবে ফেরত দিও।'

অজয় চুপ করে থাকল। মনে হল এতে সে রাজী হয়েছে।

এই সময় মহিলাটি বলে উঠলেন, 'না, এত টাকা একলা আপনাকে দিতে হবে না। আপনি ক হাজার টাকা দেবেন। বাকিটার ব্যবস্থা হবে আমার গয়না বিক্রি করে। ঠাকুরপো না বললে নছি না।'

অজয় এবারও চুপ।

অমলেশ বলল, 'তুমি তা হলে রেডি হতে থাকো। বোম্বাইতে গিয়েই আমি টাকাটা পাঠিয়ে বে। খুব দেরি হলে দিন পনেরর ভেতর পেয়ে যাবে।'

অজয় হঠাৎ বলল, 'কিন্তু অমলেশদা—'

'কী?'

'আপনি তো আমার জন্য এত করতে চাইছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে এর কোন দরকার াই।'

'কেন?'

'মীনার মা আমাকে পছন্দ করেন না।'

'সে সম্বন্ধে তোমাকে ভাবতে হবে না; ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।' বলতে লতে অমলেশ হাত উল্টে ঘড়িটা দেখে নিল, ছ'টা বাজে। প্রায় লাফিয়ে উঠে পড়ল অমলেশ, াজ এখন চলি ভাই'। মহিলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মন বলছে আপনার কাছে াসতে পারলে মীনা শুধু বেঁচে যাবে না সুখীও হবে। আচ্ছা চললাম।' বলে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করল।

মহিলা বললেন, 'নমস্কার। আবার আসবেন।'

অমলেশ হাসল। মনে মনে ভাবল, আর এসেছে। বীজপুর থেকে চলে যেতে পারলে সে খন বাঁচে। কলকাতায় গিয়ে নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদের সঙ্গে আরও একটা কথা তাকে নীলাদের াখতে হবে। অজয়ের সঙ্গে যেন মীনাকে বিয়ে দেওয়া হয়।

অজয়রা গেট পর্যন্ত অমলেশের সঙ্গে সঙ্গে এল। গেটের কাছে এসে হঠাৎ অমলেশ বলল, আচ্ছা অজয়, বীজপুর থেকে ট্রেন ছাড়া আর কিভাবে কলকাতায় যাওয়া যায়?'

অজয় একটু অবাক হল, 'বাসেও যাওয়া যায়; কেন বলুন তো?'

'এমনি। হঠাৎ মনে হল তাই জিজ্ঞেস করলাম।'

অজয় অমলেশকে আরও এগিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাকে নিরস্ত করে রানীবাজারে এ
একটা রিক্সা নিল অমলেশ। বলল, 'বাসস্ট্যান্ডে চল—'

'কোন্ বাসস্ট্যান্ড বাবু?'

'যেখানে থেকে কলকাতার বাস ছাড়ে। একটু জোরে যাবে ভাই—'

বাস টারমিনাসটা স্টেশনের কাছেই। সেখানে গিয়ে অমলেশ জানতে পারল কলকাতা
লাস্ট বাসটা মিনিট দশেক আগে ছেড়ে গেছে। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে অমলেশ দেখল
ছ'টা আটাশ। কলকাতার লাস্ট ট্রেন ছটা কুড়িতে। কাজে কাজেই রেল স্টেশনে যাওয়াও বৃথা
কেন যে মীনার দায়িত্বটা মাথা বাড়িয়ে নিতে গেল?

আজ আর কলকাতায় যাওয়া হল না। জগতের সবটুকু দুর্ভাবনা নিয়ে সেই রিক্সাতে
অমলেশকে নীলাদের বাড়ি আবার ফিরে আসতে হল।

১৮

বাড়ি ফিরে অমলেশ দ্যাখে বারান্দায় একা মীনা বসে আছে। ঝুনু কিংবা নবেন্দুর মা
দেখতে পাওয়া গেল না।

বারান্দায় এসে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে চোখের ইশারায় মীনাকে ডাকল অমলেশ
সে উঠে অমলেশের পিছু পিছু হাঁটতে লাগল।

ঘরে ঢুকে জামা খুলতে খুলতে অমলেশ বলল, 'ঝুনু আর মাসিমাকে তো দেখছি না।'

'মা বাবার ঘরে আব ঝুনু মাঝের ঘরে বই নিয়ে বসেছে!

'পড়ছে?'

'লেখাপড়ায় ওর খুব মাথা। স্কুলে তো যেতে পারে না। মাঝে মাঝে বইটই নিয়ে বসে

অমলেশ চুপ করে থাকল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'তোমার দিদি কলকাতা থেকে ফেরে নি

'না।'

জামা ছাড়া হয়ে গিয়েছিল। অমলেশ বিছানায় এসে বসল। মীনা বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে
অমলেশদা?'

রহস্যময় হেসে অমলেশ বলল, 'বল তো কোথায় গিয়েছিলাম?'

'আমি কী করে বলব? আমি কি হাত গুনতে জানি?'

'জানো না?'

'না। বলুন না—'

চোখ কুঁচকে আগের মতো হাসতে হাসতে অমলেশ বলল, 'অজয়দের বাড়ি গেছলাম—

'যাঃ! ভাল হবে না বলছি।' বলতে বলতে চোখ নামাল মীনা।

গভীর স্বরে অমলেশ বলল, 'সত্যিই গেছলাম।'

একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিল মীনা, কিছু বলল না। অমলেশ বুঝল, তার কথ
শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে মেয়েটা।

হঠাৎ দুষ্টুমি ভর করে বসল অমলেশের ওপর। ফিসফিসিয়ে সে শুরু করল। 'অজয়কে
বললাম, যত তাড়াতাড়ি পারে তোমায় যেন তার কাছে নিয়ে যায়। নইলে সীতাহরণ হয়ে
যাবে। কিন্তু—'

মীনা নিচের দিকে তাকিয়ে থাকল। অমলেশ লক্ষ্য করল, মীনার হাত-পা-এবং শরীরে

সমস্ত স্নায়ু আর পেশীতে বিচিত্র সংকোচ নেমে এসেছে।

অমলেশ বলল, 'এত করে বোঝালাম কিন্তু অজয় বিয়ে করতে রাজী না।'

চকিতে মুখ তুলল মীনা। তার চোখেমুখে বিদ্যুৎ-চমকের মতো ভয় আশাভঙ্গ উত্তেজনা এবং যন্ত্রণার ছায়া পড়ল। নিমেষে মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে রক্ত নেমে যেতে লাগল। আর শুষ্ক ঠোঁট দুটো শীতের পাতার মতো থরথর করতে লাগল।

অমলেশের বড় মায়া হল। মীনার পিঠে একখানা হাত রেখে সস্নেহে কোমল গলায় বলল, 'বোকা মেয়ে! অজয়কে এতদিন ধরে দেখেছ; সে কী বলতে পারে জানো না? তার ওপর এতটুকু বিশ্বাস নেই!'

আগের মতোই ঠোঁট কাঁপতে লাগল মীনার; চোখের তারায় সমুদ্র দুলতে লাগল। অমলেশ তাড়াতাড়ি বলল, 'ভয় নেই; বিয়ের কথা বলতেই ছোকরা এক পায়ে খাড়া; টোপর কিনতে ছোটে আর কি। কত কষ্টে যে তাকে আটকেছি। সে যাক গে, তুমি গায়ে হলুদ মাখবার জন্য তৈরি হও।'

সজল চোখে সূর্যোদয় ঘটল যেন; কালো তারায় ঝিকমিকিয়ে ঝলমলিয়ে আলোর ছটা নাচতে লাগল। অনেকক্ষণ অমলেশের দিকে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে মীনা বলল, 'কিন্তু ওর যে চাকরি নেই অমলেশদা—'

'তার একটা ব্যবস্থা হয়েছে।'

উৎসুক সুরে মীনা জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'সব কথার জবাব আমার মুখে নাই বা শুনলে। অজয়ের কাছে জেনে নিও।'

রাত্রি দশটা নাগাদ অমলেশ খেতে বসল। ঝুনু, মীনা আর সে। নীলা এখনও ফেরে নি; নিতুও না। অমলেশ দুদিন এসেছে, মীনার আর-এক ভাই হীরুকে এখন পর্যন্ত চোখে দেখে নি। সে কখন ফিরবে এ বাড়ির কেউ জানে না। মাঝে মাঝেই সে নাকি ডুব দেয়, ফেরে পাঁচ সাত দিন, কখনও কখনও আবার মাসখানেক বাইরে কাটিয়ে।

এখনই খেতে বসতে অমলেশের আপত্তি ছিল। সে বলেছিল, 'নীলা দেবী ফিরলে খাব'খন।'

নবেন্দুর মা বলেছেন, 'ওর ফিরতে এগারটা সাড়ে এগারটা। অত রাত পর্যন্ত বসে থাকতে হবে না। ভাত তরকারি সব জুড়িয়ে জল হয়ে যাবে। গরম গরম খেয়ে নাও বাবা।'

অমলেশ আর কিছু বলে নি।

খেতে খেতে এক সময় অমলেশ বলল, 'মাসিমা, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

আজ যখন কলকাতা যাওয়া হল না তখন মীনার বিয়ের প্রসঙ্গ নিয়ে একটু আলোচনা করে নিতে চায় অমলেশ।

নবেন্দুর মা জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন, 'কী কথা অমলেশ?'

ভাত নাড়াচাড়া করতে করতে খানিক ইতস্তত করে অমলেশ বলল, 'মীনা কদ্দূর পড়াশোনা করেছে?'

'ক্লাস নাইন পর্যন্ত। কেন?'

'ওকে আর পড়াবার ইচ্ছে আছে?'

'ইচ্ছে তো ছিল বাবা কিন্তু ওর মাথা নেই। তা ছাড়া আমাদের যা অবস্থা—'একটু থেমে বললেন, 'তার চাইতে ভাল একটি ছেলে যদি পেতাম; দাবী-দাওয়া নেই এমন ছেলে। তা হলে ওর বিয়ে দিয়ে দিতাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে কি তা আছে?'

অমলেশ লক্ষ্য করল, মীনার মাথা থালার ওপর নুয়ে পড়েছে। আস্তে আস্তে সে বলল,

'বীজপুরের একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। ছেলেটিকে বেশ ভাল লাগল। যদি বলেন তো মীনার জন্য চেষ্টা করতে পারি।' তীক্ষ্ণ চোখে অমলেশের দিকে তাকালেন নবেন্দুর মা। সন্দিগ্ধ সুরে বললেন, 'কবে আলাপ হয়েছে?'

'কাল।'

'কাল তো ঝুনু-মীনাদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলে। আলাপটি কি তখনই হয়েছে?' বলে মীনার দিকে তাকালেন নবেন্দুর মা।

মীনার অবস্থা অবর্ণনীয়। অমলেশ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বিব্রত সুরে বলল, 'হ্যাঁ, মানে—'

'ছেলেটির নাম কি অজয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আলাপ কি ঐ বাঁদর মেয়েটা করিয়ে দিয়েছে?'

অমলেশ চমকে উঠল, 'না—না—'

ভদ্রমহিলা কি বুঝলেন তিনিই জানেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আর কিছুই জিজ্ঞেস করলেন না। শুধু বললেন, 'অজয় ভাল ছেলে, তোমাকে কে বলল? চাকরি-বাকরি করে না, মেয়েরা রাস্তায় বেরুলে পিছু নেয়, অতি বাজে ছেলে।'

অমলেশ তাঁকে বুঝিয়ে বলল, অজয় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা ঠিক না। সব মেয়ে নয়, একমাত্র মীনারই পিছু নেয় সে। চাকরি নেই, কেন না হাজার চেষ্টা করেও সে পাচ্ছে না। ওদের বাড়িতে যে আজ গিয়েছিল, সে কথাও বলল। অজয়দের সংসারে মীনা যেতে পারলে সুখীই হবে।

সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন নবেন্দুর মা। তারপর. বললেন, 'ওর সঙ্গেই মীনাব বিয়ে দিতে বলছ?'

অমলেশ হাসল, 'সেটা আপনারা ভেবে দেখুন। তবে—'

'কী?'

'আমার মতামত যদি নেনে তা হলে বলতে পারি এ বিয়েতে ভালই হবে।'

'কিন্তু—' দ্বিধান্বিত সুরে নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'চাকরি-বাকরি নেই, ঐ ছেলে বিয়ে করে খাওয়াবে কী?'

অমলেশ বলল, 'এক্ষুনি বিয়ে দিতে বলছি না, আগে অজয়ের রোজগারের ব্যবস্থা হোক. তারপর। আমি—'

'তুমি কী?'

'আমাদের কলকাতার অফিসে ওর জন্য একটা চাকরির ব্যবস্থা করব। আপাতত অজয় একটা ব্যবসা-ট্যাবসা শুরু করছে।'

কিছুক্ষণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন নবেন্দুর মা। ভেতরে ভেতরে অমলেশ যে এতদূর এগিয়েছে তাঁর কাছে তা যেন অকল্পনীয়। বললেন, 'তোমার মেসোমশায়ের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটু কথা বলে নিই। পঙ্গু হোক, অথর্ব হোক, উনিই তো এ সংসারের কর্তা। তাঁর মত ছাড়া কিছু হবে না।'

অমলেশ ব্যস্তভাবে বলল, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই—' বলতে বলতে হঠাৎ দেখতে পেল খাওয়া বন্ধ করে কৃতজ্ঞ চোখে মীনা তার দিকে তাকিয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই চকিতে থালার ওপর ঝুঁকে পড়ল মেয়েটা।

খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় ওধারের ঘর থেকে মহীতোষের ভাঙা ভাঙা

জড়িত কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'হ্যাঁ গো নীলা ফিরেছে কলকাতা থেকে?'

দাঁতে দাঁত চেপে একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন নবেন্দুর মা। পরে বললেন, 'ফিরেছে।'

'হীরু নিতু এসেছে?'

'এসেছে।'

অমলেশ লক্ষ্য করেছে, কাল এবং পরশুও এই সময় মহীতোষ ছেলে-মেয়েদের খোঁজ নিয়েছিলেন। দু দিনই নবেন্দুর মা মিথ্যে বলেছেন।

স্বামীর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে আস্তে করে অমলেশের উদ্দেশে নবেন্দুর মা বললেন 'এখন যদি বলি ফেরে নি চেঁচামেচি করে বাড়ি মাথায় তুলে ফেলবে।'

১৯

খাওয়া-দাওয়া সেরে দক্ষিণের ঘরে এসে শুয়ে পড়ল অমলেশ। শুয়েই তো আর ঘুম আসে না। একটা সিগারেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে টানতে লাগল।

অমলেশকে একা পেয়ে নানা দিক থেকে অসংখ্য ভাবনা ভিড় করে এল। একের পর এক সিগারেট জ্বালিয়ে রাতের কতটা সময় সে কাটিয়ে দিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ একসময় তার মনে হল, সামনের বারান্দায় অস্থির পায়ে কেউ হাঁটছে। অন্ধকারে হাতঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালটা জ্বলছিল, অমলেশ দেখল সাড়ে বারোটা বাজে।

নিতু আজ এ ঘরে আস নি। বাড়িই ফেরে নি তো শোবে কি! এ ঘরে অমলেশ আজ একা। মাথার দিকের দরজাটা হাট করে খোলা রয়েছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দরজাটা বন্ধ করতে যাবে। বাইরের বারান্দায় নবেন্দুর মাকে দেখতে পেল অমলেশ।

সারা বাড়িটা গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে। মীনা, ঝুনু অথবা মহীতোষ—কেউ জেগে আছে বলে মনে হয় না। চারদিক নিঝুম নিশুতিপুর। শুধু অশ্রান্ত অধীর বিলাপের মতো একটানা ঝিঁঝিদের ডাক শোনা যাচ্ছে। এ ছাড়া সমস্ত বীজপুরে আব কোন শব্দ নেই বুঝি।

অমলেশ লক্ষ্য করল, নবেন্দুর মা অস্থিরভাবে পায়চারি করতে কবতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর চোখ দুটো রাস্তার দিকে ফেরানো। এর রাতে বারান্দার এক মাথা থেকে আবেক মাথায় ওভাবে হাঁটছিলেনই বা কেন মহিলা? এখন রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখছেনই বা কী?

অপাব কৌতূহলে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল অমলেশ। কাছে এসে আস্তে করে ডাকল, 'মাসিমা—'

নবেন্দুর মা চমকে অমলেশের দিকে ফিরলেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'ও, তুমি! এখনও ঘুমোও নি?'

'না। ঠিক ঘুম আসছিল না। কিন্তু আপনি?'

'আমি কী?'

'এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন! শুতে যাননি?'

একটু চুপ করে থেকে আচমকা ভেঙে পড়লেন নবেন্দুর মা, 'নীলা, এখনও ফেরে নি অমলেশ।'

অমলেশ চকিত হল, 'সে কী!'

'রোজই এগারটার ভেতর ফিরে আসে। এখন ক'টা বাজে।'

'সাড়ে বারোটা।'

'এত রাত তো তার কোনদিন হয় না।'

একটুক্ষণ নীরব থেকে চিন্তিত অন্যমনস্কের মতো অমলেশ বলতে লাগল, 'লাস্ট ট্রেন এ গেছে। এর পর তো ফেরার কোন উপায় নেই।'

শ্বাসরুদ্ধের মতো নবেন্দুর মা বললেন, 'না।'

'তা হলে বোধহয় উনি আজ ফিরবেন না।'

অমলেশের একখানা হাত ধরে শিথিল সুরে নবেন্দুর মা বললেন, 'কী হবে বাবা?'

ভরসা দেবার মতো একটা কথাও খুঁজে পেল না অমলেশ। কিছুক্ষণ পর বলল, 'যতট ভাবছেন হয়তো ততটা ভাবনার কারণ নেই। কোন ব্যাপারে আটকে-টাটকে গেছেন নীলাদেবী লাস্ট ট্রেনটা ধবতে পারেন নি।'

অধীর সুরে নবেন্দুর মা বললেন, 'মন বড় কু গাইছে; বার বার বলছে নিশ্চয়ই কোন বিপ হয়েছে।'

নবেন্দুর মায়ের দুর্ভাবনাটা খুবই সঙ্গত। সান্ত্বনা দেবার জন্যই অমলেশ বলল, 'উনি যথে বুদ্ধিমতী; নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে জানেন।'

উদ্‌ভ্রান্তের মতো নবেন্দুর মা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'তুমি জানো না অমলেশ—'

তাঁর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যাতে চমকে উঠল অমলেশ। বিহ্বলের মতো বলল, 'কী জানি না?'

'ও যে কী চাকরি করে, কোথায় ওর অফিস, ক'টা থেকে ক'টা পর্যন্ত ডিউটি- আমাকে বলে না। সব সময় মেয়ে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।'

অমলেশ চুপ। সেদিন রাত্রিবেলা এ সব কথা সে শুনেছে!

নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'সব সময় ঐ মেয়ের চিন্তায় আমার বুকের ভেতরটা ক্ষ যাচ্ছে।'

এবারও অমলেশ নিরুত্তর।

নবেন্দুর মা বললেন, 'আমার একটা উপকার করবে বাবা?'

'কী?' এতক্ষণে আমার গলার স্বর ফুটল।

'নীলা কী কাজ-টাজ করে, একটু খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে বলবে?'

প্রথম দিন ট্রেনে নীলার পেছনে পুলিশ ঘুরতে দেখেছিল অমলেশ। সে কী করে, জানবা জন্য তাব অবচেতনে একটু কৌতূহল থাকতে পারে। আত্মবিস্মৃতের মতো বলল, 'বলব।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর নবেন্দু মা অসহায় সুরে বললেন, 'রাত একটা বাজতে চলল, 'এখনও তো এ না মেয়েটা। কী যে করি!'

খানিক ভেবে অমলেশ বলল, 'আচ্ছা, বীজপুরে এমন কেউ আছে যার কাছে গে নীলাদেবীর খবর পাওয়া যেতে পারে?'

'নূপুর বলে একটা মেয়ে আছে; ওব সঙ্গে কাজ করে। সে হয়তো বলতে পারে। নূপুরবে কি তুমি চেন?'

'চিনি। আজই দুপুরবেলা এসেছিলেন। নীলাদেবী আলাপ করিয়ে দিয়েছেন।'

'ওদের বাড়ি কি তুমি চেন?'

'চিনি। বলতে গিয়েও থমকে গেল অমলেশ। কি ভাবে চেনে, কে চিনিয়েছে, ইত্যা

ত্যাদি হাজারটা প্রশ্ন তা হলে এসে পড়বে। সে সব এড়াতে বলল, 'ঠিকানাটা বললে যেতে ারব।'

একটু ভেবে নবেন্দুর মা বললেন, 'এত রাতে আজ আর যেতে হবে না! আবার কি রকম ্ষ্টি শুরু হয়ে গেল। কাল ভোরবেলা উঠেই যেও।'

নিজের ঘরে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল অমলেশ। অসীম অন্তহীন এক দুর্ভাবনা মাকড়সার তো তার চারধারে দ্রুত জাল বুনে চলল। এত বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কোথায় রাত কাটাচ্ছে নীলা? াস্ট ট্রেনে কেন আজ ফিরল না সে? আকাশ-পাতাল ভেবেও কিছুই বুঝে উঠতে পারল না মলেশ। চকিতে ট্রেনের সেই দৃশ্যটি তার চোখে ভেসে উঠল। দুর্যোগের সেই াতটা—পুলিশ—চামড়ার ছোট্ট স্যুটকেশ। তবে কি, তবে কি—

সব মিলিয়ে একটা নিদারুণ ভয় যখন অমলেশকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছে সেই সময় াইরে থেকে চাপা গলায় নবেন্দুর মা ডাকলেন, 'অমল—'

অমলেশ বেরিয়ে এল, 'কী বলছেন?'

'ঘুমুতে পারছি না বাবা।'

আকণ্ঠ উদ্বেগ নিয়ে অমলেশ তাকিয়ে থাকল।

নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'মন একেবারেই মানছে না। দু-দিনের জন্য তুমি এসেছ। লতেও সাহস হচ্ছে না। এদিকে—'

মহিলার মনোভাব খানিক অনুমান করে অমলেশ বলল, 'আমি বরং নূপুর দেবীদের বাড়ি য়ে খোঁজ নিয়ে আসি।'

'তাই যাও বাবা, নইলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। কিছু মনে করো না, তোমার ওপর ড্ড জুলুম করছি।'

'ও কিছু না; আপনি আমায় একটা ছাতা দিন।'

ওধারের একটা ঘর থেকে ছুটে গিয়ে ছাতা নিয়ে এলেন নবেন্দুর মা। অমলেশের হাতে তে দিতে নূপুরদের ঠিকানা এবং সেখানে কিভাবে যেতে হয় বলে দিলেন। নূপুরদের ঠিকানার রকার ছিল না। তবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল অমলেশ। তারপর ছাতা খুলে উঠোনে নেমে ড়ল। একটু পর উঠোন থেকে সরু পথ ধরে অন্ধকার বড় রাস্তায়।

নূপুরদের বাড়ির সামনে গিয়ে অমলেশ যখন দাঁড়াল, বৃষ্টি থেমে গেছে। চারধারের ঝোপঝাপ মার কচুবনের ভেতর ব্যাঙ ডাকছে; ঝিঁঝিদের একটানা ক্লান্ত বিলাপ উঠে আসছে মাটির মতল থেকে। রাস্তায় আজ আর আলো জ্বলে নি, একটা লোকও চোখে পড়ছে না। ব্যাঙের াক আর ঝিল্লিস্বর বীজপুরের অন্ধকার নির্জনতাকে হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে যেন।

সেদিনই দেখে গিয়েছিল, নূপুরদের বাড়িটা একতলা। সামনের দিকে ঝুপসি বাগান। সেদিন তবু আলো-টালো ছিল; আজ কিছুই নেই। অন্ধকার এত ঘন যে দশ হাত দূরেও দৃষ্টি ায় না।

বাইরে রাস্তা থেকে অমলেশ ডাকল, 'নূপুর দেবী, নূপুর দেবী—'

কেউ সাড়া দিল না।

অগত্যা বাগানের পিছল মাটির ওপর দিয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে একতলা ভাঙা পুরনো বাড়িটায় বারান্দায় এসে থামল অমলেশ।

ভেতরে আলো জ্বলছে না; কেউ জেগে আছে কিনা তাও টের পাওয়া যাচ্ছে না। ভয়ে

ভয়ে অমলেশ আবার নূপুরকে ডাকল।

একটু পরে দরজা খুলে গেল। হ্যারিকেন হাতে করে একটি প্রৌঢ় বেরিয়ে এলেন। পাকানো রুগ্ন শরীর সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে আছে। বুকের হাড়গুলো আলাদা আ গুনে নেওয়া যায়। মুখময় কাঁচায়-পাকায় মেশানো দাড়ি-গোঁফ, মাথাটা ঝুপসি মতো। বেয়ে, কনের ওপর দিয়ে চুল ঝুলছে। দেখেই বোঝা যায়, বহুকাল ক্ষুর কাঁচির সঙ্গে স নেই; পরনে ময়লা খাটো ধুতি ছাড়া কিচ্ছু নেই। বুকের ওপর দিয়ে আড়াআড়ি পৈতে; জলে চিটচিটে হয়ে আছে।

গাল বসে গেছে। শরীরময় মোটা মোটা জট পাকানো শির। দৃষ্টি ভাবলেশহীন, ধূসর। দেখলে মনে হয়, মরা মানুষের চোখ।

কণ্ঠস্বরও অদ্ভুত, অলৌকিক বলাই বোধহয় উচিত। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নয়, মনে অনেকদূর থেকে তাঁর গলা ভেসে আসছে। প্রৌঢ় বললেন, 'কাকে চান?'

অমলেশ বলল, 'নূপুর দেবী আছেন?' বলেই খেয়াল হল, এ কী করেছে? এত রাতে অচেনা একটি তরুণীর কাছে ছুটে এসেছে সে। প্রৌঢ় যদি নূপুরের সঙ্গে দেখা করতে না দ যদি জিজ্ঞেস করেন নূপুরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী? কোথায় কিভাবে তার পরিচয়? এত নূপুরের সঙ্গে দেখা করতে আসার সাহস কোত্থেকে হল? প্রৌঢ় যদি অপমান করে বাড়ির করে দ্যান? অমলেশ প্রায় ঘামতে শুরু করল।

প্রৌঢ় কিন্তু কিছুই করলেন না। এমন কি একটি প্রশ্নও শুধোলেন না। অসীম ক্লান্ত গ শুধু বললেন, 'আছে। আসুন আমার সঙ্গে।'

ভেতরে ঢুকতেই দেখা গেল, সেটা লম্বা হলঘরের মতো। মেঝে জুড়ে বিছানা পড়ে সারি সারি বালিশ পাতা। ছয় থেকে ষোল বছরের ন'-দশটি ছেলে মেয়ে সেখানে ঘুমো সবারই মুখচোখের আদল এক। একই রকম ছাঁচে গড়া কুমোরবাড়ির ছোট বড় ক'টি প যেন।

বিছানার ধার দিয়ে অমলেশকে একটা বন্ধ দরজার কাছে নিয়ে এলেন প্রৌঢ়। আস্তে ড ডাকলেন, 'নূপুর—নূপুর—'

ভেতর থেকে সাড়া এল, 'কী বলছ বাবা?'

ওই প্রৌঢ় লোকটি তা হলে নূপুরের বাবা। যাই হোক তিনি বললেন, 'এক ভদ্র এসেছেন। তোর সঙ্গে কী কথা আছে।'

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নূপুর চৌকাঠের ওপর দাঁড়াল। এত রাতে অমলেশকে নিজে বাড়িতে দেখবে, তা বোধহয় ভাবতেও পারে নি। অবাক বিস্ময়ে বলল, 'আপনি, অমলেশব

অমলেশ বলল, 'হাঁ, আমিই।'

নূপুরের গায়ে সস্তা রঙিন শাড়ি; আটপৌরে ধরনে পরা। চুলগুলো পরিপাটি করে আঁচড়া খুব সম্ভব ঘুমোতে যাচ্ছিল সে।

নূপুর বলল, 'এত রাত্তিরে!'

'বিশেষ দরকারে আপনার কাছে আসতে হল।'

এক পলক অমলেশের দিকে তাকিয়ে থেকে নূপুর বলল, 'আসুন—'

যে ঘর থেকে নূপুর বেরিয়েছিল, অমলেশকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকল। এক একটা হ্যারিকেন নিভু-নিভু হয়েছিল; চাবি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলোটাকে উস্কে দিল। ছোট একধারে তক্তপোষ পাতা; তার ওপর বিছানা। আরেক ধারে বাক্স-টাক্স, আলনা, জলের কুঁ

...লে দেশনেতা এবং মহাপুরুষদের ছবি। একটা টেবিলকে ঘিরে দুটো ভাঙা চেয়ার চোখে ...ল।

চেয়ার দেখিয়ে নূপুর বলল, 'বসুন'।

বসতে বসতে অমলেশ বলল, 'উনি আপনার বাবা?' জেনেশুনেই প্রশ্নটা করল সে।

নূপুর মাথা নাড়ল।

অমলেশ বলল, 'আপনাদের বাড়ি এসে আমার খুব ভয় করছিল।'

জিজ্ঞাসু চোখে নূপুর তাকাল, 'কেন?'

'এত রাত্তিরে আপনার কাছে এসেছি। উনি কী জিজ্ঞেস করবেন, কী ভাববেন, বুঝতে ...ছিলাম না।'

নূপুর অদ্ভুত গলায় বলল, 'যেদিন থেকে চাকরিতে ঢুকেছি বাবা আমার সম্বন্ধে ভাবনা ...ে দিয়েছে। যখন খুশি আসি, যখন খুশি যাই; বাবা কিছুই জিজ্ঞেস করে না। এমন কি এই আপনি এসেছেন, সারারাতও যদি আমার সঙ্গে গল্প করে যান, বাবা কিছুই জানতে চাইবে

নূপুরের বলার ধরনটাই এমন যাতে শিউরে উঠল অমলেশ।

নূপুর আবার বলল, 'যাক গে, কী দরকারে যেন এসেছিলেন—'

অমলেশ সচেতন হল। বলল, 'নীলাদেবীর জন্য এত রাত্তিরে আসতে হল।'

নূপুর চকিত হল। পলকহীন তাকিয়ে আস্তে আস্তে শ্বাসটানার মতো করে শুধলো 'কী ...ব বলুন তো—'

'নীলাদেবী এখনও ফেরেন নি।'

'সে কি!'

'হ্যাঁ।'

'লাস্ট ট্রেন তো অনেকক্ষণ এসে গেছে।'

'হ্যাঁ।' অমলেশ বলতে লাগল, লাস্ট ট্রেনের পরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে আসছি। ...দেবীর মা অস্থির হয়ে উঠেছেন।'

চিন্তিত মুখে নূপুর বলল, অস্থির হবারই কথাই।'

অমলেশ বলল, 'শুনেছি নীলাদেবী আর আপনি একই অফিসে চাকরি করেন—'

'হ্যাঁ।'

'আপনি তাঁর খবর দিতে পারেন বলেই ছুটে এসেছি। ওঁর মা-ই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'কিন্তু—'

'বলুন—'

একটু ভেবে নূপুর বলল, 'না ফেরার কারণ কিছুই বুঝতে পারছি না। রোজ লাস্ট ট্রেনে ...ড়ি ফেরে; এক-আধদিন অবশ্য এদিক-ওদিক হয়ে যায়। আমি আজ ঠিক সময়েই এসেছি। ...ই সময় ওর সঙ্গে দেখাও হয়েছিল। নীলা ফিরবে না, এমন কিছু তো আমায় বলে নি।'

...ই থেমে নূপুর আবার বলল, 'না ফেরার কারণ কী থাকতে পারে; আমার মাথায় কিছু ...ে না।'

'আচ্ছা—'

'কী?'

'এখান থেকে আপনাদের অফিসে ফোন-টোন করে খোঁজ-খবর নেওয়া যেতে পারে?'

'না। তা ছাড়া—'

'কী?'

'এত রাত্তিরে ফোন করলেও ধরছে কে?'

'তা বটে। আচ্ছা, আপনাদের কী অফিস বলুন তো। ঠিকানা লিখে দিন। আমি ব একবার চেষ্টা করে দেখব।

'না-না, অফিসে গিয়ে কী করবেন!' নূপুর চমকে উঠল, 'নীলা কি আর সেখানে আ আজ আমার সঙ্গেই বেরিয়ে পড়েছিল সে। তারপর কোথায় গেছে, কে জানে। বাইরে কে করছে, কোথায় যাচ্ছে অফিসের লোকেরা কেমন করে বলবে? তবু যখন নীলা আসে নি, ে হলেই আমি ফার্স্ট ট্রেন ধরে অফিসে গিয়ে খোঁজ নেব। আপনি বাড়ি ফিরে নীলার মাকে এ সামলান।'

অফিসের নামটা নীলাও তার মাকে বলে না; নূপুরও অমলেশকে এড়িয়ে গেল।

বাকি রাতটা নীলার মা বা অমলেশ কেউ ঘুমোতে পারল না।

এক সময় সকাল হল, রোদ উঠল। বেলা যত বাড়তে লাগল ততই উদ্‌ভ্রান্তের ম দেখাতে লাগল নবেন্দুর মাকে। নীলা যে ফেরেনি, সে কথা তিনি এবং অমলেশ ছাড়া ব কেউ জানে না। তাঁদের দুজনকে ঘিরে চাপা অস্বস্তি আর ভয় ক্রমশ ঘন হয়ে আসছে।

সূর্য যখন গাছপালার মাথায় উঠে এল সেইসময় পাগলের মতো নবেন্দুর মা অমলেশ আড়ালে নিয়ে বললেন, 'কী করা যায় বল তো বাবা—'

সীমাহীন দুশ্চিন্তা অমলেশকেও পেয়ে বসেছিল। সত্যিই তো, মেয়েটা গেল কোথ কোথায় যেতে পারে সে? নীলাকে ঘিরে বিপজ্জনক এক রহস্যময়তা যে ঘন হয়ে আছে, প্র দেখার পর থেকেই টের পেয়েছিল অমলেশ। তার কী কোন ক্ষতি হল? যে মেয়ে নিত্য ল ট্রেনের যাত্রিণী তার যে কোন দিন বিপদ ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক। যাই হোক অমলেশ ব 'আরেকটু দেখে না হয় নূপুরদের বাড়ি আরেকবার যাব। নূপুরের তো ভোরবেলা কলকা গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসবার কথা আছে।'

নবেন্দুর মা কী বলতে যাচ্ছিলেন, উঠোনে নীলার গলা শোনা গেল, 'এই ছেলে ঐ—ওখানে ঝাঁকাটা রাখ—'

বিদ্যুৎবেগে পেছন ফিরতেই অমলেশরা দেখতে পেল, নীলা এবং একটি কুলীজা ছোকরা আসছে। ছোকরার মাথায় ঝাঁকাভর্তি আনাজ-মাছ ফলটল-সন্দেশের একটা বাক্স—ইত ইত্যাদি—

ছোকরা ঝাঁকাটা নিয়ে সোজা বারান্দায় এল। আনাজপাতি সেখানেই ঢেলে নীলার ব থেকে ভাড়া গুনে নিয়ে চলে গেল।

সমস্ত বাড়িটাকে ঘিরে অস্বস্তিকর নীরবতা নেমে এলেছে। হঠাৎ নবেন্দুর মা'র কী যেন হ গেল। চিৎকার করে ছুটে এসে কাঁদতে কাঁদতে উন্মত্তের মতো আলু-পটল-মাছ ছুঁড়ে ছ ফেলতে লাগলেন, 'চাই না এসব ছাই-পাঁশ, চাই না। আমাকে ঘুষ দিতে নিয়ে এসেছিস! বড় আস্পর্ধা তোর? কী ভেবেছিস নীলি, ভেবেছিস কী তুই!'

ওধারের ঘর থেকে মহীতোষের চিৎকার ভেসে এল. 'কী হল, অ্যাঁ, সকালবেলায় হল তোমাদের?'

কেউ সে কথার উত্তর দিল না।

উঠোন থেকে ঘরের দিকে আসতে আসতে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল নীলা। চমকা আনাজ-টানাজ ছোঁড়া বন্ধ করে দৌড়ে এসে ছোঁ মেরে তার হাত ধরলেন নবেন্দু মা; নতে টানতে অমলেশ যে ঘরটায় থাকে সেখানে নিয়ে গেলেন 'আয়, তোর একদিন কি মার একদিন।'

অমলেশকে কেউ ডাকে নি। মন্ত্র-চালিতের মতো পায়ে পায়ে সেও তাদের সঙ্গে ঘরের তেব গেল।

ভেতরে এলে নবেন্দুর মা বললেন, 'বল্ সারারাত কোথায় কাটিয়ে এলি।' বলে সোজা য়েব চোখের দিকে তাকালেন।

'বলছি, বলছি—' যেন কিছুই হয় নি এমন সহজভাবে নীলা বলতে লাগল, 'আমার হাতটা ড়ে দাও মা; বড্ড লাগছে।'

'ছাড়ব না, আগে বল্—'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না নীলা। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'কলকাতায় গাড়িঘোড়ার অবস্থা তা তো জানো না মা। সবসময় 'জ্যাম' হয়ে আছে। কাল আসবার সময় বড়বাজারের ছে 'জ্যাম' হল। এক ঘণ্টা আটকে রইলাম। তারপর যখন স্টেশনে এলাম বীজপুরের লাস্ট চলে গেছে। তখন কী আর করব। আমাদের অফিসের একটা মেয়ের বাড়ি চলে গেলাম।' কটু থেমে বলল, 'সমস্ত রাত ঘুমোতে পারি নি। ভোর হতেই ছুটে এসে ট্রেন ধরেছি।'

চাপা গলায় নবেন্দুর মা বললেন, 'সত্যি বলছিস?'

'হ্যাঁ মা, সত্যি।'

'আমাকে ছুঁয়ে বল্—' একটা হাতে মেয়ের হাত ধরে রেখেছিলেন নবেন্দুর মা। আরেকটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ছিল অমলেশ। লক্ষ্য করল, নীলাব চোখেমুখে ভয়ের ছায়া পড়েছে। ম্বিতের মতো সে বলল, 'তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না?'

'বিশ্বাস আমি কারুকেই করি না।'

নীলা চুপ।

নবেন্দুর মা বলতে লাগলেন, 'কেমন করে করব? তোমরা ভাইবোনেরা বিশ্বাস করার ' কাজ কর কী?'

নীলা নিরুত্তর।

নবেন্দুর মা আবার বললেন, 'আমার গা ছুঁয়ে বল্—'

অস্থিরভাবে ঠোঁট কামড়াল নীলা, অসহায়ের মতো চারদিক একবার দেখে নিল। তারপর য়া হয়ে তার মায়ের হাতে আঙুল ঠেকাল, 'এই তো ছুঁয়ে বলছি। এবার বিশ্বাস হল তো?'

নবেন্দুর মা মেয়ের হাত ছেড়ে দিয়ে ভাবলেশহীন মুখে বললেন, 'জানি না।' বলে বেরিয়ে লেন।

অমলেশ একদৃষ্টে নীলার দিকে তাকিয়েছিল। যতক্ষণ মাকে দেখা যায়, নীলা দেখল। পর অমলেশের চোখে চোখ পড়তেই কী বুঝল কে জানে। চকিতে চোখ সরিয়ে এক মুহূর্ত ল দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে গেল।

অন্যদিন নীলাকে বাড়ির কোন কাজ করতে দেখা যায় না; হাত দিয়ে কুটোগাছটি নাড়ে আজ অমলেশ লক্ষ্য করল, মায়ের পায়ে পায়ে ঘুরছে নীলা। তাঁর হাত থেকে কেড়ে

নিয়ে কাজ-টাজ করছে। এই হয়তো আনাজ-টানাজ কেটে দিল, এই মাছ কুটে দিল, এমন। একবার বাটনাও বাটতে বসল।

এর ভেতরেই নবেন্দুর মায়ের গলা শোনা গেল, 'আজ হল কী তোর?'

নীলা বলল, 'কী হবে!'

'কোনদিন তো এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাও না।'

'অন্যদিন অফিসের তাড়া থাকে তাই। আজ আর বেরুচ্ছি না।'

নবেন্দুর মা ঈষৎ উদ্বেগের সুরে বললেন, 'অফিসে না গেলে ক্ষতি হবে না তো?'

অমলেশ অবাক হল এই ভেবে, অফিস নিয়ে নবেন্দুর মায়ের এত ভয়, এত সংশয়, আব সেখানে পাঠাবার জন্য ব্যস্ততাও কম না।

নীলা বলল. 'আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছি।'

ছুটি! শোনামাত্র অমলেশের বুকের ভেতর চমক লাগল। ছুটি মানেই তো সারাদিন নীল বাড়ি থাকা। বাড়ি থাকলেই বলির পশুর মতো সেই নিদারুণ ভয়াবহ প্রশ্নটার মুখোমু দাঁড়াতে হবে।

একসময় ঘরের ভেতর থেকে অমলেশ শুনতে পেল, নীলা ঝুনু আর মীনাকে বল' 'সিনেমা দেখবি?'

দুই বোন লাফিয়ে উঠল, 'দেখাবি দিদি, দেখাবি? রূপমহল টকিজে যা একখানা বই এসে না!'

নীলা বলল, 'দেখাব বলেই তো জিজ্ঞেস করলাম—'

'তুই কী ভাল দিদি, তুই কী ভাল! কত দিন যে সিনেমা দেখি না।'

এরই ভেতর উত্তরের ঘর থেকে মহীতোষের গলা ভেসে এল, 'হ্যাঁ গো, ঝুনু বলে গে নীলা নাকি গলদা চিংড়ি এনেছে!'

রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে নবেন্দুর মা বললেন, 'হ্যাঁ।'

'মাথাগুলো ভাজো আর ঘি-গরম মশলা দিয়ে মাছটা রাঁধো।'

'আচ্ছা।'

'ঝুনু বলছিল, রুই মাছও নাকি এনেছে—'

'হ্যাঁ।'

'রুইটা কালিয়া কর।'

'আচ্ছা।'

'বেশ যত্ন করে রেঁধো। অনেকদিন তো ভালোমন্দ রাঁধার অভ্যাস নেই। দেখো জিনিসগু নষ্ট না হয়।'

'তোমাকে ভাবতে হবে না; যত্ন করেই রাঁধবো।'

কাল সমস্ত রাত এবং আজ সকাল বেলাতেও যে শ্বাসরুদ্ধ থমথমে ভাব ছিল, এমন নীলা ফিরে আসার পরও যে উত্তেজনার স্রোত বইছিল এখন আর তা নেই। সারা বাড়ি ঘি মধুর আবহাওয়া নেমে এসেছে।

অমলেশের কিন্তু মনে হচ্ছিল, নীলা মেয়েটা অত্যন্ত চতুরা! গোটা কুড়ি-পঁচিশ টাকা খ আর মায়ের কাজে সামান্য একটু সাহায্য করে নিমেষে সবাইকে জয় করে নিয়েছে সে

মাত্র কুড়ি-পঁচিশটা টাকা।

২০

কাজের ফাঁকে একবার দু কাপ চা নিয়ে অমলেশের ঘরে এল নীলা। এক কাপ তার জন্য, ারেক কাপ অমলেশের।

টেবিলে কাপ রেখে মোড়া টেনে অদূরে বসল নীলা। প্রথম দিনটা থেকেই অমলেশ লক্ষ্য রেছে, নীলা ওভাবে মোড়া টেনে নিচে বসে।

চোখাচোখি হতেই নীলা হাসল, 'আমি কিরকম অন্তর্যামী বলুন তো—'

বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকল অমলেশ।

নীলা বলল, 'আপনার কি মনে হচ্ছিল না, এই মুহূর্তে এক কাপ চা পেলে ভাল হয়?'

অমলেশ বলল, 'তা হচ্ছিল।'

'আজ রান্না হতে দেরি হবে। তাই চা করে নিয়ে এলাম। দাঁড়ান—দাঁড়ান, মাছের তেলেব ড়া ভাজছে মা, ক'টা নিয়ে আসি।'

'না-না, বড়া লাগবে না। শুধু চায়েই চলবে।'

'লজ্জা করছেন কেন? চায়ের সঙ্গে গরম গরম ভালই লাগবে।'

অমলেশ কিছুটা অবাকই হচ্ছিল। নীলাকে এভাবে হাসতে বা এমন লঘু সুরে কথা বলতে াগে আর কখনও শোনে নি।

নীলা বড়া নিয়ে এল। খেতে খেতে বলল, 'জানেন, আজ আর অফিস যাচ্ছি না।' আগেই নেছিল অমলেশ; উত্তর দিল না।

নীলা আবার বলল, 'আপনার সঙ্গে ভাল করে আলাপ হয় নি। ভাবছি আজ জমিয়ে গল্প বব।'

আড়ষ্ট সুরে অমলেশ বলল, 'বেশ তো।'

অমলেশের মুখের ভাব লক্ষ্য করে নীলা বলল, 'আপনার যেন আপত্তি আছে মনে হচ্ছে।'

'না-না আপত্তি কিসের—' চমকে উঠে তাড়াতাড়ি হাসতে চেষ্টা করল অমলেশ।

একটু চুপচাপ।

তারপব নীলা বলল, 'দুপুর নাগাদ বেরিয়ে যাই। ফিরি মাঝরাতে। এসে সেই যে শুয়ে ড়ি, উঠতে উঠতে দশটা। তক্ষুনি চান করে খেয়ে দেয়ে আবার ছোটার তাড়া। আপনি সেছেন; একটু গল্প যে করব, আপনার সুবিধে-অসুবিধের দিকে নজর দেব তার উপায় নেই।'

অমলেশ বলল, 'সে জন্য বিন্দুমাত্র ত্রুটি হচ্ছে না। মাসিমা-ঝুনু-মীনা, সবাই আমার দিকে জর রেখেছে।'

'তা হলে তো সুখেই আছেন।'

'নিশ্চয়ই।'

কিছুক্ষণ ভেবে নীলা বলল, 'আমাদের বীজপুর শহরটা ঘুরেটুরে দেখেছেন?'

'একটু-আধটু দেখেছি। সেদিন ঝুনু-মীনাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম; ওরা যা দখিয়েছে—'

'আমি বাড়ি থাকি না; থাকলে দেখাতে পারতাম। ওবেলা যদি বৃষ্টি-টৃষ্টি না হয়, বেরুবেন াকি?'

অমলেশকে নিয়ে কোথায় যেতে চায় নীলা? উদ্দেশ্য কী মেয়েটার? যাই থাক, একটা াপারে অমলেশ বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে পারছিল, অনেকখানি দুর্ভাবনাশূন্য। নবেন্দুর কথা নীলা লছে না।

অমলেশ কিছু বলবার আগেই নীলা আবার শুরু করল, 'ওবেলার কথা ওবেলা হবে। সেই কথাটা সেরে নিই—'

কী কথা বুঝতে পেরেছে অমলেশ। নাঃ, নীলার হাত থেকে রেহাই নেই। অনিবার্য নি মতো নবেন্দুর প্রসঙ্গ যেখান থেকেই হোক সে টেনে আনবেই। একটু আগে যা ভেবে হয়েছিল অমলেশ সেই দুশ্চিন্তাটাই তাকে আবার নিদারুণভাবে পেয়ে বসল। হঠাৎ একটা মনে পড়ে যাওয়াতে অমলেশ মরিয়ার মতো বলল, 'আমার একটা কথা বলার আছে

'কী?'

'ঠিক ঠিক উত্তর দেবেন?'

'আপনার কি ধারণা আমি মিথ্যে বলি?'

নীলার চোখে চোখ রেখে অমলেশ বলল, 'আমার সঙ্গে এখনও বলেন নি। তবে-

'কী?'

'কারো কারো সঙ্গে বলেন তো—'

'যেমন—' ভুরু কুঁচকে গেল নীলার।

অমলেশ বলল, 'ধরুন, মাসিমার সঙ্গে—'

'মা'র সঙ্গে আমি মিথ্যে বলি!'

'বলেন বৈকি।'

'কখন বলেছি?'

'আজই। কলকাতা থেকে ফিরে এসে—'

দাঁত বসিয়ে নিচের ঠোঁটটাকে রক্তাক্ত করতে করতে নীলা বলল, 'কি রকম?'

অমলেশ বলল, 'কাল রাত্তিরে না ফেরার যে কৈফিয়তটা মাসিমাকে দিয়েছেন সেটা না।'

'আপনি কি বলতে চান, কাল রাত্তিরে আমি আমার বন্ধুর বাড়ি থাকি নি?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল অমলেশ। অর্থাৎ তা-ই।

তীক্ষ্ণ গলায় নীলা বলল, 'আপনাকে এ খবরটা কে দিলে?'

'আপনি নিজে।'

'আমি!'

'হ্যাঁ, আপনি—' অমলেশ বলতে লাগল, আপনার চোখ-মুখ, 'আপনার গলার স্বর, বুঝিয়ে দিয়েছে আপনি ঠিক বলছেন না।'

অমলেশ টের পেল, মেয়েটা ফাঁদে পড়ে গেছে। তার চোখমুখেব চেহারাই গেছে ব কিছু বলতে চেষ্টা করল নীলা, গলায় স্বর ফুটল না, ঠোঁট দুটো থর থর করল মাত্র।

গলা নামিয়ে অমলেশ ফিসফিস করল, 'কোথায় ছিলেন কাল?'

নীলা হঠাৎ উঠে পড়ল। অস্থিরভাবে পা ফেলে চৌকো চৌকো ঘর-কাটা সেই জানা কাছে নিয়ে চুপচাপ বাইরেব দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

হাতে একটা অস্ত্র পেয়ে গেছে অমলেশ। নবেন্দুর প্রসঙ্গ এটা দিয়েই ঠেকিয়ে রাখতে প সে।

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে পায়ে পায়ে নীলার কাছে গেল অমলেশ। আগের সুরেই ত বলল, 'কাল রাত্তিরে কোথায় ছিলেন?'

নীলা উত্তর দেবার আগেই বাইরে থেকে নবেন্দুর মায়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, '

মলেশকে চান করে নিতে বল। তোরাও চান-টান কর। আমার রান্না শেষ হয়ে এসেছে।'
ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল নীলা। অস্ফুটে বলল, 'চান করে নিন।' বলে আর দাঁড়াল না; নিক ঝুঁকে বড় বড় পা ফেলে বেরিয়ে গেল।

খেতে বলে অমলেশ লক্ষ্য করল, তার দিকে একেবারেই তাকাচ্ছে না নীলা। এ ক'দিন মলেশও তার দিকে তাকাতে পারে নি। নবেন্দুর ব্যাপারে তার কাছে ধরা পড়ে গেছে মলেশ। নীলাও কালকের রাত বাইরে কাটিয়ে আসার পর অমলেশের কাছে ধরা পড়ে ছে।

অমলেশের দিকে তাকাচ্ছে না কিন্তু বোনেদের সঙ্গে খুনসুটি চালিয়ে যাচ্ছে নীলা। ঝুনু এবং নাকে কথায় কথায় অন্যমনস্ক করে তাদের পাত থেকে ছোঁ মেরে মাছ-টাছ তুলে নিচ্ছে। সঙ্গে চিৎকার-কান্নাকাটি, মাকে সালিশী মানা—

নবেন্দুর মা হেসে হেসে বলেন, 'দে না বাপু, দিয়ে দে। কেন ওদের ক্ষ্যাপাচ্ছিস?' তারপর মলেশের দিকে ফিরে বলেন, ছেলেবেলা থেকে ওর এই স্বভাব, ছোট ভাইবোনদের পেছনে গা—'

হঠাৎ কি মনে পড়তে নবেন্দু মা বিষণ্ণ সুরে বলে ওঠেন, 'এত রান্না-টান্না হল, অথচ সেই দব দুটো বাড়ি নেই।'

অমলেশের মনে পড়ল, নিতু সেই যে চলে গিয়েছিল আর ফেরে নি। হীরুর দেখা তো জও পায় নি সে।

একটু নীরবতা।

তারপরই ঝুনুই বলে উঠল, 'দিদি, সেই কথাটা মনে আছে?'

নীলা বলল, 'কোন কথাটা রে?'

'আমাদের সিনেমা দেখাবি বলেছিলি—'

'নিশ্চয়ই মনে আছে।'

হঠাৎ মীনা বলে উঠল, 'শুধু আমরা যাব, অমলদা আর তুইও আমাদের সঙ্গে চল্ না—'

নবেন্দুর মা এই সময় বলে উঠলেন, 'সেই ভাল, ওদের সঙ্গে তোরাও যা। একলা তো দব কোথাও ছাড়ি না—'

নীলা কি বলতে যাচ্ছিল, বাধা পড়ল। বাইরের উঠোন থেকে তীক্ষ্ণ গলার ডাক ভেসে এল, লাদি—মাসিমা—'

খাওয়া আধাআধির মতো হয়েছে। নীলা চমকে উঠল, 'কে?' বলেই তাড়াতাড়ি উঠে ইরে চলে গেল। নবেন্দুর মা-ও তার পিছু পিছু ছুটলেন।

ঝুনু বলল, 'নিশ্চয়ই নণ্টে—'

অমলেশ শুধলো, 'নণ্টে কে?'

'মেজদার বন্ধু—'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে অমলেশও উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। একটা কুড়ি একুশ বের ওস্তাদ ছোকরাকে ঘিরে নীলা আর নবেন্দুর মা দাঁড়িয়ে আছেন। নীলা চাপা গলায় জ্ঞেস করছে, 'বুকটা কি একেবারে পুড়ে গেছে?'

'হ্যাঁ নীলাদি—' ছোকরা বলল, 'বাঁ হাতের দুটো আঙুলও উড়ে গেছে।'

'হীরু এখন কোথায়?'

'লোটনদের গোয়াল ঘরে এনে রেখেছি। হাসপাতালে পাঠালে জানাজানি হয়ে : আবার পুলিশের ঝামেলা আছে। তাই আপনাকে ডাকতে ছুটে এলাম। যা হয় তাড়া ব্যবস্থা করুন।'

নবেন্দুর মা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। অমলেশ লক্ষ্য করল, তাঁর চোখ দুটো ফেটে রক্তের ফোয়ারা ছুটবে। ঠোঁট অসহ্য আবেগে থরথর করছে।

ওদিকের ঘর থেকে বিকৃত ভাঙা গলায় মহীতোষ সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'কী হ অ্যাঁ, হয়েছে কী? কে যেন এল—আমার কাছে নিয়ে এসো।'

নীলা চেঁচিয়ে বলল, 'কিছু হয় নি। আপনি রুগী মানুষ, চুপচাপ শুয়ে থাকুন না।'

'হয় নি বললেই হল, নিশ্চয়ই হয়েছে। তোরা আমাকে না জানিয়ে কত কী করছিস এল, তাকে নিয়ে এসো—'

বিরক্ত সুরে নীলা বলল, 'যাই হোক, আপনাকে অস্থির হতে হবে না। চেঁচাবেন না ব্যাপার আপনার জানবার দরকার নেই।'

মহীতোষের ভাঙা গলা কিন্তু থামল না, 'আমাকে জানাতে হবে না? বিছানায় পড়েছি কি একেবারে বাতিল হয়ে গেছি? ভেবেছিস কি তোরা, অ্যাঁ, কী ভেবেছিস?'

নীলা সেদিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করল না। সেই ছেলেটাকে বলল, একটু দাঁড়া নণ্টে, আমি যাচ্ছি তোর সঙ্গে।' মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমাকে পঞ্চাশেক টাকা দাও তো—'

এতক্ষণে কথা বললেন নবেন্দুর মা, 'টাকা কোথায়?'

'কেন অমলেশবাবুর হাত দিয়ে দাদা অতগুলো টাকা পাঠাল।' বলে কেমন করে অমলে দিকে তাকাল নীলা।

'মোটে দেড়শ' টাকা। ধার দেনা কিছু কিছু দিয়ে আর এক মাসের চাল কিনেই তো হয়ে গেছে। পনের কুড়িটা টাকা পড়ে আছে।'

'তা হলে উপায়?'

হঠাৎ রেগে উঠলেন নবেন্দুর মা. 'বড় মানষি চাল দেখিয়ে অতগুলো বাজার করে আনলি। ঐ টাকাগুলো থাকলেও এই সময় কাজে লাগত। মরুক, আপদ মরুক।'

নীলা অসহায় সুরে বলল, 'এখন আমি কী করি?'

'মরবে মরবে, এই যমের অরুচিগুলো নিজেরাও মরবে। আমাকেও মারবে। কি অদৃষ্ট যে এসেছিলাম।

হঠাৎ অমলেশের কী হয়ে গেল। এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ভাববেন না, চলুন আমি যাচ্ছি—'

'কিন্তু—' বলেই নীলা থমকে গেল।

'কী?'

'টাকা—'

'বললাম তো চিন্তার কিছু নেই।'

'এঁটো হাত ধুয়ে নীলা এবং অমলেশ দুজনে নণ্টের সঙ্গে ছুটল। যেতে যেতে অম বলল, কার হাতের আঙুল উড়ে গেছে?'

'হীরুর। আমার মেজ ভাই।'

'উড়ল কী করে?'

নণ্টেই এবার জবাব দিল, 'বোমা বাঁধতে গিয়ে।'

'বোমা!'

'হ্যাঁ। দিন কয়েক পর জলসা আছে। বিবিবাজারের ছোঁড়ারা সেদিন রোয়াব দেখিয়ে গেছে জলসা করতে দেবে না। তাই আমরা তৈরি হচ্ছিলাম—'

নীলা বলল, দাদাকেই যা একটু ভয় করত হীরুটা। দাদা বোম্বাই যাবার পর আর কারোকে গ্রাহ্য করে না। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। এখানে গুণ্ডামি, ওখানে ছেনতাই, সেখানে বোমাবাজি—'

লোটনদের গোয়াল ঘরে রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় যে ছোকরা পড়ে আছে তার দিকে তাকিয়ে চমক লাগল অমলেশের। এই তবে হীরু! এই ছোকরাই তার বিক্সায় চড়ে সেদিন বাজারের দিকে গিয়েছিল। একেই চাঁদার ব্যাপারে চড় কষিয়েছিল অমলেশ।

ছোকরার জ্ঞান ছিল, নীলার সঙ্গে অমলেশকে দেখে চকিত হল। নীলাকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে বলল, 'ভদ্রলোক কে রে দিদি?'

'অমলেশ বসু। দাদার বন্ধু।' নীলা বলল।

তারপর হীরুর ব্যবস্থা করা হল। বোমা বাঁধতে গিয়ে আঙুল উড়িয়েছে। কাজেই পুলিশে যাতে জানাজানি না হয়, সে জন্য এখানে-ওখানে নগদ কিছু গুঁজে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। সব চুকিয়ে অমলেশরা যখন বাড়ি ফিরল তখন বেশ রাত হয়েছে। আজও তার পালানো হল না।

বাড়িতে পা দিয়েই শুনতে পাওয়া গেল মহীতোষ চেঁচাচ্ছেন, 'এ বাড়িতে আমাকে আবর্জনার মতো এককোণে ফেলে রেখেছে। যেদিন থেকে বিছানায় পড়েছি, কেউ কেয়ার করে না। আসলে পয়সার সঙ্গেই সব সম্পর্ক। ছেলে মেয়েগুলো কী করছে জানি না। আমার মন বলে সাংঘাতিক কিছু করছে।' বলতে বলতে গলার স্বর পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগল, 'ধৃতরাষ্ট্র, ধৃতরাষ্ট্রের মতো আমি পড়ে আছি—'

সেই দুপুর থেকেই ভদ্রলোক চেঁচাচ্ছেন নাকি?

২১

রাত্রিবেলা ফিরে এসে কারো সঙ্গেই বিশেষ কথাবার্তা হল না। নবেন্দুর মা শ্বাসরুদ্ধের মতো বসে ছিলেন। হীরুর কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাঁকে সংক্ষেপে জানাল অমলেশ। তারপর রাত আরেকটু বাড়লে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল।

পরের দিন সকালবেলা রান্না-বান্না এবং সংসারের নানা কাজের ফাঁকে নবেন্দুর মা একবার এসে অমলেশকে বললেন, 'সেই কথাটা মনে আছে তো বাবা?'

অমলেশ জানতে চাইল, 'কোন্‌টা মাসিমা?'

'সেই যে কাল বলেছিলাম—'

এবার মনে পড়ে গেল অমলেশের, 'নীলাদেবীর অফিস সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে হবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার নিশ্চয়ই মনে আছে। আজই খোঁজ নেব।'

সকালবেলার দিকে চা খাওয়া, খবর-কাগজ পড়া (অমলেশ আসার পর রোজ একখানা

খবর-কাগজ কিনে আনা হয়। সে আপত্তি করেছিল, নবেন্দুর মা শোনেন নি)—এ সবের মধ্যে ঝুনু-মীনার সঙ্গে সাধারণ দু-একটা কথা হয়েছে। এক সময় কানে এল সেই ছোকরার গলা। অর্থাৎ নিতু। আজ দিন দুই পর সে বাড়ি ফিরল। গলা শুনতে পেয়েই কান খাড়া করল অমলেশ।

নিতু চাপা গলা বলছে, 'বোম্বাইকা বাবু এখনও আছে রে?'

'আছে।'

'আরো কদ্দিন থাকবে?'

'যে ক'দিন খুশি; তাতে তোর কি রে গুণ্ডা?'

'মনে হচ্ছে বেশ চেপে বসেছে। সহজে স্টেশনে ছাড়বে না।'

এবার আর ঝুনুর কথা শুনতে পাওয়া গেল না। তার আগেই নবেন্দুর মায়ের চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'দুদিন কোথায় ছিলি বাঁদর?'

নিতু বলল, 'আমার বন্ধুর বাড়ি।'

যা, জামা-কাপড় যা আছে সব নিয়ে বন্ধুর বাড়িই থাক গিয়ে। এখানে আর আসতে হবে না।'

নিতু উত্তর দিল না।

নবেন্দুর মা আবার বললেন, বন্ধুর বাড়িতে আর গিলতে দিলে না?'

এবার নিতু চিৎকার করে বলল, 'কেন, দেবে না, যে ক'দিন ইচ্ছে আমি ওখানে থাকতে পারি।'

'তাই থাক গিয়ে। আমার হাড় জুড়োক।'

ঘরের মাঝখান থেকে উঠে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল অমলেশ।

নিতু বলল, 'তাই যাব; এ বাড়িতে কোন মানুষ থাকতে পারে না। এটা একটা খোঁয়াড়—' বলল বটে যাবে কিন্তু যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

নবেন্দুর মা আবার কী বলতে যাচ্ছিলেন, অমলেশ ডাকল 'নিতু—,'

তার দিকে তাকিয়ে যুগপৎ চকিত এবং বিরক্ত হল নিতু। দুর্বিনীত ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

নরম গলায় অমলেশ বলল, 'শোন—'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাছে এল নীতু।

তার কাছে একখানা হাত দিয়ে ভেতরে এনে বসাল অমলেশ। বসেও ঘাড় গোঁজ করে থাকল নিতু।

কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে অমলেশ বলল, 'এটা কিন্তু ঠিক না—'

অমলেশের দিকে না তাকিয়েই নিতু বলল, 'কোন্‌টা?'

ছেলেটাকে সেদিন বকেছে অমলেশ, তার ইচ্ছা হল, সন্ধি করে নেবে। বলল, 'এই বোনদের সঙ্গে ঝগড়া কর, মায়ের সঙ্গে তর্ক কর, দু-তিন দিন বাড়িতেই থাকলে না—'

বাধা দিয়ে উষ্ণ কটু গলায় নিতু বলল, 'দেখুন স্যার, জ্ঞান দেওয়া আমার ভাল লাগে না। দুটো টাকা সেদিন দিয়েছিলেন বলে এত অ্যাডভাইস ঝাড়বেন, তা চলবে না। আমি আপনার টাকা ফেরত দিয়ে দেব—'

অমলেশ টের পাচ্ছে, তার কান লাল হয়ে উঠেছে অপমানটা খানিক হজম করে বলল, 'বেশ ঝগড়া-টগড়া-বখামি যা তোমার খুশি করো। আজ হোক কাল হোক আমি চলে যাব' তোমার ভালর জন্যই ঐ কথাগুলো বলছিলাম।

'ভাল ভাল বাত সব্বাই আওড়াতে পারে।'

'যা বলেছ।' রাগ এবং অপমানের ভাবটা ঝেড়ে ফেলে কৌতুকের সুরে অমলেশ বলল, কিন্তু ভাই একটা কথা শুনেছ?'

বিরক্ত ঝাঁঝাল গলায় নিতু বলল, 'কী?'

'হীরু অ্যাকসিডেন্ট করে আঙুল উড়িয়েছে।'

'মোয়া বাঁধতে গেল ঐ রকম আঙুল-টাঙুল ওড়েই। কত লোকের হাত পর্যন্ত উড়ে যায়।' তাচ্ছিল্যের গলায় নিতু বলল।

অমলেশ বল, 'রাইট রাইট। ভাল কাজে এক-আধটা হাত-পা উড়ে গেলে কী এমন হয়! তারপরেই গলাটা খাদে নামিয়ে দিল, 'তবে—'

'কী?'

'পুলিশ বড্ড খোঁজাখুঁজি করছে—'

গলার স্বরে এবার চমকে গেল নিতু, 'কাকে, কাকে?'

'হীরুকে। আর—'

'আর কাকে?'

'তোমাকে।'

নিতুর অবস্থা অবর্ণনীয়। খুব ভয় পেয়ে গেছে সে। বলল, 'আমাকে—আমাকে কেন? আমি তো বোম বাঁধিনি।'

অমলেশ বলল, 'বাঁধতে বসেছিলে কিনা, আমি কেমন করে জানব। সে কথা পুলিশকে বোলো—' একটু থেমে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করতে করতে বলল, 'হীরুকে যাতে পুলিশ না ধরে তার ব্যবস্থা করেছি। তবে তোমাকে বোধহয় ওরা ছাড়বে না।'

নিতু শ্বাসরুদ্ধের মতো শুধলো, 'মেজদার কী ব্যবস্থা করেছেন?'

চোখের তারায় অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ফুটিয়ে আঙুল দিয়ে টাকা বাজাবার ভঙ্গি করল অমলেশ, এই দিয়ে মুখ চাপা দিয়েছি।'

মুখ থেকে সব রক্ত যেন পরতে পরতে নেমে গেল নিতুর। আগেই অমলেশ বুঝেছে ছেলেটা এখনও বাঁদরামির ব্যাপারে পাকা হয় নি; পুলিশ সম্বন্ধে এখনও তার খুবই ভয়। সে বলল, 'আমার কী হবে?'

'কী আবার হবে, পুলিশ এল বলে। শুনেছি থানায় নিয়ে খুব মারে।'

'খুব?'

'হুঁ—' অমলেশ ঘাড় ঘাত করল, 'ডাণ্ডা দিয়ে ঠেঙায়, সারা গায়ে কম্বল জড়িয়ে লোটা দিয়ে পেটে, বোতলে জল পুরে গাঁটে গাঁটে দুরমুষ করে। নাকের ভেতর ফুটন্ত জল ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দ্যায়—'

শুনতে শুনতে নিতুর চোখ ফ্যাকাশে হয়ে যেতে লাগল।

তার দিকে আড়ে আড়ে তাকিয়ে অমলেশ আবার বলল, 'আমি তোমাকে বাঁচিয়েও দিতে পারি। তবে—'

'কী?'

'আমার কথামতো তোমাকে চলতে হবে।'

আরেকটু কাছে এগিয়ে এসে করুণ চোখে তাকাল ছোকরা। অর্থাৎ অমলেশ যা বলবে সেইভাবেই চলতে সে রাজী।

অমলেশ বলল, 'দরকার না হলে বাড়ি থেকে একদম বেরুবে না। বাজে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা ছাড়তে হবে। তিন নম্বর হুল, আবার পড়াশোনা করতে হবে।'

'কিন্তু—'

'বল—'

'মাইনে অনেক বাকি! আমি আর স্কুলে যেতে পারব না।'

'স্কুলে নাই-গেলে, প্রাইভেটে পরীক্ষা দাও।'

নিতু উত্তব দিল না।

অমলেশ বুঝল, সে ভাবছে। এখুনি বেশি চাপ দিলে প্রতিক্রিয়া খুব ভাল না-ও হতে পাবে বলল, 'এক্ষুনি কিচ্ছু বলতে হবে না। আজকের দিনটা ভাল করে ভাবো।'

খানিকটা পর নিতু চলে গেলে দরজার কাছে দাঁড়াল নীলা। ইতিমধ্যেই স্নান সেরে নিয়েছে সে। চারদিক ভাল করে দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আমাকে আজ তাড়াতাড়ি বেরুতে হচ্ছে। ফিরে এসে বলব, পবশু রাতটা কোথায় কাটিয়েছি। আমার প্রশ্নের উত্তরটাও কিন্তু তখন চাই।' বলেই সরে গেল সে।

নীলা চলে যাবার পরই নবেন্দুর মা এলেন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'ও কিন্তু এক্ষুনি বেরিয়ে যাবে।'

ইঙ্গিতটা বুঝল অমলেশ। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিল সে। নবেন্দুব মা বললেন 'ভাত দি'

অমলেশ দেখল, ইতিমধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে জামা-কাপড় পরে ফেলেছে নীলা। খেতে বসলে আর তাকে ধরা যাবে না। বলল, 'এখন ওসব থাক মাসিমা। আমি বাইরে কোথাও খেয়ে নেব।'

'চান-টান করে একেবারে শুধু মুখে যাবে বাবা?'

'খেতে বসলে নীলাদেবীকে আর ধরতে পারব না। ওব পিছু পিছু না গেলে অফিসের খোঁজ পাব কী করে?'

'তবে একটু মিষ্টি আর জল খেয়ে যাও। নবেন্দুর মা ছুটে গিয়ে পেতলের রেকাবে চিনি আর এক গেলাস জল নিয়ে এসেন। খেতে খেতে অমলেশ চোখ রাখল জানালার বাইরে।

একটু পর নীলার গলা পাওয়া গেল, 'যাচ্ছি মা।'

নবেন্দুর মা প্রতিদিনের মতো বললেন, 'তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা কোরো।'

নীলা চলে গেল। খানিক পরে জানালার বাইরে তাকে দেখতে পেল অমলেশ। সামনের সরু পথটা দিয়ে একসময় বড় রাস্তার দিকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অমলেশ আর দেরি করল না। তাড়াতাড়ি জামাটা গায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বড় রাস্তায় এসে দেখল, বেশ খানিকটা চলে গেছে নীলা। তার দিকে চোখ রেখে মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব রেখে ধীরে ধীরে অনুসরণ করতে লাগল অমলেশ।

নবেন্দুর মায়েব কথাতেই না, নীলার সম্বন্ধে অমলেশের নিজেরও দুর্বার কৌতূহল ছিল দুপুরবেলা মেয়েটা কোথায় বেরিয়ে যায়, সারাদিন কী করে, মাঝরাতে কোত্থেকে ফেরে, কেনই বা তার পেছনে পুলিশ লাগে—এ সব প্রশ্নের একটাও উত্তর পায় নি সে।

অমোঘ নিয়তির মতো আগে আগে চলছে নীলা; অন্ধের মতো অমলেশ তাকে অনুসরণ করতে লাগল। এ ছাড়া নীলাব সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব না।

নীলা সোজা স্টেশনের দিকে গেল না। বাঁ-দিকে বেঁকে নূপুরদের বাড়ি গিয়ে ঢুকল। ঝখানের সেই দূরত্বটা বজায় রেখে অমলেশ একটা বাড়ির আড়ালে দাঁড়াল।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। খানিক পর নীলা আর নূপুর বেরিয়ে এল। অমলেশ বাক হয়ে দেখল, নীলার গায়ে সেই সাধারণ আটপৌরে পোশাক নেই। তার বদলে প্রথম নের দেখা সেই রাজেন্দ্রাণী বেশ।

এতদিনে রহস্যটা পরিষ্কার হল। বাড়ি থেকে সামান্য বেশবাসে বেরিয়ে নূপুরদের বাড়ি য়ে তা বদলে নেয় নীলা।

নূপুর নীলা কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। অমলেশ আরেকটু আড়ালে সরে গেল। তারপর রা অনেকখানি চলে গেলে, বেরিয়ে এল।

নীলাদের পিছু পিছু এবার স্টেশনে। খুব সম্ভব ওদের মাসিক টিকিটের ব্যবস্থা আছে। নীলারা সোজা গাড়িতে গিয়ে উঠল।

বটতলায় রিক্সাস্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল অমলেশ। তারপর দ্বিতীয় ঘন্টিটি পড়বার ঙ্গে সঙ্গে টিকিট-কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল, 'একটা কলকাতার টিকিট দিন—'

টিকিট আর খুচরো পয়সা নিতে নিতে স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। ভদ্রলোক সবিস্ময়ে বললেন, 'আপনি এখনও আছেন নাকি?'

'আছি—'

'কী ব্যাপার, সে দিনই না চলে যাবেন বলেছিলেন—'

'যাওয়া হল না।'

'কেন?'

'পরে বলব। এখন সময় নেই।'

'আরে মশাই, থার্ড বেল পড়তে এখনও দেরি আছে। দেখলাম সেই ছুঁড়িটা তার এক ন্ধুকে নিয়ে গাড়িতে উঠল।'

'কার কথা বলছেন?'

'মহীতোষ চাটুজ্জের মেয়ে—নীলার। যাদের বাড়ি আপনি আছেন।' বলতে বলতে গলা চু করলেন স্টেশন-মাস্টার, 'এক গাড়িতেই কলকাতা চললেন, ব্যাপারখানা কী মশাই—'

'পরে বলব—' ছুটতে ছুটতে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় গিয়ে উঠল অমলেশ। একটু পর ট্রেন ছেড়ে দিল।

একেকটা স্টেশন আসে। জানালার বাইরে গলা বাড়িয়ে অমলেশ লক্ষ্য রাখে নূপুরেরা কেউ নেমে গেল কিনা। কিন্তু না, কেউ নামছে না।

একসময় একটা বড় জংশন স্টেশনে গাড়িটা থামল। ওধারের প্লাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ল।

চোখের পাতা টান করে অমলেশ বাইরে তাকিয়ে আছে। প্লাটফর্মে ঘন্টির পর ঘন্টি বেজে চ্ছিল। কোন্ ট্রেনের ঘন্টি কে জানে।

হঠাৎ অমলেশ দেখতে পেল, এই ট্রেনটা থেকে নেমে নীলা ওধারের ট্রেনটায় গিয়ে উঠল।

অমলেশ কী করবে, প্রথমটা ঠিক করে উঠতে পারল না। বিমূঢ়ের মতো খানিকক্ষণ বসে থেকে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। শ্বাসরুদ্ধ এক কৌতূহল নাকে বঁড়শি আটকে তাকে যেন টানতে লাগল। এতদূর এসে যদি নীলাকে হারিয়ে ফেলে তার চাইতে বড় ব্যর্থতার কারণ আর কিছু হতে পারে না।

গাড়ির কামরায় দারুণ ভিড়। তাড়াতাড়ি যে অমলেশ নামবে, তার পথ বন্ধ। কোন রক ভিড় ঠেলে যখন অমলেশ প্ল্যাটফর্মে নামল, ওধারের গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। ছুটে গিয়েও সেট ধরা গেল না।

হতাশ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে আবার এধারের ট্রেনে ফিরে এল অমলেশ।

বীজপুর লোকাল যখন হাওড়ায় পৌঁছুল তখন বিকেল। গাড়ি থেকে নেমে জনস্রোতে ভাসতে ভাসতে অমলেশ বাইরে বেরিয়ে এল।

এতক্ষণ নীলার কথাই ভেবেছে সে, হঠাৎ নূপুরের কথা মনে পড়ে গেল তার। নূপু জংশন স্টেশনে নামে নি। হয়তো কলকাতা পর্যন্ত এসেছে। তার পিছু নিলেও নীলার ব্যাপারট জানা যেত। কিন্তু এখন কোথায় তাকে পাওয়া যায়? ট্রাম-বাস লরী-ট্যাক্সি আর মানুষ-স মিলিয়ে অরণ্যের মতো এই জটিল বিশাল মহানগরে সে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বাইরে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল অমলেশ। ভাবল, কী হবে নীলাদের কথা ভেবে? ক হবে তাদের পিছু ছুটে? প্রয়োজনটাই বা কী? বাঞ্ছিত মুক্তি যখন হাতে চলে এসেছে, তখ পালানো যাক।

চারদিন হল অমলেশ বাঙলাদেশে এসেছে। মধ্য কলকাতার এক হোটেলে বাক্স-বিছান রেখে সে-ই যে বীজপুরে ছুটেছিল, আর সে-সবের খবর নেওয়া হয় নি। একবার সেখানে যাওয়া উচিত।

যে হোটেলে অমলেশ উঠেছিল সেটা মাঝারি গোছের। সেখানে এসে পৌঁছুতেই ম্যানেজা ধরল, 'একদিনের নাম করে গেলেন। দেখতে দেখতে চারদিন কেটে গেল। আমি কিন্তু খু দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম।'

অমলেশ অল্প হাসল, 'বিশেষ একটা দরকারে আটকে গিয়েছিলাম। তাই—'

'যাক গে, চান-খাওয়া হয়ে গেছে?'

'চান হয়েছে। খাওয়া হয় নি।'

'আপনি নিজের ঘরে যান; ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে বসল অমলেশ। একটা চিঠিই বরং লেখা যাক নবেন্দুর মায়ের নামে নবেন্দুর মৃত্যু-সংবাদটা লিখেও ফেলল সে। তারপর সুটকেশটা হাতড়াতে লাগল। না, এনভেলপ নেই। ম্যানেজারের কাছেও পাওয়া গেল না। অগত্যা পকেটেই ভাঁজ করে চিঠিটা রেখে দিল অমলেশ। পরে সুবিধে মতো পোস্ট করে দেবে।

চিঠি লিখবার পর বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাইরে আকাশের দিকে এখন তাকিয়ে আছে অমলেশ। আজ আকাশে তেমন মেঘ নেই। মাজা মাজা নীল রঙ-এ ডুব দিয়ে ক'টা পাখি উড়ছিল।

বিকেলের রঙ এখন ঘন হয়ে এসেছে। পাখি আর আকাশ দেখতে দেখতে হঠাৎ অমলেশের মনে পড়ে গেল, সন্ধ্যে নাগাদ বোম্বাইয়ের ট্রেন। কলকাতায় পড়ে থেকে আর কী হবে?

মনে পড়া মাত্র তাড়াতাড়ি উঠে জামা-টামা পরে নিচে ম্যানেজারের ঘরে এল অমলেশ বলল, 'আপনার কাছে টাইমটেব্‌ল্‌ আছে?'

ম্যানেজার বলল, 'আছে।'

'দেখুন তো বম্বে মেল ক'টায়?'

টাইম টেব্‌ল্ দেখে ম্যানেজার বলল, 'সাড়ে ছ'টায়।'

'আমার বিলটা করে দিন।'

'আজই চলে যাবেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু টিকিট-ফিকিট কাটা হয়েছে?'

'না।'

'রিজার্ভেশান ছাড়া যেতে পারবেন?'

'দেখি ঠেলে-ঠুলে গুঁতিয়ে-গাঁতিয়ে যেতে পারি কিনা।' অমলেশ হাসল।

ম্যানেজারও হাসল, 'দেখুন।'

সন্ধ্যের খানিক আগে বিল মিটিয়ে ট্যাক্সি করে হাওড়া চলে এল অমলেশ। ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ঢুকে বোম্বাইয়ের টিকিট-কাউন্টারের কাছে আসতেই হঠাৎ মাইকে ঘোষিকার কণ্ঠ ভেসে এল, 'বীজপুর লোকাল আট নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছ'টা বেজে দশ মিনিটে ছাড়বে।' তারপর হিন্দী এবং ইংরেজিতেও সেই ঘোষণা চলতে লাগল।

অমলেশ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বীজপুর—বীজপুর—বীজপুর! চকিতের জন্য মনে পড়ে গেল—সেই টিনের বাড়িটা, একটা প্রায়ান্ধকার ঘরে পক্ষাঘাত পঙ্গু একটি মানুষ পড়ে আছেন, হীরু—নীতু—মীনা—ঝুনু আর নিয়ত-অস্থির নিয়ত-রুদ্ধশ্বাস নবেন্দুর মা। নবেন্দুর মাকে কথা দিয়ে এসেছিল অমলেশ তাঁর মেয়ের চাকরির ব্যাপার সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিয়ে জানাবে। কিন্তু তার আগেই পালিয়ে যাচ্ছে।

কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকল অমলেশ। তারপর সব ভাবনা একধারে সরিয়ে টিকিট-কাউন্টারের দিকে আবার যখন পা বাড়াল তখন সেই ঘোষণা আবার কানে এল, 'বীজপুর লোকাল ছ'টা বেজে—'

ঘোষণাটা অমলেশের সত্তার ভেতর এবার নিদারুণ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে দিল যেন। এই সময় কুলীটা তাড়া দিল, 'চলিয়ে সাব—'

অমলেশ আব দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ভেতর থেকে কেউ যেন বলল, 'এখন আর তুমি পালাতে পার না, পার না।' তারপব সে-ই অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর যেন ধাক্কা দিতে দিতে অমলেশকে বীজপুরের টিকিট-কাউন্টারের দিকে নিয়ে গেল।

বোম্বাইয়ের বদলে কখন যে বীজপুরের টিকিট কিনে বসেছে অমলেশ, আর কখন গেট পেরিয়ে বীজপুরের ট্রেনটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, নিজেরই খেয়াল নেই।

কামরাগুলো ভর্তি। কুলিটাকে সঙ্গে নিয়ে ওরই ভেতর একটু ফাঁকা-টাকা দেখে উঠবে বলে ছোটাছুটি করছে, হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'অমলেশবাবু—অমলেশবাবু—'

থমকে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক তাকাতেই অমলেশেব চোখে পড়ল, ট্রেনের কামরায় জানালার ধার ঘেঁষে নীলার বন্ধু নূপুর বসে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসল সে, তারপর হাতছানি দিয়ে ডাকল।

কাছে আসতেই মেয়েটা বলল, 'বীজপুর যাচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'উঠুন—উঠুন—'

এ কামরায় ভিড় থাকলেও দাঁড়াবার জায়গা আছে। চাই কি, প্যাসেঞ্জাররা সদয় হয়ে একটু চেপে বসে, অমলেশের বসবার জায়গাও হয়ে যেতে পারে।

নূপুর তাড়া লাগাল, 'কি হল, উঠে পড়ুন। গাড়ি ছাড়তে কিন্তু দেরি নেই।'

একরকম জোর করেই মেয়েটা অমলেশকে তার কামরায় তুলল। এমন কি খানিক সরে গিয়ে, পাশের ভদ্রলোককে একটু সরতে বলে তার পাশে বসাল। তারপর বলল, 'কলকাতায় এসেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

অমলেশের স্যুটকেশ আর বিছানা বাঙ্কে তুলে দিয়ে কুলিটা চলে গেছে। সেগুলো দেখিয়ে নূপুর শুধলো, 'এগুলো?'

এগুলো কোথায় ছিল, অমলেশ জানাল।

নূপুর বলল. 'স্যুটকেশ—হোল্ডঅল নিতে এসেছিলেন বুঝি?' ফস করে অমলেশ বলে ফেলল, 'হ্যাঁ।'

নূপুর কেমন করে যেন হাসল, 'নীলাদের ওখানে তা হলে বেশ কিছুদিন থাকবেন?'

নূপুরের হাসিতে একটা ইঙ্গিত ছিল। অমলেশ বলল, 'সেইরকমই ইচ্ছে।'

নূপুরের কথার উত্তর দিয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু মনের ভেতর ভাবনার কাজ চলছিল অমলেশের। কোথায় বোম্বাই মেলে উঠবে, না বীজপুরের ট্রেনে চড়ে বসেছে। বার বার যে ফাঁদটা এড়াতে চাইছে, ঘুরে ফিরে আবার সেখানেই গিয়ে পড়ছে। নাঃ, বীজপুরের ঐ পিঞ্জর থেকে তার মুক্তি নেই।

নূপুর বোধহয় লক্ষ্য করেছিল। বলল, 'কী ভাবছেন অত?'

চকিত হয়ে অমলেশ বলল, 'কই, কিছু না তো।'

ঠোঁট টিপে হাসতে হাসতে নূপুর বলল, 'নিশ্চয়ই ভাবছেন।'

অমলেশও হাসতে চেষ্টা করল, 'কী আবার ভাবব?'

'ভাবছেন আমার সঙ্গে যাবেন কিনা। ভয় নেই—'

'কিসের ভয়!'

গলাটা অতলে নামিয়ে নূপুর ফিস ফিস করল, 'নীলার কাছ থেকে আপনাকে কেড়ে নেব না।'

অমলেশ অবাক। মেয়েটা কি ফাজিল। বলল, 'হঠাৎ কাড়াকাড়ির কথা আপনার মাথায় এল।'

রহস্যময় হেসে নূপুর বলতে লাগল, 'জানি মশাই, সবই জানি। নীলা সবসময় আপনার কথা বলে। দিনরাত তার ঐ এক মন্ত্র—অমলেশ, অমলেশ, অমলেশ—'

বিব্রত এবং বিরক্তবোধ করছিল অমলেশ। তবু বলল, 'আমি খুবই ভাগ্যবান, কি বলেন?'

'নিশ্চয়ই। নীলার জন্য কত ছেলে পাগল। ও ফিরেও তাদের দিকে তাকায় না।'

'বটে।'

'হুঁ।'

'কিন্তু ব্যাপারটা কি জানেন, আপনার বন্ধুটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে মোটে চারদিন। এর ভেতর আমার নাম জপ করবার মতো কিছু হয়েছে বলে জানি না।'

'জানেন মশাই, জানেন। চেপে যাচ্ছেন।' প্রসঙ্গ বদলাবার জন্য অমলেশ বলল, 'আপনি একা-একা ফিরছেন? আপনার বন্ধুটি কোথায়?'

'আমি রোজ এই ট্রেনে ফিরি, নীলা ফেরে এর পরের ট্রেনে।'

'মানে লাস্ট ট্রেনে?'

'হ্যাঁ।'

'আসেন একসঙ্গে, ফেরার সময় বুঝি আলাদা আলাদা?'

'হ্যাঁ।' বলেই খানিক চমকে গিয়ে নূপুর বলল, 'একসঙ্গে কলকাতায় আসি, আপনাকে কে লে?'

'বা রে, সেদিন আপনার বন্ধুকে ওঁদের বাড়ি ডেকে নিয়ে এলেন না?'

'সেই একদিন।'

'আজ একসঙ্গে আসেন নি?'

'না-না, আজ আসব কেন? আমার ডিউটি আগে, আমাকে আগে আসতে হয়। ওর ডিউটি র, ও পরে আসে, পরেও তেমনি যায়।'

'আপনার বন্ধুকে ক'টা পর্যন্ত ডিউটি দিতে হয়?'

নূপুরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল অমলেশ। লক্ষ্য করল সে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছে। ভাবটা গোপন রেখে চোখ বড় বড় করে বলল, 'আপনি কী বলুন তো?'

'কী?'

'আপনার দেখছি মেয়েদের মতো কৌতূহল।'

'তাই নাকি?'

'নিশ্চয়ই। একসঙ্গে যাই কিনা, ক'টা পর্যন্ত ডিউটি—সব জানা চাই।'

'জানতে চাইব না বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু যে মেয়ে সারাদিন আমার নাম জপ করছে তার খোঁজ-খবর একটু রাখার দরকার ই?'

নূপুর বলল, 'ওসব থাক, আসল কথা বলুন—'

'যথা?'

'আপনাদের বোম্বাইয়ের খবর। খুব বড় শহর, না?'

'হ্যাঁ। তবে কলকাতার চাইতে ছোট।'

'মেরিন ড্রাইভটা খুব সুন্দর শুনেছি।'

'হ্যাঁ।'

এমনি নানা আজে-বাজে প্রশ্নে আসল প্রসঙ্গটা ঢাকা দিয়ে রাখল নূপুর এবং সেটা অমলেশ শ ভালভাবেই বুঝতে পারল।

নীলাদের বাড়ি ফিরে অমলেশ দেখল, বারান্দায় উদ্‌গ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নবেন্দুর মা। লেন, 'নীলার অফিসের খোঁজ পেয়েছ?'

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যে এরকম প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে, কে ভেবেছিল? র সময় নেই। অমলেশের মুখ ফসকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'হ্যাঁ।' ভদ্রমহিলার শঙ্কিত দ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই 'না' বলতে পারল না। আর 'হ্যাঁ' বলেই তার মনে হল, সের আরেকটা পাক গলায় জড়িয়ে গেল।

'কী অফিস?'

'নানারকম ব্যবসা ওদের। মারোয়াড়ি ফার্ম।'

'ভয়ের কিছু নেই তো?

'না-না।'

'নীলা যা বলেছে তা হলে সত্যি?'

চোখ কান বুজে অমলেশ বলল, 'হ্যাঁ।'

একটু নীরবতা। তারপর নবেন্দুর মা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'সারাদিন নিশ্চয়ই খাওয়া-দ হয় নি? এসো বাবা, এসো। হাতমুখ ধুয়ে নাও।'

স্যুটকেশ আর হোল্ড-অলটা নিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে অমলেশ বলল, 'এগুলো হে থেকে নিয়ে এলাম মাসিমা।'

'বেশ করেছ।'

'পরশু বোম্বে চলে যাব। ভাবছি হোটেল থেকে না, একেবারে আপনাদের এখান থে রওনা হব।'

অমলেশ পরশুর কথা বলল, এই ভেবে, কালকের দিনটাও সে দেখতে চায় নীলা সা সত্যি কী কাজ করে।

নবেন্দুর মা বললেন, 'পরশুর কথা পরশু ভাবা যাবে। এখন খেয়ে-দেয়ে সুস্থ হও।'

যথারীতি আজও লাস্ট ট্রেনে বাড়ি ফিরল নীলা।

আগেই খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছিল অমলেশের। ঘুম আসছিল না তার।

নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে সিগারেট খেতে খেতে সারাদিনের বাসি খবর-কাগজখানা অনেকক দেখছিল।

দেখছিল শুধু, পড়া আর হচ্ছিল না। অমলেশের ধ্যানজ্ঞান সব কিছুই বাইরে পড়ে ছিল শুয়ে শুয়েই সে টের পাচ্ছিল বাড়ি ফিরে কাপড়-চোপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুল নীলা, তারপ রান্নাঘরে খেতে চলে গেল।

একটু পর রান্নাঘর থেকে নিচু গলার ফিসফিসানি ভেসে আসতে লাগল। খুব সম্ভব ম এবং মেয়ের মধ্যে কোন আলোচনা চলছিল। তবে ওরা কী বলাবলি করছে, বোঝা যাচ্ছে না

একসময় ফিসফিসানি বন্ধ হল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাইরে কুলকুচোর শব্দ পাওয়া গেল অমলেশ বুঝতে পারল, নীলার খাওয়া হয়ে গেছে।

আরো কিছুক্ষণ পর দরজার ছায়া পড়ল। চোখ ফেরাতেই অমলেশ দেখতে পেল, নী

নীলা বলল, 'এখনও ঘুমোন নি?'

অমলেশ বলল, 'না; ঘুম আসছে না।'

'কেন, ইনসমনিয়া নাকি? হলে বলুন, সেদিনকার মতো বড়ি দিচ্ছি।'

'ইনসমনিয়া নয়। তবে?'

'কী?'

'আপনার জন্য জেগে আছি।'

'আমার জন্যে!' নীলার ভুরু কুঁচকে গেল।

অমলেশ আস্তে করে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

আজ নিতু এ ঘরে শোয় নি, ওধারের কোন একটা ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে এল। চাপা গলায় বলল, কী ব্যাপার বলুন তো—'

হঠাৎ কী মনে পড়ে যেতে অমলেশ বলে উঠল, 'মাসিমা কী করছেন?'

'খাচ্ছে।'

'এক্ষুনি এদিকে আসবেন না তো?'

'না-না, খেয়ে-দেয়ে রান্নাঘর-টর ধুয়ে-মুছে আসতে দেরি আছে।'

একটু নীরবতা।

তারপরই নীলাই আবার বলল, 'কী বলবেন বলুন—'

সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে অমলেশ বলল, 'আজ আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম।'

'তাই নাকি; কখন?'

'সাড়ে এগারোটার ট্রেনে।'

নীলা চমকে উঠল। শ্বাসরুদ্ধের মতো বলল, 'আমিও তো ঐ ট্রেনে গেছি, দেখতে পান নি?'

তক্ষুনি কিছু বলল না অমলেশ। চোখে চোখ রেখেই খুব আস্তে দুধারে মাথা নাড়ল, অর্থাৎ দেখে নি।

নীলার বুকের ভেতরকার আবদ্ধ বাতাস আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। চাপা গলায় সে বললো, 'কলকাতায় গেছলেন?'

'হ্যাঁ।'

'দরকার ছিল?'

'হুঁ। হোটেল থেকে বাক্স-বিছানা নিয়ে এলাম।'

'ফিরলেন কখন।'

'সন্ধ্যের পর।'

'তার মানে হাওড়া থেকে ছ'টা দশের ট্রেনটা ধরেছিলেন—'

'হ্যাঁ। ট্রেনে আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল।'

একটু চুপ করে থেকে নীলা বলল, 'কার সঙ্গে?

অমলেশ বলল, 'কার বলুন না—'

'বুঝতে পারছি না।'

অমলেশ এবার নূপুরের নামটা বলল।

নীলা বলল, 'ও—'

'দুজনে একসঙ্গে এলাম। খুব গল্প-টল্প হল।'

'কী গল্প?'

'এই আপনার সম্বন্ধে।'

সন্দিগ্ধ চোখে নীলা তাকাল, 'আমার সম্বন্ধে কী গল্প হতে পারে?'

অমলেশ বলল, 'আপনার বন্ধুর কাছ থেকে জেনে নেবেন।'

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর খুব আস্তে করে অমলেশ বলল, 'মাসিমা আজ আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন—'

নীলা চমকে উঠল, 'কে, মা?'

'হ্যাঁ।'

'কী জিজ্ঞেস করছিল?'

'এই আপনি কী ধরনের কাজ করেন, আপনার অফিসের নাম কী—এই সব—'

নীলা দম বন্ধ করে থাকল; কিছু বলল না।

অমলেশ বলল, 'ওসব আমি কেমন করে জানব বলুন। আমি কি কোনদিন আপনার অফিসে গেছি! সে কথা মাসিমাকে বললাম। মাসিমা বললেন—'এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ চুপ করে

নীলা বলল, 'মা কী বলল?'

'আপনার পিছু পিছু গিয়ে খোঁজখবর করতে। আমি—'

'আপনি কী?'

'না গিয়েই মাসিমাকে বলেছি—'

কণ্ঠার হাড় যেন খাড়া হয়ে উঠল নীলার; চোখের দৃষ্টি স্থির। শিথিল গলায় বলল, বলেছেন মাকে?'

অমলেশ তার চোখে চোখ রেখে বলল, 'বলেছি, আপনি মাড়োয়ারি ফার্মে কাজ কবে তাদের ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের বিজনেস।' বলতে বলতে গলা অতল খাদে নামিয়ে দিল, 'ব্‌ করে ঠিক বলি নি?'

ঘাড় নেড়ে খুব আস্তে করে নীলা বলল, 'হ্যাঁ।' বলেই চোখ নামাল।

২২

পরের দিনও নীলার অজান্তে পিছু নিল অমলেশ। আজ তার যেন জেদ চেপে গে যেভাবেই হোক নীলার রহস্য জানবে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আজ আর নূপুরদের বাড়ি গেল না নীলা; সোজা স্টেশনে চলে এ

কালকের মতো আজও টিকিট কাটবার সময় স্টেশন মাস্টার একই কথা শুধোলেন, মশাই রোজই দেখছি ছুঁড়িটার সঙ্গে বেরুচ্ছেন। ব্যাপারখানা কী?'

অমলেশ কাল যা উত্তর দিয়েছিল, আজও তাই দিল, 'পরে বলব।' তারপর টিকিট ি নীলা যে কামরায় বসেছে, তার পাশের কামরায় গিয়ে বসল।

একেকটা স্টেশনে গাড়ি থামে, মুখ বাড়িয়ে লক্ষ্য রাখে অমলেশ, কোথাও আবার ন টুক করে নেমে পড়ে কিনা।

শেষ পর্যন্ত কালকের মতো সেই জংশন স্টেশনটায় এসে নামল নীলা। আজও উলটোদি প্ল্যাটফর্মে একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। নীলা প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে ওখানে গিয়ে উঠল। টি কাটবার সময় নেই। বিনা টিকিটে ট্রেনে চড়ার পরিণাম জানা সত্ত্বেও বিচিত্র ঘোরের ম ওধারের গাড়িতে গিয়ে উঠল অমলেশ।

বেশি দূর না; আধ ঘণ্টার মতো চলবার পর গাড়িটা যেখানে এসে থামল সেটা বোধ এদিককার শেষ স্টেশন।

নামেই স্টেশন। উঁচু জায়গায় টালির চালের টিকিট ঘর এবং চায়ের স্টল ছাড়া আর কি নেই। প্ল্যাটফর্ম বলতে দুধারে ফাঁকা ঢালু মাঠ।

স্টেশনটাকে ঘিরে ছোটখাটো একটা লোকালয়। তারপর ধানের খেত। খেত পেরি জঙ্গল।

অমলেশ জানালার বাইরে তাকিয়ে ছিল। দেখতে পেল, গাড়ি থেকে নেমে নীলা পেরিয়ে ধানখেতের দিকে চলে যাচ্ছে।

নীলা অনেকদূর গেলে, অমলেশ কামরার বাইরে এল। নাঃ টিকিট নেবার জন্য ইন্ডি রেলওয়ের একজন প্রতিনিধিও স্টেশনের ধারে কাছে বসে নেই।

ক'টি লোক চায়ের দোকানটায় আড্ডা দিচ্ছিল। নিশ্চিন্ত অমলেশ পায়ে পায়ে তাদের চলে এল। নীলা যেদিকে গেছে সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে শুধলো, ঐ যে ধানখেত দেখা যা তারপর কী?'

একটা লোক বলল, 'তারপর জঙ্গল।'

'জঙ্গলের পর?'

লোকটা এবার বলল, 'জঙ্গলের পর বর্ডার।'

'কিসের বর্ডার?'

'ইন্ডিয়ার।'

'বর্ডারের ওপারে কী?'

'পাকিস্তান।'

'আচ্ছা—'

'জঙ্গলের দিকটায় লোকজন আছে?'

'আছে এক-আধটা গ্রাম। তবে ছোট ছোট; লোকজন খুব কম।'

একটু ভেবে অমলেশ বলল, 'বর্ডার পর্যন্ত রাস্তা গেছে?'

লোকটা বলল, 'না। ধানখেতের ভেতর দিয়ে জেলাবোর্ডের খানিকটা পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা ছ; তারপর তো জঙ্গলই।'

অমলেশ আর কিছু বলল না। স্টেশন থেকে তলার ঢালু মাঠে নেমে এল। এতক্ষণে নীলা খেতের কাছে চলে গেছে।

লোকটা ঠিক বলেছে; ধানখেতের ভেতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা মেটে সড়ক। রাস্তাটা বেশ। তার দুধারে নিচু ধানের জমি বর্ষার জলে ডুবে রয়েছে।

মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব রেখে হাঁটছিল অমলেশ। তার দৃষ্টি ছিল নীলার ওপর নিবদ্ধ। ন্তু জঙ্গলের কাছে এসে মেয়েটা ভোজবাজির মতো কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকল অমলেশ। কোথায় যাবে, কী করবে, কিছুই ভেবে তে পারল না। তারপর ঠিক করল, এতদূর এসে ফিরে যাবে না; জঙ্গলের ভেতরেই ঢুকবে।

ঘন গাছ-গাছালির ভেতর অনেকক্ষণ খুঁজল অমলেশ। কিন্তু নেই, নেই— কোথাও নেই লা।

ঘুরতে ঘুরতে বিকেল হয়ে গেল। জঙ্গলের ভেতর ছায়া ঘন হতে লাগল।

অমলেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। হতাশভাবে ভাবল, আর না, এবার ফিরে যাবে। রাত হয়ে লে অরণ্যের এই গোলকধাঁধা থেকে বেরুনো অসম্ভব হয়ে পড়বে।

সীমান্তের সেই নগণ্য প্রায়-নির্জন স্টেশনটির দিকে সবে পা বাড়াতে যাবে অমলেশ, সেই য় চাপা ফিসফিস কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। দু'টি গলা। একটা নীলার, অন্যটা কোন পুরুষের। নিঃশ্বাস বন্ধ করে গলা বাড়িয়ে চারদিক দেখতে লাগল অমলেশ। সত্যি সত্যি ওধারের ঝোপে নীলা এবং একটা লোক দাঁড়িয়ে কী বলাবলি করছে।

সমস্ত স্নায়ু কানের ভেতর জড়ো করে অমলেশ শুনতে চেষ্টা করল। টুকরো টুকরো অস্পষ্ট ছু শব্দ কানেও এল।

নীলা বলছে, 'কাল আর এখানে এসো না—'

লোকটা বলল, 'কেন?'

রোজ রোজ এদিকে এলে পুলিশ সন্দেহ করবে।'

'তবে কবে আসব?'

'পনের দিন পর। জিনিসটা এনেছ?'

'এনেছি।'

'দাও। বিকেল হয়ে গেল, তাড়াতাড়ি না ফিরলে সন্ধ্যেব ট্রেনটা ধরতে পারব না।'

লোকটা ছোট পুঁটুলির মতো কী একটা যেন নীলার হাতে দিল। চোখের পলকেে পেটের কাছে কাপড়ের ভাঁজের ভেতর লুকিয়ে বেঁধে ফেলল নীলা।

তাবপর বলল, 'আমি এখন যাই।'

'আচ্ছা।'

নীলা স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করল। আর সেই লোকটা গেল উল্টোদিকে।

এতদিনে অমলেশ বুঝতে পারল, সংসার বাঁচাবাব জন্য কী করছে নীলা।

নীলা অনেকদূব এগিয়ে গেলে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অমলেশ।

সেই ছোট্ট স্টেশনে এসে নীলা যখন গাড়িতে উঠল তখন সন্ধ্যে নেমে গেছে। তার চে ফাঁকি দিয়ে অমলেশ অন্য কামরায় উঠল।

বর্ডারের কাছাকাছি স্টেশনটা থেকে একসময় সেই জংশন স্টেশনে এল নীলারা। সে থেকে বীজপুবগামী ট্রেন ধরল।

এবার পাশাপাশি কামবায় বসেছে দুজনে। মাঝখানে কাঠের একটা দেয়াল। তার ওপা জানালায় বসেছে নীলা; এধারেব জানালায় অমলেশ। দু-দিন পিছু নেবাব ফলে নীলা কী চা করে মোটামুটি বুঝে ফেলেছে অমলেশ। বুঝে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এর পরিণাম অস্পষ্ট ন

অসীম ভাবনার ভেতব সাত-আটটা স্টেশন পার হয়ে গেল।

ভাদ্রমাসের এখন শেষের দিক। সারাদিন বৃষ্টি ছিল না। সন্ধ্যের পর শুরু হয়েছে। তবে ভোবালো না, ঝিরঝির করে খানিক ঝরে যায়। আবার থামে।

হঠাৎ একটা স্টেশনে গাড়ি থামলে অমলেশেব কামরায় পুলিশ উঠল। দরজাব কাছ থে কামবার ভেতরটা এক পলক দেখে নিয়ে চলে গেল পাশের কামবায় অর্থাৎ নীলা যেখ আছে সেখানে।

কেন জানি অমলেশের বুকের ভেতব হৃৎপিণ্ড অস্থির হয়ে উঠল শ্বাসক্রিয়া ক্রমশঃ হয়ে আসতে লাগল।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিল অমলেশ। হঠাৎ চোখে পড়ল, তর-তর করে ট্রেনে পাশ দিয়ে নেমে যাচ্ছে নীলা।

এদিকে ট্রেন ছাড়াব সংকেত দিয়েছে। অমলেশ আর বসে থাকতে পারল না। ভেতর থে কিসেব এক ধাক্কায় উঠে দাঁড়াল। গাড়ি যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে সেই সময় লাফ দিয়ে সি বেয়ে সে-ও নেমে পড়ল।

স্টেশনটা মাঠের মাঝখানে এবং প্রায় জনশূন্য। লোকালয় কোথায় কতদূর কে জানে। ক'টি যাত্রী নামল, নেমেই তারা কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল তাই বা কে বলবে।

রেল লাইন থেকে ওপরে খোয়া-বিছানো প্ল্যাটফর্ম। সেখানে আলো-টালো তেমন ে টিম টিম করে দূরে দূরে এক-আধটা জ্বলছে।

ছোট্ট স্টেশন; খুব সম্ভব লোকাল ট্রেন ছাড়া আর কিছুই এখানে ধরে না।

অমলেশ লক্ষ্য করল অ্যাসবেস্টসের ছাউনির তলায় এক ধারে স্টেশন মাস্টারের ঘর ত টিকিট-কাউন্টার, তাবপর মিটমিটে আলো জ্বালিয়ে একটা চায়ের দোকান, অবশেষে ওয়ে রুম।

নীলাও প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়েছিল, অমলেশ অন্ধকারে অন্ধকারে তাকে অনুসরণ করতে গেল। দেখল, স্টেশনের দিক দিয়ে সে গেল না। প্ল্যাটফর্মটাকে ঘিরে সারি সারি লোহার খুঁটি াতা আছে; অবশ্য সবগুলো নেই। জায়গায় জায়গায় খুঁটি তুলে বিনা টিকিটের যাত্রীদের তায়াতের সুবিধা করে রাখা হয়েছে।

নীলা একটা ফাঁক দিয়ে গলে ওধারে চলে গেল, অমলেশও তার পিছু নিল।

খুঁটিগুলোর ওপারে মাঠ। নীলা মাঠ ধরে স্টেশনের দিকে গেল। তারপর সেই ওয়েটিং ম্যার ভাঙা জানালা গলে ভেতরে অমলেশের মনে হল, এখানকার সব কিছুই নীলার জানা; এখানে রাত কাটাবার অভ্যাস তার আছে।

অমলেশ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এটা ওয়েটিং রুমের পেছন দিক। ভাঙা জানালা যেমন আছে খানে, একটা ভাল দরজাও আছে।

কী করবে, ভেবে পেল না অমলেশ। এদিকে টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কাছে দূরে ঝিঁঝিরা কটানা ডেকে যাচ্ছে। এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে ভিজে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

খানিক ইতস্তত করে স্টেশনের দিক দিয়ে দিয়ে অমলেশ দেখল ওয়েটিং রুমের সামনের জোয় তালা। তাই আবার পেছনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঘোরের মধ্যেই ঝরা আস্তে আস্তে টোকা দিল।

ভেতর থেকে তীক্ষ্ণ সচকিত চাপা গলার চিৎকার ভেসে এল, 'কে?'

অমলেশ বলল, 'আমি।'

নীলা শুধলো, 'আমি কে?'

'দরজা খুলুন—'

একটুপর দরজা খুলে গেল।

অন্ধকারে অমলেশকে চিনতে পারেনি নীলা। কড়া গলায় বলল, 'কে আপনি?'

কিছু না বলে পকেট থেকে একটা দেশলাই বার করে আলো জ্বালল অমলেশ। এবার তাকে তে পেল নীলা, সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ চমকে উঠল, 'আপনি! আপনি এখানে!'

অমলেশও অবাক হবার ভাণ করে বলল, 'আমারও তো সেই কথা। আপনি কি করে খানে?'

নিমেষে সামলে নিয়ে সহজ গলায় নীলা বলল, 'আর বলবেন না, আমার এক বন্ধু এখানে কে; এক সঙ্গে কাজ করি। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাকে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যখন টশনে এলাম তখন বীজপুরের লাস্ট ট্রেন চলে গেছে। কি আর করব, রাতটা এই ওয়েটিং মেই কাটাব ভেবেছিলাম।'

'আর আমার কী হয়েছে জানেন?'

'কী?'

তাড়াতাড়ি বানিয়ে বানিয়ে অমলেশ বলল, 'কলকাতা থেকে লাস্ট ট্রেনে ফিরছিলাম।'

'আপনি কলকাতায় গিয়েছিলেন!' নীলা চকিত হল।

'হ্যাঁ। অমলেশ তার চোখে চোখ রাখল, 'কলকাতায় সব কাজ সেরে লাস্ট ট্রেনে ফিরছিলাম।'

চাপা অস্থির গলায় নীলা শুধলো, 'লাস্ট ট্রেনে!'

'হ্যাঁ।' নীলার অস্থিরতা যেন লক্ষ্য করে নি এমনভাবে অমলেশ বলল, 'জানালার ধারে সে পার্সটা নিয়ে অন্যমনস্কের মতো লোফালুফি করছিলাম, আচমকা হাত ফস্কে পড়ে গেল। ড়াতাড়ি নেমে দেখি প্ল্যাটফর্মে পড়ে নি, ফাঁকে গলে একেবারে গাড়ির তলায় চলে গেছে।

বুঝতে পারছেন, গাড়ি চলে না যাওয়া পর্যন্ত আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হল।' একটু চুপ ক
থেকে আবার বলল, 'এর পর আর ট্রেন নেই। বাকি রাতটা এখানেই কাটাতে হবে। ভাবলা
ওয়েটিং রুমেই যাই।'

নীলা এতক্ষণে কথা বলল, 'ওয়েটিং রুমের দরজা তো ওদিকে। এধারে এলেন?'

অমলেশ বলল, 'ওদিকের দরজায় তালা দেওয়া। তাই ভাবলাম, ভেতরে ঢোকার অ রাস্তা যদি পাওয়া যায়। স্টেশন মাস্টারকে দিয়ে দরজা খোলাতে অবশ্য পারতাম; রাত্রিবে আবার যদি থাকতে না দ্যায়। অত ঝঞ্ঝাটে না গিয়ে ভেতরে ঢোকার একটা রাস্তা খুঁজছিলা মানে কারোকে না জানিয়ে রাতটা কাটিয়ে দেওয়া আর কি।'

নীলা তার কথা বিশ্বাস করল কি না, কে জানে। দেশলাইয়ের আলো নিভে গিয়েছিল, তা মুখ দেখতে পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ নীরবতা।

তারপর অমলেশই আবার বলল, 'এভাবে তো রাত কাটানো যাবে না। এখান খে বীজপুর ফেরার কোন উপায় নেই?'

নীলা বলল, 'মাঠের ওপর দিয়ে মাইলখানেক হাঁটলে বাস রাস্তা; সেখানে যেতে পার বীজপুরের লাস্ট বাস এখনও পাওয়া যেতে পারে। একা মেয়ে বলে আমি যেতে সাহ করিনি।'

'বেশ তো আমার সঙ্গে চলুন—'

'চলুন—'

যেতে যেতে অনেকক্ষণ পর অমলেশ বলল, 'এভাবে রাত্তির বেলা স্টেশনের ওয়েটিং রু রাত কাটানো আপনার উচিত না। বিপদ ঘটে যেতে পারে।'

নীলা আবছা গলায় কী বলল, বোঝা গেল না।

মাইল খানেক হাঁটার পর সত্যিই বীজপুরের লাস্ট বাস পাওয়া গেল। বাসে করে যে অমলেশ বলল, 'কাল আমি বোম্বাই চলে যাচ্ছি।'

পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে অমলেশের দিকে একবার তাকিয়ে নীলা চোখ নামাল, 'কালই!'

'হ্যাঁ। অনেকদিন তো কাটিয়ে গেলাম; ফিরে গিয়ে অফিস তো করতে হবে—'

নীলার সম্বন্ধে তার যা জানবার জানা হয়ে গেছে।

নীলা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অমলেশ আবার বলল, 'কাল সকালবেলা আপনা সময় হবে?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

'এখনই বলুন না—'

'না, কাল বলতে চাই। আর—'

'কী?'

'আপনাদের বাড়ি বসে না।'

'তবে?'

'অন্য কোথাও গিয়ে।'

'কাল আমাকে কলকাতায় যেতে হবে। কলকাতায় বলতে আপত্তি নেই তো?'

'না।'

'তা হলে একসঙ্গে আসা যাবে'খন।'

'আচ্ছা।'

একটু নীরব থেকে অমলেশ বলল, 'তবে—'

নীলা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল, 'বলুন।'

'কালকের দিনটা অফিস থেকে ছুটি নিতে পারেন?'

'কেন?'

'আপনার সঙ্গে কথা সারতে অনেকটা সময় লাগবে। তারপর অফিসে গেলে—' এই পর্যন্ত লে অমলেশ থামল।

খানিক ভেবে নিয়ে নীলা বলল, 'ঠিক আছে কাল কলকাতায় গিয়ে অফিসে একটা ফোন রে দেব'খন।'

২৩

কাল রাত্তিরেই অমলেশ বলে রেখেছিল, আজ চলে যাবে। নবেন্দুর বাবা আরো ক'দিন থকে যেতে বলেছিলেন। অমলেশ সবিনয়ে জানিয়েছে, আর থাকা সম্ভব নয়।

আজ সকালবেলা উঠে তাড়াতাড়ি স্নান-খাওয়া সেরে সবার কাছ থেকে বিদায় নিল অমলেশ। বেন্দুর মা, ঝুনু, মীনা, এমন কি নিতুও সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তা পর্যন্ত এল। হীরু বোমায় জখম বার পর সেই যে নিতু বাড়ি এসে ঢুকেছিল, আর বেরোয় নি। ঝুনু-মীনার চোখ সজল হয়ে ঠেছিল। অমলেশ মীনাকে বলল, 'ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ঝুনুকে বলল, নবেন্দুকে লব, আরো কিছু টাকা যেন পাঠায়। এটা সেপ্টেম্বর মাস। অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর—তিনটে াস বাড়িতে পড়। তারপর জানুয়ারিতে স্কুলে ভর্তি হয়ে যেও।' নিতুকে বলল প্রাইভেট রীক্ষা দিতে এবং মা-বাবা-দিদির বাধ্য হয়ে চলতে।

নবেন্দুর মা ভারী গলায় বললেন, 'ক'টা দিন আমাদের কাছে থেকে একেবারে ঘরের ছেলে য়ে গিয়েছিলে। আজ যাচ্ছ, খুব খারাপ লাগছে।'

অমলেশ কিছু বলল না। তারও খুব খারাপ লাগছিল। বিষণ্ণ হেসে বিছানা-বাক্স নিয়ে কটা রিক্সা ডেকে উঠে পড়ল। নীলাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল, সে অমলেশের পাশে বসল।

হাওড়া স্টেশনে এসে অমলেশ বলল, 'কোথায় বসে কথাটা বলা যায়, বলুন তো।

নীলা বলল, 'এখানেও বলতে পারেন।'

চারধারের অসংখ্য মানুষের ভিড়ের দিকে তাকিয়ে অমলেশ বলল, 'এখানে না। এত টগোলে আর ভিড়ে হবে না।'

'তবে কি নির্জনে বলতে চান?' গলার সুরে কাঁপন তুলে চোখের তারায় বিচিত্র হেসে মলেশের দিকে তাকাল নীলা।

অমলেশ তার কণ্ঠস্বর বা চোখের দিকে তেমন লক্ষ্য করেনি। বুকের ভেতর নিদারুণ এক স্থিরতা টগবগ করে ফুটছিল! বলল, 'হ্যাঁ, নির্জন হলে ভাল হত।'

'তা হলে এক কাজ করা যাক, গড়ের মাঠেই যাই।'

'বেশ।'

নীলা আর অমলেশ ট্যাক্সি করে গড়ের মাঠে এল। গড়ের মাঠ আগেই চেনা হয়ে গিয়েছিল মলেশের। কিন্তু জায়গাটা তার পছন্দ হল না। সে যা বলতে চায় তা যেন এই বিশাল স্তৃতির সঙ্গে খাপ খায় না।। বলল, 'অন্য কোথাও চলুন—'

নীলা অর্থময় সুরে বলল, 'আরো নির্জনে?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে লেকের পাড়ে চলুন।'

'সেটা কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবেন।'

লেকে এসেও জায়গাটা মনঃপুত হল না। অমলেশ যা বলতে চায় তার প্রতিক্রিয়া ঘটবে এবং সেটা সাংঘাতিক। কাজেই তার জন্য সবার চোখের আড়ালে চারদিক ঘেরা কোন জায়গা চাই।

নীলা ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'এ জায়গাটা পছন্দ তো?'

অমলেশ মাথা নাড়ল।

নীলা কপট ক্লান্তির সুরে বলল, 'আপনার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে আর পারি না। এখানেই বলুন আপনি—'

'আমি কী?'

চকিত তড়িতময় চোখে একবার দেখে নিয়ে খুব নিস্পৃহ সুরে নীলা বলল, 'আপনি কী বলবেন তা আমি জানি।'

'জানেন।'

'জানি বৈকি। ও সব শোনার অভ্যাস আমার আছে। আমার সঙ্গে যে ছেলে দুদিন মেশে সে-ই ও সব বলে। আপনি বলে যান—'

'এখানে না। চলুন, একটা ভাল জায়গার কথা মনে পড়েছে—'

ক্লান্তভাবে এবং খানিক অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন উঠে দাঁড়াল নীলা। বলল, 'চলুন—' এবং থেমে আবার বলল, 'যাই বলুন না কেন, আমি কিছুই মনে করব না।'

সেই হোটেলটার কথা মনে পড়ে গেল অমলেশের। বোম্বাই থেকে এসে এখানেই প্রথম উঠেছিল সে। নীলাকে নিয়ে সোজা সেখানে চলে গেল।

হোটেল ম্যানেজার অমলেশকে দেখে অবাক। বলল, 'বোম্বাই যান নি!'

'না। যাওয়া হল না।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে অমলেশ শুধলো, 'আমার সেই ঘরটা খালি আছে?'

'আছে।'

খুলে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি আজকের দিনটা থাকব।'

ঘরটা হোটেলের দোতলায়। নীলাকে একটা চেয়ারে বসিয়ে অমলেশ বিছানায় বসল।

নীলা বলল, 'বোম্বাই থেকে এসে এখানে উঠেছিলেন বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

খানিক নীরবতা।

তারপর নীলা বলল, 'এবার বলুন—'

সঙ্গে সঙ্গে শুরু করল না অমলেশ। মনের ভেতর বক্তব্যটা গুছিয়ে নিয়ে একসময় শিথিল সুরে বলল, 'কথাটা নবেন্দুকে নিয়ে। আপনি এতদিন যা জানতে চেয়েছিলেন—'

খুব আস্তে করে নীলা বলল, 'দাদা!'

অমলেশ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

এবার চকিত স্বরে নীলা বলল, 'কী, কী কথা?'

অমলেশ তক্ষুনি কিছু বলতে পারল না। আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে রাস্তার দিকে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে অমলেশ। অনুভব করছে, নীলার চোখ দুটো তীরের মতো তার পিঠে বিঁধে যাচ্ছে।

অমলেশের উঠে আসার ভেতর সাংঘাতিক কোন ইঙ্গিত ছিল। নীলা রুদ্ধ অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'দাদার কী হয়েছে বলুন---'

ঘুরে দাঁড়িয়ে অমলেশ বলল, 'আপনি অত অস্থির হবেন না। ভেঙে পড়লে চলবে না।'

'না-না, আমি ঠিক আছি। ভেঙে পড়ছি না। আপনি বলুন---' মাস কয়েক আগে নবেন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপের সময় থেকে পুলিশের গুলিতে তার মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত সব ঘটনা যেন ঘোরের ভেতর বলে গেল অমলেশ।

নিমেষে নীলার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। ঠোঁট এবং গলার কাছটা থরথর করতে লাগল। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ ভাঙা গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল, 'দাদা মরে গেছে!' বলেই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

নীলা কাঁদছে। অমলেশ বাধা দিল না, সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল না। মেয়েটা কাঁদুক, কেঁদে হাল্কা হোক।

অনেকক্ষণ কাঁদার পর শোকের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস স্তিমিত হলে নিষ্প্রাণ আচ্ছন্নের মতো মুখ ঢেকে বসে থাকল নীলা। মেয়েটার জন্য অসীম মমতায় অমলেশের মন ভরে গেছে। আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে তার মাথায় একখানা হাত রেখে সে ডাকল, 'নীলা---'

নীলা মুখ তুলল। তার দু চোখ আরক্ত, ফোলা ফোলা গালের ওপর দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। ঝাপসা গলায় সে বলল, 'আমি জানতাম, সর্বনাশ কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু দাদা যে পুলিশের গুলিতে মরবে, ভাবিনি। আমাদের সংসারের জন্য ও মরল।'

অমলেশ চুপ করে রইল।

অসহ্য আবেগে নীলা বলতে লাগল, 'এখন আমি কী করি। কেমন করে এ খবর মা-বাবাকে দেব? আপনি বলে এসেছেন, সে ভাল আছে, টাকা পাঠিয়েছে। এরপর কী করে তার মৃত্যুর কথা বলব?'

অমলেশ বুঝল, অনিচ্ছায় যে অপরাধ করে ফেলেছে তার ক্ষমা নেই।

অনেকক্ষণ নীরবতা। এর ভেতরে শোকের আবেগটাকে অনেকখানি শান্ত করে নিল নীলা। বলল, 'এ কথা এখন বাড়িতে বলা যাবে না। এখন কেন, এ খবর বেশ কিছুদিন গোপন রাখতে হবে। দাদা মা-বাবার সব চাইতে প্রিয় সন্তান; তার মরার খবর শুনলে ওঁরা বাঁচবেন না।'

'কিন্তু—' বলেই থেমে গেল অমলেশ।

নীলা বলল, 'আপনি কী বলতে চান, বুঝেছি। কতকাল আর ব্যাপারটা গোপন রাখা সম্ভব, তাই তো?'

'হ্যাঁ।' অমলেশ মাথা নাড়ল।

'যতদিন পারা যায়।' বলতে বলতে হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল নীলার 'আপনি এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবেন?'

'কীভাবে?'

'দাদা মাসে মাসে আমাদের টাকা পাঠাত। সে নেই, এখন আর কে পাঠাবে। ভাবছি প্রত্যেক মাসে আপনার নামে কিছু টাকা পাঠাব; আপনি সেই টাকাটা দাদার নাম করে আমাদের পাঠাবেন। আমাদের সব গেছে—মান-মর্যাদা-দেশ, সর্বস্ব। দাদা আছে—এই ছলনাটুকু দিয়ে

অন্তত মা-বাবাকে বাঁচাতে চেষ্টা করি। কিছুতেই না বলতে পারবেন না।'

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে গেল অমলেশ।

নীলা আবার বলল 'একটা কথা—'

'কী?'

'আপনার কাছে আমাদের কিছু ঋণ আছে, সেটা এক্ষুনি শোধ করতে পারব না।'

'আমার কাছে আবার কিসের ঋণ?'

'বা রে, আপনি এসেই দাদার নাম করে মাকে দেড়শ টাকা দিলেন না? যখন পারব, টাকাটা শোধ করব।'

'কিন্তু—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই নীলা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি কী বলবেন জানি। এমনিতেই ঐ টাকাটা পেয়ে এ সময় আমাদের খুব উপকার হয়েছে, তার ওপর যদি ফেরত দিতে না বলেন নিজেদের কাছেই সম্মান থাকে না।'

অমলেশ চুপ করে থাকল।

সেই দুপুরবেলা এসেছে দুজনে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যে নেমে গেল।

নীলা বলল, 'এবার যাই।'

নীলা উঠতে যাবে, সেই কথাটা মনে পড়ে গেল অমলেশের। বলল, আরেকটু বোসো—'

নীলা বলল, 'দরকার আছে?'

'হ্যাঁ।'

নীলা শুধলো, 'কী?'

একটু ভেবে অমলেশ বলল, 'নবেন্দুর কথা সব বললাম। কিন্তু আমার সেই প্রশ্নটার উত্তর কিন্তু পাই নি।'

'কোনটার?'

'সেদিন রাত্রিটা তুমি কোথায় কাটিয়ে এসেছিলে?'

মুখ নামিয়ে নীলা চুপ করে রইল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। তারপর খুব কাছে এসে অমলেশ বলল, 'ঐ লোকটা কে?'

চোখ না তুলেই নীলা বলল, 'কোন্ লোকটা?'

'ঐ যে বর্ডারের কাছে, জঙ্গলের ভেতর পরশুদিন যার সঙ্গে কথা বলছিলে, তোমার হাতে কী যেন—'

অমলেশের কথা শেষ হবার আগেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়াল নীলা। চাপা ভীত গলায় বলল, 'আপনি—আপনি জানলেন কী করে?'

গম্ভীর মৃদু গলায় অমলেশ বলল, 'আমি সবই জানি।'

কয়েক পলক চোখের তারা স্থির হয়ে রইল নীলার। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে আবার বসে পড়ল। তার ঘাড়, মাথা, হাত-পা—সব ভেঙে চুরে যেতে লাগল যেন। অমলেশ আবাব বলল, 'ঐ লোকটা স্মাগলার?'

সজ্ঞানে না, ঘোরের ভেতর বুঝি মাথাটা একদিকে হেলিয়ে দিল নীলা।

অমলেশ বলতে লাগল 'তুমি এর মধ্যে এলে কেন?'

ভাঙা ভাঙা ঝাপসা গলায় নীলা বলল, 'না এসে কী করি। দাদা টাকা পাঠাতে পাঠাতে হঠাৎ ক'মাস বন্ধ করল। তখন সংসার চলে কেমন করে? তাই—'

'একটা চাকরি-বাকরি করলেও তো পারতে—'

'ক্লাস নাইন-টেন পর্যন্ত পড়েছি। ঐ বিদ্যেয় বাঙলাদেশের চাকরি হয় না। যা করছি তার বেশি কিছু জোটানোও সম্ভব হয় না। অবশ্য আরেকটা পুরনো রাস্তা খোলা ছিল—'

'কী?'

'বুঝতে পারছেন না?'

এবার পারল অমলেশ; সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠল।

নীলা বলতে লাগল, 'কে বলতে পারে, একদিন হয়তো ঐ পথেও গিয়ে আমাকে দাঁড়াতে হবে।'

তক্ষুনি কিছু বলল না অমলেশ। একটু ভেবে শুরু করল, 'তুমি যা করছ, তাতে ভীষণ বিপদ।'

'জানি।'

'পুলিশ পেছনে লেগেই আছে।'

'তা আছে।'

'এর পরিণাম কী জানো?'

'জানি।'

'নবেন্দু মারা গেছে; তোমার এসব ছেড়ে দেওয়া উচিত—'

'এসব ছাড়লে সংসার ধ্বংস হয়ে যাবে। কে দেবে আমাকে টাকা?'

এর উত্তর অমলেশের জানা নেই। সে বলল, 'পুলিশ পেছনে লাগলে সেদিনকার ঐ ভাঙা ওয়েটিং রুমটার মতো জায়গায় বুঝি রাত কাটাও?'

নীলা মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ। ঐ রকম জায়গা আমার অনেক জানা আছে।'

অসীম অপার মমতায় মন ভরে গিয়েছিল অমলেশের। কিন্তু মেয়েটাকে চারপাশের আগুন থেকে কিভাবে বাঁচানো যায়, ভেবে পেল না।

এক সময় নীলা বলল, 'এবার আমি যাই।'

অমলেশ বলল, 'চলো, তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসি।'

'আপনি আবার কষ্ট করে যাবেন?'

'কষ্টের আর কী—'

নীলা আর কিছু বলল না। বাধ্য মেয়ের মতো অমলেশের সঙ্গে হাওড়ায় এল।

তাকে বীজপুরের ট্রেনে তুলে দিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াল অমলেশ।

ধরা-ধরা ভাঙা গলায় নীলা শুধলো, 'কালই বোম্বাই যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। এখানে আর থাকার উপায় নেই।'

কী বলতে গিয়ে থেমে গেল নীলা।

অমলেশ বলল, 'কিছু বলবে?'

চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল নীলা, অর্থাৎ বলবে না।

অনেকক্ষণ থেকে একটা কথা বলবে বলবে ভাবছে অমলেশ; বলার সুযোগ পাচ্ছে না। ট্রেন ছাড়ার মুখে হঠাৎ বলেই ফেলল, 'সংসার ধ্বংস হয়ে যাবার কথা বলছিলে না—'

'হ্যাঁ—'

'তোমার এখন অনেক দায়িত্ব নীলা, অনেক দায়। নবেন্দু নেই। অতগুলো মানুষ তোমার মুখ চেয়ে আছে। তোমার যদি কোন বিপদ-আপদ ঘটে যায় তখন কেউ বাঁচবে না। সংসার

ভেসে যাবে। তাই বলছিলাম, আমার কথাটা আরেকবার ভেবে দেখো—ঐ পথটা ছাড়তে পার কিনা—'

বিষণ্ণ করুণ চোখে অমলেশের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে গেল নীলা; ঠিক সেই সময় হুইসিল দিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিল।

২৪

যে জন্য অমলেশের বাঙলাদেশে আসা তা তো মিটেই গেছে। নবেন্দুব মৃত্যু-সংবাদ দেওয়া হয়েছে। এবাব সে ঝাড়া হাত-পা; অনায়াসেই বোম্বাই পাড়ি দিতে পারে।

পবেব দিন বোম্বাই রওনাও হল অমলেশ। যেতে যেতে প্রতিজ্ঞা করল, আর কখনও এ দেশে ফিরবে না, এখানকার কথা ভাববে না। অকারণে নিজের মনকে নিজের স্নায়ুকে পীড়িত করে কী লাভ?

নবেন্দুর কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে একদিন বাঙলাদেশে ছুটে এসেছিল; সে সাধ তার মিটেছে।

ঠিক করেছিল, এখানকার কথা ভাববে না। কিন্তু বাঙলাদেশ ক'দিনে তার সত্তায় এমন ঢেউ তুলে দিয়েছে যে সাধ্য কী, না ভেবে পাবে। বোম্বাইতে ফেরার পর একটু অন্যমনস্ক হলেই বাঙলাদেশের দূর মফঃস্বলে রিফিউজি কলোনির একধারে একটা টিনেব বাড়ি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। ঝুনু-মীনা-হীরু-নিতু, পক্ষাঘাতে অসাড় মহীতোষ চাটুজ্জে, নবেন্দুর মা—এই চালচিত্রেব ওপর সেই মেয়েটা, নীলা যার নাম—ফুটে ওঠে। তাদেব সবার কণ্ঠস্বর, চলাফেরার শব্দ যেন শুনতে পায় অমলেশ।

তা ছাড়া না ভোলার আবেকটা ব্যবস্থা তো নিজেই করে এসেছে অমলেশ। সেই টাকা পাঠাবার ব্যাপারটা—

নিয়মিত প্রতি মাসে টাকা পাঠিয়ে যাচ্ছে নীলা। নবেন্দুব নাম কবে সেই টাকা আবার নীলাদের কাছেই ফেরত পাঠাচ্ছে অমলেশ। একদিন অলৌকিকের হাতের ঘুঁটি হয়ে বীজপুর ছুটে গিয়েছিল; এখনও সেই ঘুঁটি হয়েই ঘুরছে।

শুধু টাকাই পাঠায় না নীলা, প্রায়ই চিঠি লেখে। সংসারের সব খবরই সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানায়।

কলকাতা থেকে ফেবার পব দেখতে দেখতে মাস আষ্টেক কেটে গেল। ঝুনু দীপক বলে একটা ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গেছে। মহীতোষ চাটুজ্জের বাঁ দিকেব পক্ষাঘাত ডান দিকেও সংক্রামিত হতে শুরু করেছে। তাব মায়েব লো প্রেসার। হীরু আর নিতু ছেনতাইয়ের দলে নাম লিখিয়েছে। এর মধ্যে রুপোলি রেখার মতো একটু আশার খবর, অজয় মীনাকে বিয়ে করেছে।

অসংখ্য, অজস্র চিঠি। আট মাস ধরে অনবরত লিখতে লিখতে কবে যে চিঠিগুলোতে ভিন্‌ভাবের রং লেগেছে, অমলেশরা টের পায় নি। তারা এখন আর পরস্পরকে 'আপনি' লেখে না, সম্ভাষণের ভাষাটা 'তুমি' হয়ে গেছে।

আটমাসের পর আরো মাসকয়েক কাটল। তারপব নীলার সেই চিঠিটা এল, মর্মান্তিক নিদারুণ চিঠি।

নীলা লিখছে।

প্রিয় অমলেশ,

কিভাবে আমি টাকা রোজগার করি, তোমার অজানা নেই। আমি স্মাগলার। সব চাইতে ঘৃণিত, সব চাইতে নিকৃষ্ট জীব। আমাদের মতো মেয়েরাই সুস্থ সমাজের গায়ে পচন ধরিয়ে দ্যায়। জীবনের আলোকিত রাজপথটার উল্টোদিকে যে অন্ধকার অলি-গলি, সেখানে বুকে হেঁটে হেঁটে সরীসৃপের মতো আমাকে চলতে হয়। এ পথে আসার পরিণাম আমার অজানা ছিল না, তোমারও না।

যা অনিবার্য তাই ঘটে গেছে। তুমি তো জানো, পুলিশ আমার পেছনে লেগে আছে। শেষ পর্যন্ত আমি ধরা পড়েছি। আপাতত জামিনে ছাড়া পেয়েছি, তবে জেলে আমাকে যেতেই হবে। কম করে ছ' মাসের ঘানিটানা কেউ ঠেকাতে পারবে না।

জেলে যেতে আমার ভয় নেই। কিন্তু সে ক'টা মাস সংসার কিভাবে চলবে, ভেবে পাচ্ছি না। তুমি যদি এসময় একবার আমাদের এখানে আসতে অনেকখানি ভরসা পেতাম। আসবে না জানি, তবু দিন্ গুনতে দোষ কি? ইতি।

নীলা

চিঠিটা তিন-চার বার পড়ল অমলেশ। তারপর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। আর সেই স্তব্ধতার ভেতরেই কর্তব্য স্থির করে ফেলল। নীলার যদি জেল হয়, সেই ক'মাসের টাকা সেই পাঠাবে। আর বাঙলাদেশে তাকে আরেকবার যেতেই হবে। নীলার পাশে এখন যদি না গিয়ে দাঁড়ায় কবে আর দাঁড়াবে?

জীবনের প্রথম তিরিশটা বছর বাঙলাদেশ অমলেশের স্মৃতিতে ছিল, অনুভূতিতে ছিল না। তারপর একদিন খেয়ালের বশে নবেন্দুর কথার সত্যাসত্য যাচাই করতে বীজপুর ছুটে গিয়েছিল; গিয়েই টের পেয়েছিল একটা পিঞ্জরে এসে পড়েছে। সাধ করে যে ফাঁস গলায় পরেছিল তা ছেঁড়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

বীজপুরের সেই পিঞ্জরটা থেকে বেরুবার কোন পথ তার সামনে খোলা নেই। নীলা যতবার হাতছানি দেবে ঘুরে ঘুরে ততবার তাকে সেখানে ফিরে যেতে হবে।

রাজা

বুদ্ধকে

এক

জেলা পেছনে ফেলে খাড়া দক্ষিণে মাইল পঞ্চাশেক পাড়ি দিতে পারলে আরুলকোটের। তিন হাজার একরের এই বনভূমিটুকু বুরহনগড় স্টেটের খাস সম্পত্তি।

এখান থেকে পশ্চিমে তাকালে রুপোলি হাঁসুলির চকিত একটি রেখা চোখে পড়ে—ওটা াড়ী নদী ঝিলকি। পুবদিকে টিলার পর টিলা; তার ওপারে সরকারি রিজার্ভ ফরেস্ট। আরো ণে আকাশের নীল আর বনের সবুজ যেখানে একাকার সেখানে সারি সারি ধূসর াড়—রামায়ণে যে চিত্রকূট রেঞ্জের উল্লেখ আছে এ তা-ই।

আরুলকোটের আদি বাসিন্দা বলতে শালের গাছ! শালই বেশি। তা ছাড়া আছে প্যাডক, চুগলুম। অল্প স্বল্প অশোক, আমলকি, রঙ্গন আর সিসু। এর ওপর ঝোপ-ঝাড় তো ছই। আরুলকোটের জঙ্গল বেশ ঘন, নিবিড়।

শুধু গাছপালাই না, অনেক কাল থেকে আরো কেউ কেউ এখানকার দখল নিয়ে বসে ছ। তারা হল চিতল হরিণ, বুনো মোষ, সম্বর, দাঁতাল শুয়োর। কিছু কিছু চিতাও আছে। আছে বুনো টিয়া, ধনেশ, তিতোঁরা এবং বন-পায়রার ঝাঁক। বংশ-পরম্পরায় এরা লকোটের জঙ্গলে নিজেদের স্বত্ব কায়েম করে আছে।

সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপারটা এই রকম। পুবদিকের সরকারি রিজার্ভ ফরেস্ট আর লকোটের জঙ্গলের মাঝখানে দেওয়াল তোলা নেই। সীমারেখা বোঝানোর জন্যে পাথরের টি ফলক পোঁতা রয়েছে। মানুষের আইন জঙ্গলের রাজ্যে অচল; তাই প্রায়ই রিজার্ভ ফরেস্ট কে চিকরি হরিণ আর বাইসনেরা আরুলকোটের জঙ্গলে হাওয়া বদল করতে আসে। এপারের টিয়া এবং ধনেশ পাখিরা ওপারের আকাশে গিয়ে চক্কর দেয়। কোন আদালতের সাধ্য দু-পারের এই 'অনধিকার প্রবেশ' বন্ধ করতে পারে।

অক্টোবর মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। নিয়ম অনুযায়ী মধ্য-ঋতু শরতের পর এখন ন্তের শুরু। নামেই হেমন্ত, আরুলকোট কিন্তু প্রাণ ধরে শরৎকালটাকে বিদায় দিতে পারে নিজের সর্বাঙ্গে ভাদ্র-আশ্বিনের স্মৃতি সে সাজিয়ে রেখেছে।

আকাশের নীল এত ঝকঝকে যে সেদিকে তাকিয়ে থাকবে সাধ্য কি। চোখ তুলেই সঙ্গে নামিয়ে নিতে হবে। রোদের কলস উপচে চারদিকে সোনার ঢল নেমেছে।

হেমন্তের শুরুতে আরুলকোটে ফুল ফোটার ধুম পড়ে যায়। দুধলি, গুলগুলি, রঙ্গন, অশোক— রঙের ফুলসাজে বনভূমি যেন নাটকের অভিসারিণী নায়িকার মত উন্মুখ হয়ে আছে। ঝোপের আড়ালে কোথায় যেন বুনো চাঁপা ফুটেছে। তাদের উগ্র গন্ধে বাতাস ভারী, মন্থর, প্রমত্ত।

রহনগড়ের মহারাজা এবার নিতান্ত অসময়ে আরুলকোটের জঙ্গলে শিকারে এলেন। নাম—হিজ হাইনেস, পরম ভট্টারক, বিশ্ববন্দিত, দেশপূজিত, দাতা, ভোক্তা, আশ্রিতবৎসল, নুরঞ্জক, শত্রুত্রাসন, মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীমান দ্বিতীয় বিক্রমজিৎ সিং বাহাদুর, কে-টি,

সি-আই-ই। ভারত স্বাধীন হবার পরও নামের অন্তে ইংরেজ-আমলের খেতাব কে-টি, সি-অ
ইটা সগৌরবে লিখে থাকেন।

আদি এবং অন্তে খেতাব আর উপাধি মিলিয়ে নামটা প্রায় আড়াই ফুটের মত ল
সংক্ষেপে হিজ হাইনেস বিক্রম সিং অফ বুরহনগড়। আরো সংক্ষেপে মহারাজা বুরহনগ

পূর্বতন মহারাজা অর্থাৎ দ্বিতীয় বিক্রম সিংয়ের পিতা উজ্জ্বল সিংয়ের দেহান্ত হয়
বছর আগে; বিক্রম সিং তখন উনিশ বছরের প্রিন্স—যুবরাজ। বাবার মৃত্যু হলে বুরহন
তাঁকে রাজার আসনে বসিয়েছে।

রাজা হবার পর ভাদ্রে একবার, বসন্তে হোলির দিনে একবার—বছরে মোট দু

শিকার একটি। আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির মতো বছরে দুবার আরুলকোটে আসা বি
সিংয়ের জীবনে নিয়ম হয়ে গিয়েছিল।

এ-বছরটা কিন্তু ব্যতিক্রম।

যথারীতি ভাদ্রে একবার এসে গেছেন বিক্রম সিং। তারপর বসন্তে হোলির দিন পর্যন্ত
অপেক্ষা করেন নি। তার অনেক আগে হেমন্ত পড়তে না-পড়তেই আবার এলেন।

বুরহনগড় স্টেটের মহারাজ বিক্রম সিং কেন এবার বিশ বছরের নিয়ম ভেঙে অস
মৃগয়ায় বেরিয়েছেন, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এর উত্তর পেতে হলে বুরহনগড়ের সাম্প্রতিক ইতিহা
দিকে চোখ ফেরাতে হবে।

বুরহনগড় স্টেটের জন্ম কবে, কত শকাব্দে, অতীতের কোন্ কুয়াশাবিলীন তারিখে
হদিস পাওয়া দায়। তবে হিন্দুযুগের স্বর্ণময় দিনগুলোতেই যে তার প্রতিষ্ঠা তাতে সংশয়
তারপর ভারতবর্ষে মোগল এসেছে, পাঠান এসেছে, ইংরেজ এসেছে, অবশেষে দীর্ঘদিন পদা
থাকার পর শৃঙ্খলিত ভারত স্বাধীনও হয়েছে।

মহাদেশের মত বিপুল এই ভারতবর্ষ জুড়ে কত ঢেউ উঠেছে, কত ঝড়, কত রক্তপ
ন, বিপ্লব—কিন্তু বুরহনগড় স্টেটের সে-সব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। চারদি
উঁচু উঁচু দেওয়াল তুলে তার ভেতর সামন্তযুগের আরকে ডুবেছিল বুরহনগড়। বাইরের হাজা
বিবর্তন, হাজারো ঝড় চারদিকের দেওয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে গেছে। ভেতরে ঢোকার এত
পথ পায় নি।

উনিশ বছর বয়েসে যখন রাজত্ব হাতে পেয়েছিলেন বিক্রম সিং। তখন ইংরেজ আম
রাজ্যলাভের তিন বছরের ভেতরেই 'নাইট' খেতাব পেয়েছেন। সেই সঙ্গে সি. আই. ই. অ
কম্পেনিয়ন অফ দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার। দাসত্ব নয়, যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না
ব্রিটিশরাজ তাঁকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়েছিলেন। এত কম বয়েসে ভারতবর্ষের কেউ এমন দু
সম্মান পায় নি।

বিচক্ষণ একটি মন্ত্রিসভা ছিল, তাঁরাই রাজ্য চালাতেন। কাজেই রাজত্ব হাতে আসার
রাজমুকুটের ভারে ঘাড় ভেঙে যায় নি।

দেশ শাসন করতেন মন্ত্রীরা। তরুণ রাজার কাজ ছিল মৃগয়া, নারীবিলাস, পোলো খে
মদ্যপান আর ইংরেজি খানায় ইংরেজি বলায় ইংরেজি চালে চলায় দুরস্ত হওয়া। ইংরেজিআ
চৌখস হবার জন্য বিপুল অঙ্কের মাইনে দিয়ে খাস বিলিতি সাহেবকে রেখেছিলেন। ইংরে
কেতা রপ্ত হলে বছরে তিন-চারবার হাওয়া বদল করতে লন্ডন-প্যারিস যেতেন। অর্থাৎ ন
রাজাধিরাজের কাজের মত কোন কাজই ছিল না।

দিনগুলো মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই কেটে যাচ্ছিল। অন্তত দুশ্চিন্তা করার মত কিছুই ঘটে

স্বাধীন হবার পরও বেশ কিছুদিন পুরনো নিয়মে পুরনো চালেই কেটে গেছে। সামান্য পরিবর্তনটুকু হয়েছে তা প্রায় অনুল্লেখ্য। আগে লন্ডন-প্যারিস পাড়ি দিতেন। আজকাল তার ; নতুন একটা ঠিকানা যোগ হয়েছে—নঈ দিল্লী।

দিল্লীতে ছোটাছুটির ফল খারাপ হয় নি—ওখানেও বন্ধু-বান্ধব জুটেছে। হিজ হাইনেস রাজা অফ বুরহনগড়ের অন্তরঙ্গতার তালিকায় ক'টি দিশী নাম যুক্ত হয়েছে।

এই পর্যন্ত ব্যাপারটা ভালই, অন্তত অভিযোগ করবার কিছুই নেই। কিন্তু কিছুদিন হল থায় যেন তাল কাটতে শুরু করেছে। নঈ দিল্লীর গণতন্ত্রী মার্কা নতুন শাসকেরা হঠাৎ ধুয়ো ছেন, নেটিভ স্টেটগুলোর অস্তিত্ব লোপ করে ভারত-দেহে একাকার করে নেবেন। তার ড়জোড়ও শুরু হয়ে গেছে।

স্বাধীন ভারতের নতুন নাম আপাতত ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন, খুব শিগগিরই এ দেশ রিপাবলিক ; এক কথায় প্রজাতন্ত্রী ভারত। এ দেশ এখন 'অফ দি পীপ্‌ল, বাই দি পীপ্‌ল, ফর দি ল্'।

জনগণের এই রাষ্ট্রে নেটিভ স্টেটগুলো নাকি কুৎসিত ক্ষতচিহ্নের মতো। রাজতন্ত্রের মোহর গায়ে এঁটে মূর্তিমান অসম্মানের মতো তারা জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওগুলোকে ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া যায় ততই নাকি মঙ্গল।

অতএব এতকাল মসৃণ নিয়মে চলতে চলতে হিজ হাইনেস মহারাজা অফ বুরহনগড়ের ন প্রবল ঝাঁকুনি লেগে হঠাৎ থমকে গিয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলি পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে —এই প্রতিশ্রুতি কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দিল্লী ছুটেছিলেন। উদ্দেশ্য : গুজবটা খানি সত্যি যাচাই করে আসা। একা বিক্রম সিংয়েরই না, তাবত দেশীয় রাজ্যের অকাল রব ছায়া পড়েছে। সব জায়গাতেই সিংহাসনের তলায় মাটি দুলে উঠেছে।

কাজেই একা বিক্রম সিং নন, বরোদা-পাতিয়ালা-জয়পুর-মহীশূর-কুচবিহার-হোলকার—র-দক্ষিণে পুবে-পশ্চিমে, আর্যাবর্তে-দাক্ষিণাত্যে যত নৃপতি আছেন সবাই এসেছিলেন। ঃ বাদ যান নি।

গুজবটা যাচাই করতে গিয়ে চোখের তারা স্থির হয়ে গিয়েছিল। কথায় বলে যা রটে তার সত্যি, বেশির ভাগ মিথ্যে। কিন্তু এই জনরবটা ষোল আনার জায়গায় আঠারআনা সত্যি। গণওলারা প্রতিজ্ঞা করেছেন, যেভাবেই হোক নেটিভ স্টেটগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। রাজন্যকুল জোট বেঁধে অনেক দরবার করেছেন। হোম মিনিস্টার, প্রাইম মিনিস্টার, ছোট-মাঝারি রাজনৈতিক নেতা, সবার সঙ্গে দেখা করেছেন। কিন্তু আবেদন-নিবেদন-ধর্না, কোন তেই ফল হয় নি; পাথর গলে নি। আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দূরে থাক, তার বদলে যে খবর যা গেছে তাতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে। ভারত-সরকার নাকি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশীয় গুলির দখল নেবেন। 'একসেশন অব ইন্ডিয়ান স্টেটস'—বলে নিদারুণ এক দৈববাণী কদিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। সেটা যতক্ষণ না কাজে লাগানো যাচ্ছে ততক্ষণ ন্ত্রওলাদের ঘুম নেই।

ব্যর্থ বিফল নরপতির দল অসীম হতাশা নিয়ে নঈ দিল্লী থেকে বিদায় নিয়েছেন। বিক্রম ওও পড়ে থাকেন নি; ট্রেনের কামরা রিজার্ভ করে বুরহনগড়ে ফিরে এসেছেন।

ফেরার পর কিছু ভাল লাগছিল না বিক্রম সিংয়ের। চলতে-ফিরতে-উঠতে-বসতে একটা রনা ছায়া সর্বক্ষণ তাঁর পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করেছিল। খেতে ভাল লাগত না তাঁর, তেও না। গল্‌ফ, পোলো, বোতল ভর্তি বিলিতি সুধা, সুস্বাদু নারীদেহ—কোন কিছুই তাঁর রতা দূর করতে পারেনি।

রাজত্ব থাকবে না, মন্ত্রিসভা থাকবে না, সেনাদল থাকবে না, প্রজাদের আনুগত্য থ না। সবার ওপরে যে রাজ-সম্মান, তাও থাকবে না। 'একসেশন অব ইন্ডিয়ান স্টেটস'—ব সত্যিকার চেহারা নেবার সঙ্গে সঙ্গে চোখের সামনে থেকে ভোজবাজির মত সব নিশ্চিহ্ন যাবে। ভজন আহীর অথবা বুধুয়া জেলের মতো অতি সাধারণ তুচ্ছাতিতুচ্ছদের দলে পৃ পালক, বিশ্ববন্দিত, দাতা, ভোক্তা শ্রীল শ্রীমান হিজ হাইনেসকে একাকার হয়ে যেতে কারো সঙ্গেই তাঁব প্রভেদ থাকবে না। কথাটা যত ভেবেছেন ততই মাথা উত্তপ্ত হয়ে উ কপালের দু-পাশে রক্তবাহী শিরাগুলো পাগলা ঘোড়ার মত সমানে লাফিয়ে গেছে। মনে হ যেকোন মুহূর্তে ওগুলো ছিঁড়ে পড়বে। অথচ শক্তিমান ভারতসরকারের বিরুদ্ধে কিছুই ক নেই। অসহায় অক্ষম আক্রোশে নিজেকে শুধু জর্জরিত ক্ষতবিক্ষতই করে তুলেছেন ি সিং। বার বার তাঁর মনে হয়েছে, এর চাইতে ইংরেজ-শাসন ছিল হাজার গুণ শ্রেয় এবং দিক থেকে কাম্য। রাজতন্ত্রের মহিমা তারা বুঝত; মর্যাদাও দিতে জানত। বংশবদ দাসা নয়; বিক্রম সিং ছিলেন তাদের বন্ধু, সহযোগী। কম্পেনিয়ন অফ দি ইন্ডিয়ান এম্পায়ার। পড়ে কোন ইংরেজ-অফিসার দরবারে এলে বুরহনগড়ের দশটা প্রজার মতো জুতো এবং খুলে রীতিমত কুর্নিশ ঠুকে রাজ-সম্মান জানাত। দিল্লীতে ভাইসরয়ের ভোজ-সভায় যে আপ বন্ধুর মতো যে ব্যবহার পাওয়া যেত তার তুলনা নেই। সে সব সুখের স্মৃতি এখন বড় করে মনে পড়েছে। মনে মনে বিক্রম সিং সে-আমলের সঙ্গে এ-আমলের তুলনামূলক ি যত করেছেন ততই ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন।

এতকালের মসৃণ স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ত জীবনটায় ঝড় উঠেছে। একটু অন্যমনস্ক হতে না পা উন্মাদ হয়ে যাবেন বিক্রম সিং। চাক চাক বরফের মত ভাবনার ভার মনের ওপর অনড় আছে। তার হাত থেকে মুক্তি চাই। মনটাকে কিছুদিনের জন্য চিন্তাশূন্য করতে না পা বিক্রম সিং বাঁচবেন না।

বুরহনগড়ে থাকলে দুর্ভাবনা তাঁর সঙ্গ ছাড়বে না। তাই একদিন লোকজন নিয়ে রণ- সেজে আরুলকোটের জঙ্গলে মৃগয়ায় বেরিয়ে পড়েছেন।

দুই

হিজ হাইনেস, পৃথিবী-পালক, বিশ্ববন্দিত ইত্যাদি খেতাব আব উপাধি মিলিয়ে যাঁর আড়াই ফুটের মত লম্বা তাঁর চেহাবাখানা কিন্তু তেমন ভারিক্কি নয়। বয়েস চল্লিশের সীম কিন্তু এখনও শবীরে বযেসের ভার পড়েনি। দেহ মেদ-শূন্য, বাহুল্যবর্জিত।

ইন্ডিয়ান কিং বলতে জমকালো রাজবেশ আর পাগড়ি-পরা ময়দার স্তূপের মত থস কিম্ভূত একটি চেহারা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দেখেই মনে হয় পেস্তা-বাদাম-মালাই-ম ধ্বংস ছাড়া জগতে এদের আর কোন কাজ নেই।

রাজাদের চিরন্তন চোহারাটার সঙ্গে বিক্রম সিংয়ের মিল নেই। পুরো ছ'ফুট লম্বা, মেরুদণ্ড এবং কঠিন। দীপ্তবর্ণ শরীরে এতটুকু কুঞ্চন নেই। মোমে-মাজা গোঁফের দুই প্রান্ত সুচের তীক্ষ্ণ। দীর্ঘ চোখ কিঞ্চিৎ আরক্ত; জোড়া ঘন ভ্রূ। কুচকুচে কালো চুল সযত্নে ব্যাক ব্রাশ ক বিশাল পেশীবহুল বুক, চওড়া কব্জি, ভারি চোয়াল—এসব তাঁর দৈহিক বলশালিতার প্রতী

চুনী-পান্নাজাতীয় পাথর বসানো জবড়জঙ পোশাক কিংবা জমকালো পাগড়ি, কিছুই ব্য করেন না বিক্রম সিং। বেশির ভাগ সময়ই তাঁকে নিখুঁত ব্যাকরণসম্মত বিলিতি বেশে যায়। মাঝে মাঝে অবশ্য সখ করে দিশি পোশাক পরেন।

যাই হোক, ইংরেজীয়ানায় যিনি আজীবন অভ্যস্ত শিকারে বেরুবার সময় তিনি কিন্তু পুরনো ाজকীয় রীতিটাই পুরোপুরি মেনে থাকেন।

এই হেমন্তে তিনি যথারীতি হাতিতে হাওদা চড়িয়ে এসেছেন। হাওদার ওপর রথের চূড়োর ত চমৎকার ছত্রী। তার চারদিকে এবং ছাদে লাল সাটিনের ঝালর বসানো। ভেতরে লাল ভলভেটে মোড়া নরম গদীতে বিক্রম সিং বসে আছেন। আজ তাঁর পরনে রেশমী ব্রীচেস আর লক্ষের ফিনফিনে কালিদার পাঞ্জাবী, পায়ে শুঁড়তোলা দামী নাগরা। মাথায় উষ্ণীষ বা রাজমুকুট নেই, তার বদলে নীল রঙের লক্ষ্ণৌ ধাঁচের টুপি। আংটির হীরে আর পাঞ্জাবীর বোতামের হীরে হেমন্তের রোদে জ্বলছে। দিগন্তে তাকিয়ে আছেন বিক্রম সিং; তাঁর দৃষ্টি কিছুটা দূরমনস্ক।

বিক্রম সিংয়ের ছত্রী যেখানে তার থেকে একটু এগিয়ে সামনের দিকে হাতির প্রায় কাঁধের ওপর চালকের বসার জায়গা। সেখানে মাহুত প্যারেলাল ঝকমকে পোশাকে ডাঙস হাতে বসে আছে। হাতি খুবই শিক্ষিত; তাছাড়া আরুলকোটের জঙ্গলে হিজ হাইনেসের বাহন হয়ে অনেকবারই এসেছে। বনভূমির মধ্য দিয়ে গলায় বাঁধা কাঁসার ঘুণ্টি বাজিয়ে ঠিক পথেই চলেছে সে; তাকে চালাবার জন্য ডাঙসের খোঁচা মারার প্রয়োজন হচ্ছে না।

রাজার হাতির ঠিক পিছনেই অশ্বারোহী বাহিনী; একুনে সাতটি ঘোড়া। ঘোড়সওয়ারদের জন বুরহনগড়ের নামকরা শিকারী। তাঁরা সারা ভারত ঘুরে গণ্ডায় গণ্ডায় বাঘ-হাতি-বাইসন-নো মোষ-কুমীর মেরেছেন। তাঁদের খ্যাতি বুরহনগড় স্টেটের চৌহদ্দি পেরিয়ে দিগ্‌দিগন্তে ড়িয়ে পড়েছে। বিক্রম সিং যখনই মৃগয়ায় বেরোন তাঁরা সঙ্গে আসেন। বাকি যে ঘোড়সওয়ারটি ইল সে জগমোহন; হিজ হাইনেস বিক্রম সিং তাকে বলেন, 'চুহামারনেওলা' অর্থাৎ ছুঁচোশিকারী। ই খেতাবেই জগমোহন বিখ্যাত; বুরহনগড় স্টেটের বাসিন্দারা তার আসল নামটা ভুলে গেছে।

জগমোহনকে শীত-গ্রীষ্মে বারো মাস—তা সকাল হোক দুপুরই হোক আর রাতের শেষ হরই হোক—শিকারী বেশে ছাড়া দেখা যাবে না। লোকে বলে রাইডিং বুট পরে, কোমরে বেল্ট আর পিঠে বন্দুক বেঁধে সে নাকি ঘুমোয়। সারাদিন বাঘ ভাল্লুকের গল্প তো করেই, রাত্রেও ঘুমের ঘোরে 'শের শের' 'মঙ্গর মঙ্গর' বলে চেঁচিয়ে ওঠে। একেবারে শিকার-অন্ত প্রাণ।

জগমোহনের শিকার-কাহিনী শুনলে প্রাণ তর হয়ে যাবে। বাঘ-ভাল্লুক তো অতি সাধারণ জানোয়ার; যে কেউ মারতে পারে। এমন অনেক ভয়াবহ বিদঘুটে জন্তুর নাম সে গড়গড়িয়ে বলে যায় ভূ-ভারতে যাদের নাম কেউ শোনে নি। কেতাবে-পুঁথিতে নাকি তাদের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। অথচ ছেলেবেলায় নাকি আকছার সে-সব মেরেছে জগমোহন। তা ছাড়া প্রায় রোজই দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে নাকি তার কাছে শিকারের নেমন্তন্ন আসে। অম্‌রিকা, জাপান, জার্মনি—নানা দেশের হান্টারস্ অ্যাসোসিয়েশন তাকে প্রেসিডেন্ট করবার জন্য মুখিয়ে আছে। জগমোহন যে সে-সব দেশে যায় না, নেহাত বুরহনগড়কে ভালবাসে বলে।

জগমোহনের কথা পরে সবিস্তারে বলা যাবে। তবে আপাতত এটুকু জানানো দরকার যে, এ হেন শিকারী-শ্রেষ্ঠকে বুরহনগড় স্টেটের কেউ কোনদিন চর্মচক্ষে একটি চুহা অর্থাৎ ছুঁচোর বেশি মারতে দ্যাখেনি। বিক্রম সিংয়ের কানে এ-খবরটা উঠলে রীতিমত অনুষ্ঠান করে তিনি তাকে 'চুহামারনেওলা' খেতাব, একটি মানপত্র এবং পুরনো আমলের একটি তলোয়ার আর পঞ্চাশটি মোহর উপহার দিয়েছিলেন। এসব অনেক দিন আগের কথা।

আসলে লোকটা ভাঁড়—রাজবয়স্য। সে কাছে থাকলে এক মুহূর্তের জন্যও নীরস লাগে না, তার সমস্ত উপস্থিতিটাও রসে-হাস্যে উজ্জ্বল এবং মধুর। তাই বিক্রম সিং যেখানেই যান ছায়ার মতো তাঁর সঙ্গে সঙ্গে জগমোহনও থাকে।

অশ্বারোহী বাহিনীর পর খচ্চর বাহিনী; বেঁটে বেঁটে প্রাণীগুলের পিঠে মানুষ নেই। য আছে তা হল মালপত্র—হুইস্কির পেটি, শিকারীরা থাকবেন সেজন্য তাঁবুর সরঞ্জাম, ময়দ আটা-আলু-চিনি-টিন-টিন ঘি-পেস্তা-বাদাম। বড় বড় খাঁচা ভর্তি মুরগী-বর্শা বন্দুক-কার্তুজে বাক্স-ছোরা-লাঠি-হ্যাজাক-পেট্রোলের টিন-কেরোসিনের টিন ইত্যাদি ইত্যাদি। পুরোদস্তু রাজকীয় ব্যাপার।

খচ্চরগুলোর পেছনে পদাতিক বাহিনী; তারা চাকর-বাকর-বাবুর্চি-খানসামার দল।

আরুলকোটের জঙ্গল পুরোপুরি সমতল নয়; তার পাহাড়ী মেজাজ। কোথাও কে খানিকটা সমান জমি, তারপরেই হয়ত চড়াই-উতরাইয়ের ঢেউ।

ঝোপঝাড় মাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে রাজার হাতি। অরণ্য কি সহজে পথ দিতে চায়। পায়ে পায়ে শাল আর প্যাডকের প্রহরী দাঁড় করিয়ে রেখেছে সে। কিন্তু রাজার হাতি বলে কথ শুঁড় দিয়ে গাছপালা তুলে সে পথ করে নিচ্ছে।

বেলা আর বেশি নেই। পশ্চিমের ঢালু বেয়ে সূর্য তরতরিয়ে নেমে যাচ্ছে। খানিক পরে সন্ধ্যে নামবে, ঝিলকি নদীতে রক্তের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে তার আয়োজন চলছে।

হাতি-ঘোড়া-খচ্চর-মানুষ সব মিলিয়ে এই বিপুল শিকার-বাহিনী আরুলকোটে পা দেবা সঙ্গে সঙ্গে এখানকার নিঝুম বনভূমি চকিত হয়ে উঠেছে। গাছের মাথা থেকে বুনো টিয়া ঝাঁক উড়ে উড়ে যাচ্ছে; ধনেশ পাখিরা ক্বঁক ক্বঁক শব্দ করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। সম্ব আর চিতল হরিণেরা শালবনের ফাঁক দিয়ে মাথা বার করেই নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। বাঘ ভাল্লুকদের কথা এখনও বলা যাচ্ছে না; তারা গহন-সঞ্চারী। তবে সবাই টের পেয়েছে ভয়ানক একটা কিছু আসন্ন। হাতি-ঘোড়া-মানুষের এই মৃগয়া পার্টি তো অচেনা নয়; বছরে দু-বার করে এরা হানা দেয়; কতকগুলো নিরপরাধ প্রাণ না নিয়ে আরুলকোটের জঙ্গলকে রক্তে স্নান না করিয়ে ফেরে না। চিতল হরিণ, ধনেশ পাখি আর সম্বররা টের পেয়েছে, মৃত্যু দূতেরা এসে পড়েছে; এবার কার প্রাণ যে যায়!

চলতে চলতে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। এখানে বড় গাছ কিছু নেই, শু ঘাস। গাঢ় সবুজ একখানা কার্পেট যেন কেউ বিছিয়ে রেখেছে।

প্রতিবারই এখানে এসে রাজার হাতি থামে; এবারও থামল। মাহুতের ইঙ্গিতে পা মুড়ে সে বসে পড়ল। ছত্রীর তলা থেকে নিচে নেমে এলেন হিজ হাইনেস বিক্রম সিং।

ওদিকে ঘোড়াগুলো থেমে গেছে, তাদের পেছনে খচ্চরেরা থেমেছে, তাদের পেছনে পদাতিকেরা। মহারাজ নামতেই ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে। ঘোড়সওয়ারেরা নেমে পড়েছে ভৃত্য-বাহিনী ছুটে গিয়ে খচ্চরের পিঠ থেকে সিংহাসনের মতো প্রকাণ্ড গদী-মোড়া একটা আরাম কেদারা এনে দিল; তারপর অপেক্ষাকৃত ছোট ক'টি কেদারা এনে চারদিকে সাজিয়ে দিল। তার ওপর চটপট হাত চালিয়ে তাঁবু খাটাতে শুরু করল।

হাতি-ঘোড়া-খচ্চরেরা এতক্ষণে মুক্তি পেয়ে সজীব ঘাসের বনে মুখ ডুবিয়ে দিল।

এদিকে হিজ হাইনেস আসন গ্রহণ করেছেন। তিনি বসলে ঘোড়সওয়ারের দলও একে একে বসলেন।

ঘাসবন থেকে খানিকটা দূরে উঁচু টিলার মাথায় খান দুই ঘর বাঁশের দেওয়াল আর বেতপাতার চাল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটা লোক—মা কালীর অসুরের মতো চেহারা, কাঁধ পর্যন্ত বাবরি, মোষ-কালো রঙ, কানে মাকড়ি, গলায় রুপো বাঁধানো বাঘনখ ছুটতে ছুটতে নেমে এল। বিক্রম সিং যেখানে বসে আছেন তার থেকে একটু দূরে লোকটা থমকে দাঁড়াল; তারপর দু-হাত জোড় করে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। এটা রাজভক্তির প্রকাশ

লোকটা পড়েই আছে। বিক্রম সিং বললেন, 'হয়েছে হয়েছে, এবার ওঠ।'

লোকটার নাম লছমন; আরুলকোট জঙ্গলের সে পাহারাদার। সে জন্য বুরহনগড় স্টেট কে সে নিয়মিত মাইনে পায় অর্থাৎ সে রাজকর্মচারী।

লছমন প্রচণ্ড সাহসী; তার অনার্যমার্কা বিশাল দেহটার ভেতর ভয় বলে কোন পদার্থ ই। একা-একাই সে এখানে থাকে।

লছমন উঠে দাঁড়াল; তবে হাত দুটো জোড়াই রইল।

বিক্রম সিং জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছিস?'

'হুজৌর মহারাজ, আচ্ছা—' লছমন ঘাড় কাত করল।

'তলব ঠিকমত মিলছে?'

'হুজৌর মহারাজ, জী—'

কথার জবাব দিচ্ছে ঠিকই তবে কেমন একটা বিস্ময় না কি বিভ্রান্তি, লছমনের চোখে মুখে ট উঠেছে। সে ভেবেই পাচ্ছে না, চিরদিনের প্রথা ভঙ্গ করে এই অসময়ে হঠাৎ মহারাজ গরে এলেন কেন? কিন্তু যে-প্রশ্নটা মনের ভেতর তীক্ষ্ণ ছুঁচের মতো খোঁচা দিচ্ছে, াবাজের মুখের ওপর তা বলে ফেলার রীতি তার মতো দাসানুদাসের নেই। সবিস্ময়ে জ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে লছমন?

লছমনের মনোভাব যেন বুঝতে পারলেন বিক্রম সিং। বললেন, 'আমি এ-সময়ে আসতে অবাক হয়ে গেছিস, না?'

অসুর-মুণ্ডুর মতো লছমনের প্রকাণ্ড মাথাটা একদিকে কাত হল। অর্থাৎ সে অবাক হয়েছে।

হিজ হাইনেস বিক্রম সিং তাঁর বেতনভুক কর্মচারীর প্রতি—তা সে যত তুচ্ছ আর নগণ্যই ক, অত্যন্ত উদার। তাদের সঙ্গে সব সময় সহৃদয় ব্যবহার করে থাকেন। তিনি যে রাজা, ৷বন্দিত, পৃথিবী-পালক—এ-কথাটা কর্মচারিদের সামনে ভুলে যান। আন্তরিক সুরে লেন, 'মনটা ভাল লাগছিল না, তাই চলে এলাম রে।'

লছমন কী আর বলবে, চুপ করে রইল।

বিক্রম সিং বললেন, 'তুই এখন যা। কাছাকাছিই থাকিস, ডাকলে যেন পাই।'

'জী হুজৌর মহারাজ।' রাজভক্তির নমুনা স্বরূপ আরেকবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল লছমন।

খানিকটা পরে উঠে লছমন যখন চলে যাবে সেই সময় কথাটা মনে পড়ল বিক্রম য়ের। বললেন, 'কাল থেকে শিকারে বেরুব!'

'জী হুজৌর মহারাজ।'

'সরকারি জঙ্গল থেকে আমাদের এদিকে বাইসন-টাইসন আসে?'

'ও তো হামেশা আসছে, আজ সকালেও দেখেছি।'

বিক্রম সিংয়ের মুখ-চোখ আলোকিত হল। উৎসাহের সুরে বললেন, 'শের'?

'জী—'

'ভাল্লুক?'

'ও ভি আসছে। চিকরি হীরণ (হরিণ) ভি আসছে। লেকেন—'

চোখ কুঁচকে, গোঁফের দু-ধারের ছুঁচলো প্রান্ত দুটোয় পাক দিয়ে বিক্রম সিং জিজ্ঞেস লেন, 'লেকেন কী?'

একটু ইতস্তত করে ভয়ে ভয়ে বলল, 'গবমিন্টকা সাহাবলোগ ক'দিন আগে ঢেঁড়া দিয়ে ছে।'

গরমিন্টকা সাহাবলোগ অর্থে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের কর্মচারিরা। গভর্নমেন্টের নাম শু
চকিত হলেন বিক্রম সিং। আরাম কেদারায় সারা শরীর সঁপে আধশোয়া ভঙ্গিতে ক
বলছিলেন; এবার মেরুদণ্ড টান টান করে খাড়া হয়ে বসলেন, 'কী ঢেঁড়া দিয়েছে শুনি-

'গরমিন্টকা জঙ্গলসে শের-ভাল্লুক-হাতি-হীরণ যা-ই আসুক না কেন, মারা চলবে না। এ
চিড়িয়া (পাখি) ভি না। গরমিন্টকা সাহাবলোগ হঁশিয়ারি দিয়েছে, ইস্তাহার ভি দিয়েছে।' ছু
গিয়ে টিলার ওপর নিজের ঘর থেকে একটা ছাপানো প্রচারপত্র এনে বিক্রম সিংয়ের হা
দিল সে।

পুবদিকের টিলার ওপারে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের রিজার্ভ ফরেস্ট। সেখান থেকে জ
জানোয়ার আর পাখি প্রায়ই এদিকে আসে। সরকার থেকে রিজার্ভ ফরেস্টের পশুপাখি মা
নিষিদ্ধ হয়েছে।

ইস্তাহারটা পড়ে দেখলেন বিক্রম সিং; সরকারি নির্দেশ অমান্য করলে প্রচণ্ড শাস্তি পে
হবে। পড়তে পড়তে চোখের তারা দুটো বাঘের মতো জ্বলে উঠল। উত্তেজনায় বুক
তরঙ্গিত হতে লাগল; শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুততর হল; এ নিশ্চয়ই বান্দর-কে-বাচ্চে কমিশনারট
কাজ; সে-ই কারসাজি করে ঢেঁড়া দিয়েছে, ইস্তাহার ছাপিয়ে বিলি করেছে।

একটা ছোট্ট ডিভিসনের কমিশনার; অমন গণ্ডা গণ্ডা নৌকর বিক্রম সিং পুষতে পারে
ছুঁচোটার স্পর্ধা দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন।

স্পর্ধা সে কি আজই দেখাচ্ছে? যেদিন থেকে এই ডিভিসনের কমিশনার হয়ে এসে
সেদিন থেকেই সে পেছনে লেগেছে। নিজে সে কোনদিনই আসে নি, তবে আর্দালী মারফ
নোটিশ পাঠাত, রিজার্ভ ফরেস্টের একটি প্রাণীর গায়েও যেন আঁচড় না লাগে। নোটিশগু
চিরদিন অগ্রাহ্য করে এসেছেন বিক্রম সিং। কিন্তু বান্দর-কা-বাচ্চের দুঃসাহস এত বেড়েছে
নোটিশ ঠুকেই সে থেমে থাকে নি; ঢেঁড়া ও ইস্তাহারও ছেড়েছে।

অন্য সময় হলে ঢেঁড়া ও ইস্তাহার উপেক্ষা করতেন বিক্রম সিং, কিন্তু এবার দিল্লী থে
ফেরার পর মেজাজটা বিষাক্ত হয়ে আছে। 'একসেশন অফ ইন্ডিয়ান নেটিভ স্টেটস' কথাট
অর্থ কী, পরিণাম কী—কিছুতেই তা ভুলতে পারছেন না হিজ হাইনেস বিক্রম সিং। ভুলব
জন্য ভূগোলের কোলাহল থেকে এত দূরে জঙ্গলের নিঝুম অন্তঃপুরে পালিয়ে এসেছেন, কি
ভারত-সরকার এখানেও তাঁর সঙ্গ ছাড়ে নি।

অন্য কেউ হলে হয়ত গ্রাহ্য করতেন না। যেহেতু বান্দর-কা-বাচ্চে কমিশনারটার গা
ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের গন্ধ লাগানো আছে, বিক্রম সিং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তীব্র গলা
বললেন, 'রিজার্ভ ফরেস্টের জানোয়ারদের গায়ে কি ইন্ডিয়া গর্ভনমেন্টের ছাপ মারা আ
যে দেখলেই চিনতে পারব!'

এদিকে ইস্তাহারটা বিক্রম সিংয়ের হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। চারপাশে অন্য
শিকারীরা বসে ছিলেন তাদের হাতে হাতে সেটা ঘুরতে লাগল।

সবার পড়া হলে জগমোহন বলল, 'কমিশনার হারামীটাকে আমাদের পাল্টা একটা নোটি
পাঠাতে হবে ইওর হাইনেস—'

বিক্রম সিং বিরক্ত ভ্রূকুটি হাসলেন, 'কী নোটিশ?'

'তামাম জানোয়ার আর চিড়িয়া সে যেন খাঁচার ভেতর পুরে রাখে।'

বিক্রম সিং হাসলেন; তাঁর ঠোঁট দুটো ঈষৎ বিস্তৃত হল মাত্র, কিন্তু কোন শব্দ হল
বললেন, 'ঠিকই বলেছ; আজ রাত্রেই একটা ড্রাফট্ করে ফেলো তো।'

'জরুর ইওর হাইনেস—' তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করল জগমোহন।

বিক্রম সিং আগের প্রসঙ্গের জের ধরে এবার বললেন, 'আরুলকোট আমার এলাকা; এর ভেতর যে ঢুকবে সে পাখি হোক, জানোয়ার হোক, আর মানুষই হোক, গোলি মেরে দেব। আই উইল শুট। দেখি কে আমার কী করতে পারে।'

সভাসদেরা মাথা নেড়ে সমস্বরে সায় দিলেন, 'বেশখ্ ইওর হাইনেস্, বেশখ্। একশ' বার হাজার বার বেশখ্।'

বিক্রম সিং লছমনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল ভোবে হাকোওয়ালাদের খবর দিবি।'

'জী, হুজৌর মহারাজ।' লছমন মাথা নাড়ল।

'দু এক দিনের ভেতর তারা যেন এসে পড়ে।'

'জী হুজৌর মহারাজ।'

'আচ্ছা এখন তুই যা।'

আভূমি নত হয়ে লছমন চলে গেল।

পশ্চিমের বনরেখার ওপারে সূর্যটা কখন ডুব দিয়েছে কেউ জানে না। তারপর হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের মত আকাশ কিছুক্ষণ আরক্ত হয়ে রইল; সেই রক্তাভাটুকুও বেশিক্ষণ থাকল না। দেখতে দেখতে লম্বা পায়ে হেমন্তের সন্ধ্যা নেমে এল।

এদিকে তাঁবু তৈরি প্রায় শেষ। আট-দশটা হ্যাচাক ইতিমধ্যেই চারদিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে; আর জ্বালানো হয়েছে মশাল। এই বনভূমিতে যে-কোন মুহূর্তে হিংস্র জন্তুর দল হানা নিতে পারে, তাদের দূরে রাখার জন্যই মশাল জ্বালানো।

দিনের বেলাটায় আরুলকোট তার সর্বাঙ্গে শরৎকালের স্মৃতি সাজিয়ে রেখেছিল। কিন্তু সন্ধ্যে নামার সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে হেমন্ত পেরিয়ে একেবারে পঞ্চম ঋতু এসে হাজির হল যেন। জায়গাটার পাহাড়ী মেজাজ। তার মর্যাদা রাখার জন্যই বোধহয় আরুলকোট হিমেল হয়ে উঠল। উত্তুরে বাতাস সাঁই সাঁই ঘোড়া ছোটাতে লাগল। দূর দিগন্তে ঘন হয়ে হিম পড়তে শুরু করল।

খাস বেয়ারা ছুটে এসে হিজ হাইনেসের গায়ে একটা লঙ কোট পরিয়ে দিল। সভাসদরাও গরম পোশাক পরে নিলেন।

হ্যাচাক আর মশালের শিখায় চারদিক আলোকিত। আলো যতদূর ছড়িয়ে পড়েছে তার ওপারে অন্ধকারটা থমকে আছে; সুযোগ পেলেই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

বিক্রম সিং বললেন, 'সবে অক্টোবর শেষ হল; এর ভেতরেই এখানে বেশ ঠাণ্ডা পড়ে গেছে।'

সবাই মাথা নেড়ে বললেন, 'জী মহারাজ।'

'বুরহনগড়ে এখনও কিন্তু বেশ গরম।'

'এই জায়গাটায় বন আর পাহাড় আছে বলেই ঠাণ্ডা এত লাগছে।'

'তাই হবে।'

একটু চুপচাপ।

তারপর বিক্রম সিংই আবার বললেন, 'ঠাণ্ডাটা একটু কাটিয়ে নেওয়া দরকার, না কি বল তোমরা?'

জগমোহন ইঙ্গিতটা বুঝল এবং তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠল, 'এর ভেতর আমাদের বলাবলির কী আছে! মহারাজের ইচ্ছেই তো আমাদেব ইচ্ছে।' বলেই অদূরে দাঁড়ানো একটা বেয়ারাকে

ডাকল, 'জলদি হুইস্কি লাও। দেখো, এক ফোঁটা পানি উশিমে মাত গিরাও।'

'জী—' উর্ধ্বশ্বাসে হুইস্কির পেটির উদ্দেশে বেয়ারাটা ছুটতে যাবে, আরেকজন তাকে থামালেন। বললেন, 'নহী—'

যিনি থামিয়েছেন তাঁর নাম কমলনয়ন শর্মা। হিজ হাইনেসেরই সমবয়সী হবেন তিনি: যুগপৎ শিকারী এবং ডাক্তার।

বিক্রম সিং বিরক্ত হলেন, 'কী ব্যাপার কমল, ওকে আটকালে কেন?'

'তোমার হুইস্কি খাওয়া চলবে না।'

'আঃ—' বিক্রম সিংয়ের ভ্রূ কুঞ্চিত হল; কপালে অনেকগুলো রেখা পরস্পর কাটাকাটি করে ফুটে উঠল। বিস্বাদ সুরে তিনি বললেন, 'এই জঙ্গলে এসেও ডাক্তারি ফলাতে শুরু করলে।'

কমলনয়ন শর্মা গম্ভীর হলেন, 'সাধ করে কি আর ফলাচ্ছি বিক্রম; কেন ফলাচ্ছি নিজেই ভেবে দেখ।'

বুরহনগড় স্টেটে কমলনয়নই একমাত্র ব্যক্তি যিনি হিজ হাইনেসকে নাম ধরে ডাকেন। তাঁরা ছেলেবেলার বন্ধু। পড়াশোনা থেকে শুরু করে নারীবিলাসে, শিকারে, ভ্রমণে—সব ব্যাপারে দুজনে পাশাপাশি আছেন।

বিক্রম সিং ভ্রূকুটি করলেন, কিছু বললেন না।

বিক্রম সিং ভাবলেন, কথাটা ঠিকই বলেছেন কমলনয়ন। সেই ছেলেবেলায় যখন তিনি প্রিন্স তখন থেকেই সুরাচর্চার হাতে খড়ি। প্রথম প্রথম এক-আধ পেগ খেতেন; বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পেগের সংখ্যাও বেড়েছে।

সুরাপান রাজধর্মের ভেতরই পড়ে। কাজেই বাবার মৃত্যুর পর বিক্রম সিং যখন বুরহনগড় স্টেটের অধীশ্বর হলেন তখন আর কোন মাত্রা রইল না; উগ্র উত্তেজক পানীয়ের স্রোতে ভেসে গেলেন।

ভ্যাট সিক্সটি নাইন, কনিয়াক আর আরাকের বোতলগুলোর কাছে পাকস্থলীর স্বত্ব প্রায় লিখেই দিয়েছিলেন। রাজরক্তে সংযম বলে কোন বস্তু নেই। ছেলে বয়েস থেকে প্রচণ্ড রকমের মদ খাওয়ার ফল হয়েছে এই চল্লিশ বছরেই পেটটা টুটোফুটো হয়ে গেছে। আগে প্রায়ই অসহ্য যন্ত্রণা হত, কাটা কবুতরের মত ছটফট করতেন। কিছু খেতে পারতেন না, ঘুমোতে পারতেন না। মাঝে মাঝে রক্ত-বমিও হয়েছে।

কী হত বলা যায় না, সেই সময় বন্ধু কমলনয়ন এসে হাতের নাগাল থেকে হুইস্কি আর আরাকের বোতলগুলো সরিয়ে দিলেন। যাতে বেয়ারা বা অন্য কারোকে দিয়ে আনাতে না পারেন সে জন্য সব সময় কাছাকাছি থেকে পাহারা দিতে লাগলেন। এক মুহূর্তের জন্যও সঙ্গ ছাড়লেন না। তার ফল খারাপ হয়নি; টুটোফুটো পাকস্থলীটা অনেকখানি মেরামত হয়েছে। যন্ত্রণাও আর নেই। এখন খেতে পারেন, রাত্রে প্রচুর ঘুমও হয়। রক্ত-বমিও বন্ধ হয়ে গেছে মোটামুটি ভালই আছেন হিজ হাইনেস বিশ্ববন্দিত প্রজানুরঞ্জক বিক্রম সিং।

কমলনয়ন বলতে লাগলেন, 'পেটটাকে দানপত্র করে দিতে চাও আমার আপত্তি নেই, কিন্তু মনে রেখো—'

'কী!' বিরক্ত জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন বিক্রম সিং।

'পেটের সঙ্গে নিজেকেও লিখে দিতে হবে। তাই বলছিলাম সামলে চল। সংযম টংযম না মানলে—'

বাধা দিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'তোমার মাস্টারি থামাও তো।'

হুইস্কি বন্ধ করাতে বিক্রম সিং খুবই চটেছেন, কমলনয়ন হাসতে লাগলেন।

বিক্রম সিং রেগে বললেন, 'তুমি কি বলতে চাও, বাকি জীবনটা আমাকে নির্জলা উপোস দিতে হবে?'

'উপোস!'

'তা ছাড়া কি; ড্রিঙ্ক করতে না-পাবা উপোসেরই সামিল। তোমার জন্যে আমার সারা জীবনের হ্যাবিট পাল্টাতে হবে দেখছি।'

'না-না, অতখানি করতে হবে না।' কমলনয়ন সকৌতুকে হেসে উঠলেন, 'মাঝে মাঝে পাল-পার্বণে একটু-আধটু খেও।'

'পাল-পার্বণ বলতে?'

'এই কোন ফাংশান-টাংসান হলে, কি ভি.আই.পি. এলে বা কোন উৎসব-টুৎসবে—'

বিক্রম সিং খুব যে একটা সান্ত্বনা পেয়েছেন তাঁর গম্ভীর ভ্রূকুটিতীক্ষ্ণ মুখখানা দেখে এমন কথা মনে হওয়ার কারণ নেই। অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, 'তা হলে এগুলোর কী হবে?'

'কোন গুলোর?'

'এই যে এত এত হুইস্কি আর কনিয়াকের পেটি আনা হল, সেগুলোর? আমি খেতে না পেলে তোমরা মজা লুটবে বুঝি?'

'আমরাও কেউ খাব না। তবে—'

'কী'?

'জগমোহন একা খাবে।'

'গুড, ভেরি গুড—' বিক্রম সিং উৎসাহে এপাশ থেকে ওপাশে কাত হলেন, 'জগমোহনের গলা পর্যন্ত আজ বোঝাই করা হবে। বেয়ারা—'

বেয়ারা ছুটে এল। বিক্রম সিং বললেন, 'হুইস্কি লাও—'

বোতলের পর বোতল আসতে লাগল। ডিকান্টার ভর্তি করে করে টেবিলের ওপর রাখতে লাগল বেয়ারাটা। আর জগমোহন চোঁ-চুমুকে নিমেষে শেষ করে ফেলতে লাগল। লোকটা এ ব্যাপারে প্রায় সিদ্ধিলাভই করেছে।

দেখতে দেখতে দুটো বোতল সাফ করে ফেলল জগমোহন। অথচ মাথা একটু টলছে না; হাত কাঁপছে না। নেশা যে করেছে এমন লক্ষণ তার সর্বাঙ্গের কোথাও লেখা নেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বচ্ছন্দ, যেন কিছুই হয় নি—এমন দেখাচ্ছে তাকে।

লোকটা যখন মদ খায় তখন চোখ বোজা থাকে।

হিজ হাইনেস বিক্রম সিং বললেন, 'কি হে চুহামারনেওলা—'

চোখ না মেলে জগমোহন সাড়া দিল, 'হুজৌর মহারাজ—'

'আর চলবে?'

'বেশখ্! হাত-পা কি আমার কাঁপছে যে এখনই থামব?'

'লেকেন আঁখ জরুর লাল হয়েছে।'

'নেহী, বিলকুল ফর্সা। এই দেখুন—' বলে চোখ খুলেই বন্ধ করে ফেলল জগমোহন। সত্যিই, চোখদুটো সাদা জগমোহনের, একদম পরিষ্কার। লাল হওয়া দূরে থাক, ফিকে একটু আভাও সেখানে লাগে নি।

তারিফের ভঙ্গিতে বিক্রম সিং বললেন, 'বহুত আচ্ছা—'

সভাসদেরা ধুয়ো ধরলেন, 'কোই বাত নেই, কোই বাত নেই।'

একজন বললেন, 'বহুত ইলেমদার আদমী।'

বিক্রম সিং বললেন, 'তবে আর কি, চালাও পানসী।'

পানসী চলতে লাগল।

পেগের পর পেগ উড়িয়ে দিল জগমোহন। অবশেষে মাথার দুলুনি শুরু হল তার, হাতের আঙুলে কাঁপন ধরল, সেদ্ধ মাংসের মতো রক্তশূন্য সাদাটে ঠোঁট ঝুলে পড়ল। চোখদুটো হাজার চেষ্টা করেও বন্ধ করেও রাখতে পারল না জগমোহন; আপনা থেকেই সে দুটো খুলে গেল। চোখ নয়, এখন মনে হচ্ছে ও দুটো জমাট রক্তপিণ্ড।

বেয়ারা ডিকান্টার ভর্তি করে আবার এনে সামনে রাখল। জগমোহন বলল, 'নহী।'

বিক্রম সিং বললেন, 'কী নহী?'

'আর পারব না।'

'ব্যস?'

'বিলকুল ব্যস্।' জগমোহন বলল, 'আর বসতে পারছি না; এবার আমায় শুতে হবে।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল।

বিক্রম সিং ঠোঁট কামড়ে কী একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'নহী।'

আরক্ত আধবোজা চোখে তাকাল জগমোহন। জড়িত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'শোবো না মহারাজ?'

'নহী।'

'তবে কী করব?'

'পীনা (পান করা) হয়েছে; এবার গানা আউর নাচা লাগাও।'

নিজের বুকে তর্জনী স্থাপিত করে জগমোহন বলল, 'আমি?'

'হাঁ-হাঁ, তুমি।'

মাতালের খেয়াল। টলতে টলতে হঠাৎ খাড়া হয়ে দাঁড়াল জগমোহন। বুকে সজোরে চাপড় মেরে বলল, 'জরুর নাচুঙ্গা, জরুর গাহুঙ্গা। হুজৌর মহারাজাকি আদেশ।' বলেই হাত-পা ছুঁড়ে উদ্দাম নাচ শুরু করল। সেই সঙ্গে গান : 'নয়না মারকে দিল না তোড় পিয়ারী—পিয়ারী—'

প্রকাণ্ড একটা কোলাব্যাঙকে ব্রীচেশ, রাইডিং বুট, বেল্ট ইত্যাদি পরিয়ে নাচালে যে মনোহরণ দৃশ্য দেখা যাবে জগমোহনকে তেমনই দেখাচ্ছে। নাচের তালে কোমর দুলছে না, বিশাল ভুঁড়িটাই শুধু দোল খাচ্ছে।

মাঝে মাঝে জগমোহনকে নিয়ে এ জাতীয় রসিকতা করে থাকেন হিজ হাইনেস মহারাজা অফ বুরহনগড়।

জগমোহনের কাণ্ড দেখে সবাই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছেন। বিক্রম সিংও হাসছেন আর সমানে উৎসাহ দিচ্ছেন, 'ঘুরে ফিরে ব্যাটা, ঘুরে ফিরে—'

প্রেরণা পেয়ে জগমোহনের নাচ প্রচণ্ড হয়ে উঠল।

উৎসাহ দিতে দিতে হঠাৎ বিক্রম সিং ডাকলেন, 'বেয়ারা—'

বেয়ারা তটস্থ হয়ে আভূমি কুর্নিশ ঠুকল।

বিক্রম সিং বললেন, 'জলদি এক পেগ হুইস্কি, আদা টোমাটোর রস মিশিয়ে নিয়ে এস—'

হাসতে হাসতে ওলট-পালট খাচ্ছিলেন কমলনয়ন। বিক্রম সিংয়ের কথা কানে যেতেই সিটা থমকে গেল। শঙ্কিত স্থির দৃষ্টিতে বললেন, 'এ কী'?

বিক্রম সিং বললেন, 'কিসের কথা বলছ?

'তুমি হুইস্কি আনতে বললে যে!'

'বা রে, তুমিই তো তখন বললে পাল-পার্বণে একটু আধটু খেতে।'

'পাল পার্বণটা হল কখন?'

'এই মাত্র। জগমোহন নাচছে, এটা পার্বণ নয়?'

কমলনয়ন হাল ছেড়ে দিলেন। দুই কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত ঘুরিয়ে হতাশ সুরে বললেন, দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না।'

বিক্রম সিং হাসতে লাগলেন। আর বিদ্যুৎগতি বেয়ারাটা এই ফাঁকে টোমাটো আর আদার স মিশিয়ে হুইস্কি নিয়ে এল।

তিন

চারদিকে ছোট ছোট অনেকগুলো তাঁবু পড়েছে। হারের মাঝখানে লকেটের মত মাঝখানেরটা সব চাইতে বড়, সব চাইতে চমৎকার। এই তাঁবুটা হিজ হাইনেস মহারাজ বিক্রম সিংয়ের।

জঙ্গল বলে দুশ্চিন্তার হেতু নেই। বুরহনগড় প্যালেসের যাবতীয় আরাম আর বিলাস এই তাঁবুর ভেতর তুলে এনে হিজ হাইনেসের চারপাশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রথমে তেরপল; তার তলায় ঝালরওলা রেশমী চাঁদোয়া। চাঁদোয়ার নিচে প্রকাণ্ড খাটে সুখদায়ক নরম বিছানা। পাখির পালকের বালিশ, ধামসাবার জন্য শিমুল-তুলোর বাহারে তাকিয়া; অতি স্বচ্ছ ফিনফিনে মশারি। আরাম-কেদারা, সোফা, কোচ, সোনার ফরসি, ধূপদান, আতরদান, রুপোর পিকদান—হাতের কাছে সব কিছু মজুদ। এমন কি ফুলদানিতে রজনীগন্ধার শুভ্র সুরভিময় গুচ্ছও রয়েছে। তাঁবুর ভেতরটা যেন স্বপ্নের দেশ; ব্যাটারীতে জ্বলা নীলাভ কোমল আলোয় রমণীয়।

রাজা যখন, এই জঙ্গলেও খাওয়া-দাওয়ার রাজসূয় আয়োজন হয়েছিল। সুপ-রোস্ট থেকে কোর্মা-কাবাব, পরিজ-পুডিং থেকে রাবড়ি-পেঁড়া—দিশি-বিদেশী, আর্য-অনার্য, মোগলাই এবং হিন্দোস্তানী, চরাচরে যত রকমের রসনাসুখের ব্যবস্থা আছে এই আরুলকোটের জঙ্গলে তার সবই পেয়েছেন বিক্রম সিং।

খাওয়ার পালা চুকেছে ঘণ্টাদুয়েক আগে। তারপর খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করে সঙ্গীরা যে যার তাঁবুতে চলে গেছেন; এতক্ষণে ঘুমিয়েও পড়েছেন হয়তো।

বিক্রম সিং শুয়ে পড়েছিলেন কিন্তু ঘুম আসে নি। চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের ভাবনা চারদিক থেকে হানা দিতে লাগল, চোখের পাতায় একরাশ ধারাল কাঁটার মতন তারা অবিরাগত বিঁধছে।

বুরহনগড় স্টেট থেকে এতদূরে চলে এসেছেন, ভাবনাটা সঙ্গ ছাড়ে নি। ঠিক পিছু পিছু চলে এসেছে। এতক্ষণ ওরা ছিলেন; জগমোহনকে নিয়ে খানিক হুল্লোড় করে অনেকখানি সময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে পেরেছেন বিক্রম সিং। কিন্তু কে জানত দুশ্চিন্তাটাকে খুব বেশি দূরে সরিয়ে দিতে পারেন নি; সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে যেই নির্জনে এসেছেন অমনি গুটি গুটি সে এসে সামনে দাঁড়িয়েছে।

'অ্যাকসেশন অব নেটিভ স্টেটসে'র ব্যাপারটা নিয়ে নেতারা উঠে-পড়ে লেগেছে; কথা ঘুরে ফিরে বার বার মনে পড়তে লাগল।

একবার দিল্লীতে থাকার সময় নতুন জনতারাজ দেখার কৌতূহল হয়েছিল; দেখ গিয়েছিলেনও। তার আগে লন্ডনে ইংলিশ পার্লামেন্ট দেখে এসেছেন বিক্রম সিং।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চেহারা তাঁকে মুগ্ধ, বিস্মিত বা চমৎকৃত করতে পারে নি। জনগণে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এই আখড়া সম্বন্ধে তাঁর প্রাণে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধার ভাব জাগে নি। ক অপরিসীম বিরক্তি আর হতাশা নিয়ে ফিরে এসেছেন।

ইংল্যান্ডের হাউস অফ্ লর্ডস্, হাউস অফ কমন্স—দুই হাউসেই গেছেন বিক্রম সি হাউস অফ লর্ডসের কথা ছেড়েই দেওয়া যাক; ওখানকার প্রতিনিধিরা অভিজাততম-সমাজের উচ্চতম চূড়ার মানুষ।

হাউস অফ কমন্স বলে আতঙ্কিত হবার কারণ নেই। কমন্স ঐ নামেই, নইলে ও কমনারদের আড্ডাখানা নয়। তার মর্যাদা, তার গাম্ভীর্য, তার ব্যক্তিত্ব কোন অংশেই হাউ অফ লর্ডসের চাইতে খাটো নয়।

কিন্তু এখানে—নঈ দিল্লীতে? এখানকার পিঁজরা পোলে ঢুকে একটা হাটের অভিজ্ঞ লাভ করেছেন হিজ হাইনেস বিক্রম সিং। একপাল রুখা-শুখা-ভুখা লোক গলায় অসুরে শক্তি নিয়ে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে। তাদের চেহারায় আছে আভিজাত্য, ব্যবহারে না আছে মর্যাদা। এখানে যার গলায় যত জোর সে-ই তত ব পার্লামেন্টারিয়ান।

এখানে কেউ আসে লুঙ্গি পরে, কেউ পা-জামা, কেউ চুস্ত, কেউ ধুতি-পাতলুন—স মিলিয়ে একটা ভনভনে মাছের বাজার। এখানে কেউ হিন্দীতে বলে, কেউ ইংরেজিতে, কে তামিলে। পোশাকে বা ভাষায়, কোথাও বিন্দুমাত্র মিল বা সমতা নেই। বিক্রম সিংয়ের ম হয়েছিল—বিচিত্র এক চিড়িয়াখানায় এসে পড়েছেন।

ক'দিন আগে যাবা জমিতে লাঙ্গল চালাত কিংবা কারখানার চুল্লীতে কয়লা দিত, আ তারাই জননেতা। যে-ই হোক, ক'টি ভোট কুড়োতে পারলেই এ-দেশে রাজনৈতিক মোক্ষলা ঘটে যায়। শিক্ষা-দীক্ষা বংশ-গৌরব এটিকেট আর কিছু দরকার নেই। ভোটারদের 'পা অর্ডার' একবার পেলেই হল, কপালে তার শীলমোহর মেরে সবাই ছুটল নঈ দিল্লী। পীপল্ বিপ্রেজেন্টেটিভ! ডিমোক্র্যাসি—জনতারাজের কী চমৎকার নমুনা!

ঐ নোংরা বাজে লোকগুলোই গলাবাজি করে রাজতন্ত্রকে গঙ্গাযাত্রায় পাঠাতে চলেছে রাজা-মহারাজা-বাদশা-বেগম-নিজাম—সবার ভাগ্য আজ ওদের হাতে।

ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে উঠল বিক্রম সিংয়ের। একবার ভাবলেন, ঘুমের পি খান। পরক্ষণেই ভাবনাটা বাতিল করে দিলেন। পিল খেয়ে ঘুমোলে সকালবেলা হৃদয় অত্যন্ত দুর্বল লাগে; গভীর অবসাদ এমনভাবে ঘিরে থাকে যে দু-তিন দিন কিছুই ভাল লাগে না। তাছাড়া ওষুধের বিষময় একটা প্রতিক্রিয়া আছে। একবার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেলে আ নিস্তার নেই; পিল ছাড়া আর ঘুমই আসতে চায় না। কিছুদিন আগে এইরকম একটা অভ্যা করে ফেলেছিলেন বিক্রম সিং; কত কষ্টে যে তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন!

নাঃ, ঘুমহীন চোখে শুয়ে থাকতে ভাল লাগছে না। আস্তে আস্তে উঠে মশারী সরিয়ে নি নামলেন বিক্রম সিং। এই জঙ্গলেও তাঁবুর মেঝেতে কাশ্মিরী কার্পেট পাতা; সাপের চামড়া সৌখিন চটি পায়ে তিনি পায়চারি করতে লাগলেন।

ঘুমের পিল না হোক, অন্তত এক পেগ হুইস্কি পেলেও খানিকটা আরাম বোধ করতেন ক্রম সিং। কিন্তু তার উপায় নেই। হুইস্কির পেটিগুলো নিজের তাঁবুতে নিয়ে রেখেছেন মলনয়ন। হঠাৎ তাঁর ওপর অত্যন্ত রাগ হল বিক্রম সিংয়ের; লোকটা যেমন খুশি অত্যাচার লিয়ে যাচ্ছে!

পায়চাবি করতে করতে একবার ভাবলেন, সবাইকে ডাকিয়ে এনে আড্ডা জমাবেন কিনা। কি রাতটুকু গল্প করে কাটিয়ে দিতে পারলে অন্তত অ্যাকসেশনের সেই দুর্ভাবনাটা কিছুক্ষণের ন্য ভুলে থাকা যেতে পারে। পরমুহূর্তেই স্থিব করলেন, ডাকবেন না।

রাজা হলেও বিক্রম সিং কোন কোন সময় হৃদয়বান। এত রাত্রে ঘুমন্ত মানুষগুলোকে তুলে নে কষ্ট দিতে তাঁর মন সায় দিল না।

গলাটা শুকিয়ে আসছে। হুইস্কি তো নেই, অন্তত একটু জল খেতে পারলে হত। বিক্রম সিং াকলেন, 'চৌহন—'

'মহারাজ—' আর কেউ না জেগে থাক, চৌহন তাঁবুর বাইরে ঠিক অতন্দ্র বসে আছে। হিজ ইনেসের সে খাস নৌকর। ডাকামাত্র সে ছুটে এল।

বিক্রম সিং বললেন, 'জল দে—'

চৌহন জল দিয়ে চলে গেল।

জল খেয়ে আবার পায়চারি শুরু করলেন বিক্রম সিং। করতে করতে বিদ্যুৎচমকের মত কটা কথা তাঁর মনে পড়ল। ভাদ্রে-বসন্তে, বছরে যে দু'বার তিনি আরুলকোটে আসেন, ছমন একটি করে অনাঘ্রাতা আদিবাসিনী তাঁর পায়ের কাছে ভেট দেয়। হিজ হাইনেস নির্দিষ্ট কটা সময়ে আসেন বলে আগে থেকেই লছমন ঠিক করে রাখতে পারে; তিনি আসার শুধু পেক্ষা।

অঙ্গে-বঙ্গে-কলিঙ্গে, দিল্লী-প্যারিস-লন্ডনে—যেখানেই বিক্রম সিং যান, নাবীবিলাস তাঁর মণের অঙ্গ। কিন্তু সে মেয়েরা সোসাইটি গার্ল—ফুলে ফুলে উড়ে-বেড়ানো প্রজাপতি। কিন্তু য আদিবাসিনীদের লছমন ধরে নিয়ে আসে তাদের রঙ আলাদা, ঢঙ আলাদা, স্বভাব আলাদা। হরেব মদিরেক্ষণারা পোকার মত গায়ে এঁটে থাকে—সেটা তাদের ব্যবসা। কিন্তু বনের এই মযেরা স্বভাবভীরু, কুণ্ঠিত। বিছানার প্রান্তে তাদের সঙ্গিনী হিসেবে পাওয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতা বকি।

শহুরে কামিনীরা সহজলভ্যা। একটু হাতছানির শুধু অপেক্ষা, ঝাঁকে ঝাঁকে তারা এসে ঘিরে বে। তার ওপর বিক্রম সিং যখন রাজা, বিশ লাখ টাকা আয় হয় এমন একটা স্টেটের ধীশ্বর, তখন তো কথাই নেই। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য, তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে প্রজাপতির াকেরা কী যে করবে ভেবে পায় না। কথায় কথায় তাদের চটুল ভ্রূভঙ্গ, অকারণ হাসি, কিমিকি রঙ্গ। তার ওপর দেহ-প্রদর্শনী তো আছেই। ওদের শরীরের যেটুকু ঢাকা তার নেকগুণ উন্মুক্ত। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায় বলে এদের সম্বন্ধে খুব একটা মোহ নেই বিক্রম য়ের। তাছাড়া লন্ডনে হোক আর প্যারিসেই হোক, দিল্লী হোক অথবা কলকাতাই াক,—সমাজের উঁচুতলার এই রঙ্গিণীরা সমান, তাদের প্রমোদের খেলা প্রায় একই রকম। কই ছাঁচে ঢালাই কতকগুলো রঙচঙে সজীব পুতুল যেন পৃথিবীর শহরে শহরে ছড়িয়ে দেওয়া য়েছে।

কিন্তু আরুলকোটের জঙ্গলে লছমন যাদের যোগাড় করে আনে তাদের আস্বাদ আলাদা। বক্রম সিং ডাকলেন, 'চৌহন—'

চৌহন ছুটে এল।

বিক্রম সিং বললেন, 'লছমনকে ডেকে আন—'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে চৌহন টিলার দিকে ছুটল। একটু পর ফিরে এসে বলল, 'লছমন ঘরে নেই মহারাজ।'

'ঘরে নেই!' বিক্রম সিংহের কপাল রেখাময় হল, চোখ ভ্রূকুটিকুটিল।

'নহী মহারাজ হুজৌর।'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না মহারাজ—'

হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বিক্রম সিং। সব দিক থেকেই মেজাজটা আজ খারাপ হয়ে আছে। যুবতী আদিবাসিনীর দেহে যে একটু সান্ত্বনা পাবেন, তারও উপায় নেই। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, আমি যে তাকে কাছাকাছি থাকতে বলেছিলাম।'

এ প্রশ্নের উত্তর চৌহনের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। হিজ হাইনেসের গর্জন শুনে সে বুঝল আবহাওয়া ভাল নয়—দুর্যোগ ঘনিয়ে এল বলে। ভয়ে হাত-পা তার শিথিল হয়ে আসতে লাগল।

বিক্রম সিং আবার হুঙ্কার দিলেন, 'কে তাকে না জানিয়ে যেতে বলেছে! আই উইল শুট হিম।'

যাকে গুলি করে মারতে চান সে হাতের কাছে নেই। অগত্যা সব রাগটা গিয়ে পড়ল চৌহনের ওপর, 'ইউ শোয়াইন, খাড়া কিউ। নিকালো হিঁয়াসে—'

লাফ দিয়ে চৌহন বেরিয়ে গেল।

বাকি রাতটুকু খাঁচায়-পোরা বাঘের মত তাঁবুময় পায়চারি করে কাটিয়ে দিলেন বিক্রম সিং কিন্তু লছমনের পাত্তা পাওয়া গেল না। সারা বাত জেগে থেকে, উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির পায়ে ছটফট করে বিক্রম সিং সিদ্ধান্তটা পাকা কবে ফেললেন, লছমনকে দেখামাত্র গুলি করে মারবেন

চার

সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সাববাব পর ঠিক হল, জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে পছন্দমত জায়গা দেখে মাচান বেঁধে রেখে আসা হবে। তারপর দুপুরবেলা তাঁবুতে ফিরে লাঞ্চ খেয়ে এবং একটু বিশ্রাম করে বিকেলের দিকে মাচানে গিয়ে উঠতে হবে। সেখানে বাকি দিনটুকু এবং সমস্ত বাত চলবে প্রতীক্ষা—শিকারের প্রতীক্ষা।

রাত্রিবেলা কেউ আর ফিরবেন না, খাবাব সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হবে। মাচানে বসেই ডিনার পর্ব চুকনো হবে

মাচানের জন্য জায়গা দেখতে শিকারীরা সবাই যাবেন, বিক্রম সিংও তাঁদের সঙ্গে যাবেন। ইতিমধ্যে রোদ উঠে গেছে। আরুলকোটের বনভূমি যোজন যোজন জুড়ে সবুজ শিখার মত জ্বলছে। রাজা হলেও বিক্রম সিং ননীর পুতুল নন যে এটুকু রোদের আঁচে গলে যাবেন।

হাতির পিঠে পর পর দু'খানা হাওদা বসানো হল, তার ওপর লাল রেশমের ছত্রী। প্রথম ছত্রীর তলায় হিজ হাইনেস বসলেন, বাকি পাঁচজন শিকারী বসলেন পেছনের ছত্রীটির তলায় আর মাহুত সামনের দিকে।

শিকারীরা কেউ নিরস্ত্র নন। পাখি মারার জন্য শট গান, ৩৬৬ রাইফেল, বন্দুক তো আছেই। তার ওপর বাইনোকুলার, টোটা-ঝুলি—সরঞ্জামের ত্রুটি নেই।

হাতি, ঘোড়া, খচ্চর এবং পদাতিক—চতুরঙ্গে রণসজ্জা করে বিক্রম সিংরা কাল আরুলকোটে ়ছিলেন। আজ সকালে শুধু হাতি নিয়ে তাঁরা বেরুলেন।

গলায় কাঁসার ঘুণ্টি বাঁধা, ঠুন ঠুন করে সেটা বাজাতে বাজাতে রাজহস্তী চলতে লাগল। যেখানে তাঁবু ফেলা হয়েছিল সেখান থেকে পশ্চিমে যাচ্ছেন বিক্রম সিংরা। খানিক যাবার লম্বা লম্বা শর-ঘাসের জঙ্গল পড়ল। শর-জঙ্গল পেরিয়ে হাতি ঝিলকি নদীর পারে এসে ল। এখানে অল্প অল্প শালের বন।

হাতির পদভারে মাটি কাঁপছে। ঘুণ্টির আওয়াজে শালবন থেকে পাখিরা উড়ে উড়ে যাচ্ছে। হাইনেস বিক্রম সিংয়ের কোন দিকে লক্ষ্য ছিল না। সারারাত ঘুম হয় নি। অবশ্য প্রায় রাতই তাঁর বিনিদ্র কাটে। কিন্তু সে সব রাতের সান্ত্বনা আছে, তখন সুস্বাদু নারীমাংসে আর ও পানীয়ে তাঁকে ঘিরে উৎসব চলতে থাকে। কিন্তু কালকের মত এমন নিরুৎসব, বিস্বাদ, বনায় জর্জরিত রাত্রি বিক্রম সিংয়ের জীবনে আর কখনও আসে নি।

কাল রাতে চার বোতল হুইস্কি টানার পর ভাবা গিয়েছিল জগমোহন আজ সকালে আর তে পারবে না, উঠলেও নেশার ঘোর কাটবে না। কিন্তু কী আশ্চর্য, সকালবেলাতেই চোখ া সাদা হয়ে গেছে, মাথা বা হাত কিছুই কাঁপছে না। সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেছে সে।

জগমোহনের মুখে এই মুহূর্তে রসিকতার খই ফুটছে। অন্য শিকারীরা হেসে হেসে গড়িয়ে তে লাগলেন। কিন্তু বিক্রম সিং কিছুই যেন শুনতে পাচ্ছেন না; পেলেও তাঁর অর্ধমনস্ক তনায় রেখাপাত করছে না। পাখিদের ওড়াউড়ি বা হাতির গলাব ঘুণ্টি—কোন কিছুই যেন ছ নয়; অনেক দূরে কোন অবিশ্বাস্য জগতে ঘটছে।

কপালের দুধারে দুটো রক্তবাহী শিরা সমানে লাফিয়ে চলেছে। মাথার ভেতরটা টিপ টিপ ছে; রক্তের ভেতর ঝিঁঝির পাখার মতো একটানা শব্দ করে কী যেন কেঁপে চলছে।

উচ্চ হাস্যরোলের ভেতর হঠাৎ কমলনয়নের গলা শোনা গেল, 'বিক্রম—দেখ, দেখ—' কমলনয়নের স্বরে এমন একটা বিস্ময়ের ঢেউ ছিল যাতে চকিত হলেন বিক্রম সিং। পেছন বে বললেন, 'কী?'

'আমার দিকে না, ঐ নদীর দিকে তাকাও।' সামনে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন কমলনয়ন।

শালবনের ভেতর দিয়ে হাতিটা সত্যিকারের গজেন্দ্রগমনে চলেছে। রুপোলি হাঁসুলির মত লকি নদীও পাশে পাশে চলেছে; একমুহূর্তের জন্য কাছছাড়া হয় নি।

নদীব দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন বিক্রম সিং। অবাক, মুগ্ধ, খানিক-বা সম্মোহিত। তীরে ছড়ানো বাদামী পাথরের ওপর অসংখ্য ময়ূর বসে আছে। বিস্তৃত পেখম মেলে কেউ ছে। কেউ গুটিসুটি হয়ে ডানা মুড়ে আছে। কেউ-বা সঙ্গিনীকে ঠুকরে ঠুকরে আদরে-াগে ঝালাপালা করে ফেলছে। কেউ-বা ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে রূপের ছটায় চারদিক আলো র সগর্বে হেঁটে বেড়াচ্ছে। দু-চারটে ময়ূর আছে; তাদের খুব মজা করার ঝোঁক। তারা এর-পেছনে লেগে হুল্লোড় বাধিয়ে দিচ্ছে।

ময়ূর দেখতে দেখতে বিক্রম সিং বললেন, 'কুড়ি বছর আরুলকোটের জঙ্গলে শিকার তে আসছি। আগে আর এখানে ময়ূর দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। তোমার পড়ছে কমল?'

'না।' কমলনয়ন মাথা নাড়লেন, 'তুমি যেবার থেকে আসছ আমিও তো সেবার থেকেই সছি। আর সব পাখি এখানে দেখেছি, এক ময়ূর ছাড়া।'

'একসঙ্গে এত ময়ূর আগে দেখিনি।'

'আমিও।'

'আমিও, আমিও, আমিও—' সবাই সমস্বরে সায় দিল।

বিক্রম সিং বললেন, 'এত ময়ূর কোত্থেকে এল বল তো?'

'কি জানি।'

হিজ হাইনেসের শিকার-পার্টিতে একজন আছেন তাঁর নাম ভায়লাভাই পাঠক। পাঠকসা
সফল বিজনেসম্যান; লোহালক্কড়ের কারবারে লাখ লাখ টাকা করেছেন। কিন্তু এটাই ত
একমাত্র পরিচয় নয় এবং প্রধান পরিচয়ও না। বুরহনগড় স্টেটে তাঁকে 'বহুত বড়া খানেও
বলে একডাকে সবাই চেনে। আস্ত আস্ত পাঁঠা-খাসি-মুর্গি তিনি হজম করে ফেলেন। ত
খাওয়ার গল্প বুরহনগড়ে কিংবদন্তি হয়ে উঠেছে।

এমন উদর-চর্চা কদাচিৎ দেখা যায়। দিনরাত শুধু খাই-খাই আর খাবারের গল্প। জগ
যত সুখাদ্য আছে তাদের নাম-ধাম সমস্ত ভায়লাভাইর মুখস্ত। নানা দেশের রেসিপি তাঁর স
সঙ্গে ঘোরে। নিজে রাঁধতেও পারেন চমৎকার।

লুব্ধ সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে ভায়লাভাই ময়ূরগুলোকে দেখছিলেন। দেখতে দেখতে পাখিগু
হাঁড়ি-কাবাব, কোর্মা, কালিয়া ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে চোখের সামনে দুলতে লাগল।

সড়াৎ করে মুখের ভেতর ঝাল টেনে নিলেন ভায়লাভাই। তারপর ডাকলেন 'মহারাজ

বিক্রম সিং সাড়া দিলেন, 'কি বলছেন পাঠকসাহেব?'

'হুইস্কির সঙ্গে ময়ূরের মাংস সুপার্ব কম্বিনেশন—হেভেনলিও বলতে পারেন।'

'ময়ূরের মাংস খায় নাকি?' কমলনয়ন জিজ্ঞেস করলেন।

'নিশ্চয়ই খায়।' ভায়লাভাই খাড়া হয়ে বসলেন, 'ভাল করে হিন্দু হিস্ট্রি যদি পড়া থা
ডাক্তারজী, দেখতেন ময়ূরের মাংসের মত উপাদেয় বস্তু তখন আর ছিল না। রাজাদের প্র
খাদ্যই ছিল ময়ূর-মাংস আর মাধ্বী।'

কমলনয়ন বললেন, 'নিজের খাবার ইচ্ছে হয়েছে তাই রাজা-মহারাজা আর হিস্ট্রি ধরে ট
দিচ্ছেন?'

ভায়লাভাই উত্তেজিত হযে উঠলেন, 'আমি মিথ্যে কথা বলছি, মনে করছেন! ঠিক আ
তাঁবুতে ফিরেই প্রমাণ দেব, সেকালের রাজাব ময়ূর-মাংস খেতেন কিনা।'

একটু ব্যঙ্গের সুরেই কমলনয়ন বললেন, 'আপনি হিন্দু পিরিয়ডের হিস্ট্রি সঙ্গে নিয়ে ি
ঘোরেন নাকি?'

'নিশ্চয়ই।'

মাঝখানে থেকে জগমোহন ফোড়ন কাটল, 'ওতে খাবার-দাবারের নাম লেখা আছে
সঙ্গে রাখতেই হবে।'

জগমোহনের কথায় কেউ কান দিলেন না। কমলনয়ন বললেন, 'যদি হিন্দু রাজাদের ম
খাওয়া প্রমাণ করতে পারেন পাঁচশো টাকা দেব। না পারলে আপনি কত দেবেন?'

ভায়লাভাই বললেন, 'পাঁচশোর দশগুণ।'

কমলনয়ন কী বলতে যাচ্ছিলেন; তার আগেই বিক্রম সিং বলে উঠলেন, 'খাবার-দাবা
ব্যাপাবে পাঠকসাহেবের সঙ্গে বাজি ধরতে যেও না ডাক্তার, নির্ঘাত হেরে যাবে।' ভায়লাভাই
দিকে ফিরে বললেন, 'আপনি কি ময়ূর মারতে চান?'

মাথাটা ঘাড় পর্যন্ত হেলিয়ে তৎক্ষণাৎ শট্ গানটা তুলেন নিলেন ভায়লাভাই। গুলি পো
ছিল, ট্রিগার টানতে যাবেন ঠিক সেই সময় দৃশ্যটা চোখে পড়ল। নদীর পাড় ধরে, যেখা
ময়ূরগুলো আছে—লছমন একটি আদিবাসী মেয়েকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে। মেয়ে

ধ কাপড় বাঁধা; ফলে চিৎকার করতে পারছে না; তবে প্রাণপণে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ছে। কিন্তু বাঘের থাবার মত লছমনের মুঠি থেকে নিজেকে মুক্ত করে নেবে, মেয়েটার সাধ্য

এক-একটা হ্যাঁচকা টান মারছে লছমন আর মেয়েটা দশ-বারো হাত উড়ে উড়ে যাচ্ছে। দব দেখে ময়ূরদের রাজ্যে ভয়ের ছায়া পড়েছিল; ভীত সন্ত্রস্ত পাখিগুলো ডানা মেলে য়ে নদীর ওপারের শালবনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অগত্যা শট্ গান নামিয়ে রাখতে হল ভায়লাভাইকে। লক্ষ্যভেদ আর করা গেল না।

এদিকে ভ্রূ কুঁচকে গেছে হিজ হাইনেসের। লছমনরা খানিকটা দূরে থাকলেও চিনতে অসুবিধে নি। চিন্তিত অন্যমনস্ক সুরে বিক্রম সিং বললেন, 'লছমন কাকে ধরে নিয়ে চলেছে?'

কমলনয়ন বললেন, 'একটা আদিবাসী মেয়ে মনে হচ্ছে।'

'তা তো আমিও দেখতে পাচ্ছি; কিন্তু মেয়েটা কে?'

এ প্রশ্নের উত্তর কমলনয়নের জানা নেই; কাজেই তাঁকে চুপ করে থাকতে হল।

ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে লছমন আর সেই মেয়েটা। শালবনের ভেতর হাতিটা লক্ষ্য করেনি মন; করার মত সময়ও তার নেই। লছমনের ধ্যান জ্ঞান সব কিছুই এই মুহূর্তে মেয়েটার য় সঁপে দেওয়া।

বিক্রম সিং মাহুতকে বললেন, 'লছমনকে ডাক তো—'

মাহুত ডাকল, লছমন শুনতে পেল না। মাহুত আবার ডাকল, এবার ডাকটা লছমনের কানে ছল না। দেখতে দেখতে একটা উঁচু টিলার ওপারে হারিয়ে গেল লছমনরা।

মেয়েটা কে? ভাবতে চেষ্টা করলেন বিক্রম সিং। হঠাৎ একটা সম্ভাবনা তাঁর মনের ভেতর য় দুরন্ত বেগে খেলে গেল। তবে কি—তবে কি রাতের অন্ধকারে তাঁর বিছানায় একটি তীদেহ ভেট দেবার জন্য কাল রাতে লছমন বেরিয়ে পড়েছিল? সমস্ত রাতে হয়ত পাবেনি; জ সকালে একটি মেয়ে যোগাড় করে এইমাত্র ফিরছে।

এই মেয়েটি নিশ্চয় তাঁরই জন্য, বিক্রম সিং ভাবলেন। নিশ্চয়ই। এর ভেতরে সংশয়ের দুমাত্র অবকাশ নেই।

ভায়লাভাই ময়ূর মারবেন বলে হাতিকে থামতে হয়েছিল। ঘুন্টি বাজিয়ে আবার চলতে করল সে।

তারপর সারা দুপুর জঙ্গলে ঘুরে মাচান বাঁধার জন্য পছন্দমতো অনেকগুলো জায়গা খুঁজে করলেন বিক্রম সিং; নিশানা ঠিক রাখতে জায়গাগুলোতে দাগ দিলেন। তাতে যারা মাচান বে তাদের সুবিধে হবে। অবশেষে সূর্যকে মধ্য-আকাশের সীমানা পার করিয়ে পশ্চিম ন্তের দিকে অনেকখানি নামিয়ে দিয়ে তাঁবুতে ফিরে এলেন।

জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরেছেন ঠিকই, মাচানের জন্য জায়গাও পছন্দ করেছেন—কিন্তু কোনটাই নে নয়। লছমনের সঙ্গে সেই আদিবাসিনী মেয়েটাকে দেখার পর থেকেই একটা দূরমনস্কতা ক্রম সিংকে ঘিরে আছে।

তাঁবুতে ফিরে অন্যমনস্কতার ভেতরেই মাচান বাঁধার লোক পাঠিয়ে দিলেন হিজ হাইনেস; ন করলেন, মধ্যাহ্নের আহার সারলেন। তারপর নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে বিছানায় শরীর প দিলেন। একটু বিশ্রাম করে, জঙ্গলের মাথায় রোদ থাকতেই আবার বেরিয়ে পড়তে হবে। ভূমির অন্তঃপুরে কোন একটি মাচানে শিকারের সন্ধানে চলবে নিশিযাপন।

য়ে পড়েছেন ঠিকই, কিন্তু কাল রাতের মত ঘুম আসছে না। বার বার চকিতে-দেখা সেই

আদিবাসিনী মেয়েটা ভাবনার অতল স্তর ঠেলে ঠেলে উঠে আসছে।

মেয়েটি যদি তাঁর জন্যই আনা হয়ে থাকে, ঠিক সময় মতন লছমন তাকে নিয়ে হাজি হবে। তবু ধৈর্য হারিয়ে ক্রমশ অস্থির হয়ে উঠলেন বিক্রম সিং।

আস্তে আস্তে বালিশে ভর দিয়ে উঠে বসলেন তিনি।

বিছানায় বসে কী করবেন, বিক্রম সিং যখন ভাবছেন সেই সময় চৌহনের গলা শো গেল, 'হুজৌর মহারাজ—'

বিক্রম সিং সাড়া দিলেন, 'কী বলছিস?'

'লছমন এসেছে; মহারাজের দর্শন মাঙছে।'

বিক্রম সিংয়ের স্নায়ুগুলো ঝড়ের দোলায় অরণ্যের মতো দুলে উঠল। যৌবনের শুরু থে বিছানার প্রান্তে কত যুবতী যে ধরা দিয়েছে, হিসেব নেই—মনে নেই। মনে রাখার প্রযোজ নেই। রাত-বিলাস তাঁর কাছে সামান্য একটা খেলা মাত্র; প্রমোদ শেষে সহচরীদের আবর্জন মত তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন।

কিন্তু ঐ আদিবাসিনীটির জন্য—যাকে এখনও ভাল করে দ্যাখেননি—এমন চঞ্চল বে হলেন বিক্রম সিং, তাঁর নিজের কাছেই এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

বিক্রম সিং বললেন, 'লছমনকে ভেতরে পাঠিয়ে দে।'

তাঁবুর ভেতরে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে কুর্নিশ ঠুকল লছমন। তারপর উঠে হাতজোড় ক দাঁড়াল। বলল, 'হুজৌর মহারাজ, কাল রাতে আপনি আমার খোঁজ করেছিলেন। আমি ছিল না।'

লছমনকে দেখা মাত্র গুলি করবেন, সেই সঙ্কল্পটা ভুলে গেছেন বিক্রম সিং।

শান্ত স্বরেই বললেন, 'কোথায় গিয়েছিলি?'

লছমন যা জানাল, সংক্ষেপে এইরকম। মহারাজা হচ্ছেন স্বয়ং ঈশ্বরের অংশ। এব অসময়ে আসার জন্য তাঁর ভোগের কোন ব্যবস্থাই করে রাখতে পারেনি। তাই কাল রাতে যুবতী মেয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল। না জানিয়ে গেছে, তাতে অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে মহারাজ যে শাস্তি দেবেন সে মাথা পেতে নেবে।

হিজ হাইনেস শাস্তির কথা ভাবছিলেন না। চোখ কুঁচকে বললেন, 'সক্কালবেলা ঝিলবি পার দিয়ে কাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছিলি?'

লছমন চমকে উঠল, 'আপনি আমায় দেখেছিলেন মহারাজ?'

'হ্যাঁ।' কী ভাবে দেখেছেন জানিয়ে হিজ হাইনেস বললেন, 'মেয়েটা কে?'

'আমাদের জঙ্গলের ওপারে পশ্চিম দিকে ঘেঁষে যে মারিয়াদের গাঁও আছে, মেয়েটা গাঁওয়ের।'

'আদিবাসী?'

'জী মহারাজ।'

'পেলি কি করে?'

'আন্ধারে ঘরের ভেতর ঘুমোচ্ছিল; বেড়া কেটে বাজপাখির মত ছোঁ মেরে তুলে নি এলাম।'

'মনে হচ্ছিল, আসতে চাইছে না।'

'না মহারাজ, বহুত তেজি চিড়িয়া। তাই জোর করতে হয়েছে।'

'রেখেছিস কোথায়?'

'আমার ঝোপড়িতে।'

'ঠিক আছে, এখন যা। রাত্তিরে খবর দিলে নিয়ে আসিস।'

আভূমি নত হয়ে পিছু হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল লছমন।

এর আগেও বিক্রম সিং লক্ষ্য করেছেন, এবারও করলেন, লছমন লোকটার কর্তব্যবোধ ত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাকে কিছুই বলতে হয় না; যখন যেটি দরকার হাতের কাছে ঠিক সেটি যুগিয়ে য়।

লছমনের রাজভক্তির তুলনা নেই।

পাঁচ

বিকেলবেলা, রোদে যখন গলানো গিনির রঙ ধরেছে—সেই সময় মাচান বাঁধার লোকগুলো ঙ্গলের অন্তঃপুর থেকে ফিরে এল।

তাদের ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হিজ হাইনেস বিক্রম সিং সদলে বেরিয়ে পড়লেন। সকালবেলা তিতে হাওদা চড়িয়ে বেরিয়েছিলেন; এবাবও তাই বেরুলেন। সঙ্গে নিলেন প্রচুর পরিমাণে াহার্য, কিছু পানীয়, নানারকম শিকারের সরঞ্জাম—বন্দুক, রাইফেল, শট্‌গান, কার্তুজ ইত্যাদি ত্যাদি।

সন্ধ্যের আগেই মাচানে পৌঁছে গেলেন হিজ হাইনেস। মাচানের তলায় বাঁশের প্রকাণ্ড বেক্ষিত ঘরের মতো তৈরি করা হয়েছে। শুধু এই মাচানের তলাতেই না, জঙ্গলে যত মাচান ধা হয়েছে সবগুলোর ঐরকম ঘর আছে। যতবার বিক্রম সিং আরুলকোটে আসেন ততবারই রকম ঘব বাঁধা হয়। ওগুলো হাতি আর মাহুতের জন্য নির্দিষ্ট। শিকারীরা যখন মাচানের পর বসে শিকারের প্রতীক্ষা করেন তখন মাহুত আর হাতি ঐ ঘরে লুকিয়ে থাকে।

এমনিতে হাতিকে বাইরে রাখা নিরাপদ নয়: বাঘে আক্রমণ করতে পারে দ্বিতীয়ত হাতি খলে শিকার কাছে ঘেঁষতে নাও পাবে।

যাই হোক, বিক্রম সিং দলবল নিয়ে মাচানে উঠলেন; অদূরে একটা নধর ছাগল বাঁধা। ওটা াপ। এদিকে হাতি নিয়ে মাচানের তলায় মাহুতটা আত্মগোপন করল।

এখানে বনভূমি অত্যন্ত নিবিড়। বাইরে এখন হয়ত রোদ নেই; তবে মৃদু বিষণ্ণ একটু ালো একেবারে দুর্লভ নয়। কিন্তু এখানে—অরণ্যের এই অন্দরমহলে—এর মধ্যেই অন্ধকার নমে এসেছে। মাথার ওপর পাখিদের চেঁচামেচি, ডানা ঝাপটানির আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ারাদিন খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে এইমাত্র ওরা ঘুরে ফিরে এল বুঝি। আর শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝি, না রকমের পতঙ্গ আর পোকাদের মিলিত কণ্ঠসাধনা।

দেখতে দেখতে অন্ধকার গাঢ় হল। পাখি আর পতঙ্গদের চেঁচামেচি স্তিমিত হতে হতে এক ময় থেমে গেল। শুধু অশান্ত ভাবে একটানা যা বেজে চলল তা ঝিঁঝিদের বিলাপ। ঝিল্লিস্বর নভূমির স্তব্ধতা যেন হাজার গুণ বাড়িয়ে দিতে লাগল।

রিস্টওয়াচে রেডিয়ম ডায়ালে সময় অনড় হয়ে রয়েছে। নিশ্চলতার ঈশ্বর যেন তার ওপর র করে আছে; সামনের দিকে সে বুঝি এগুতে চায় না।

পাঁচ ব্যাটারির হান্টিং টর্চ আর ডবল ব্যারেল রাইফেলগুলো হাতের কাছেই মজুত। কোথাও ন্দেহজনক একটু আওয়াজ পেলেই হয়; শিকারীরা স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মত টান টান রে বসে আছেন। অবশ্য জগমোহন আর ভায়লাভাই বাদে। অন্ধকারেই এই দু-জন অন্য কটা গুরুতর ব্যাপারে ধ্যান-জ্ঞান সঁপে দিয়েছেন। টিফিন-ক্যারিয়ারের বড় বড় খোপগুলো

থেকে কাটলেট বার করে নিঃশব্দে মুখে পুরছেন ভায়লাভাই আর হুইস্কির বোতল খুলে গলা উপুড় করে দিচ্ছে জগমোহন। শিকারের চাইতে এই দুটো ব্যাপারে তাদের আগ্রহ এবং দক্ষতা অনেক বেশি।

প্রথম কিছুক্ষণ শিকারের সন্ধানে চোখ-কান সজাগ করে বসেছিলেন বিক্রম সিং। বিগ এবং স্মল—সবরকম গেমের প্রতিই তাঁর মোহ অপরিসীম। অনেকের মতে রাজকীয় ব্যসনের ভেতর শিকারই উত্তেজনায় মজায় সর্বোত্তম।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ মনযোগটা শিকারের দিকে নিবদ্ধ রাখতে পারলেন না বিক্রম সিং। হঠাৎ সেই আদিবাসিনী মেয়েটা চোখের ওপর ভেসে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মনোযোগটা বিচ্ছিন্ন আর শিথিল হয়ে এল। যে-কোন মুহূর্তে একটা চিতা অথবা ডোরাকাটা কিংবা বাইসন যে সামনে এসে দাঁড়াতে পারে সে কথা আর মনে রইল না।

শিকার এবং নারীবিলাস—কোন গেমটা বেশি উত্তেজক, সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে দ্বিতীয়টাই বিক্রম সিংকে বেশি করে আকর্ষণ করল। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, 'আমি তাঁবুতে ফিরব; তোমরা বোসো।'

সহচরেরা বলেন, 'সে কি!'

'হ্যাঁ।'

'শরীর কি ভাল লাগছে না মহারাজের?'

'শরীর ভালই।'

'তবে?'

এ-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'তোমরা রাত জেগে দ্যাখো কিছু ব্যাগ করতে পার কিনা। ভোরে হাতি পাঠিয়ে দেব।'

হঠাৎ তাঁবুতে ফেরা নিয়ে কেউ আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। শুধু কমলনয়ন বললেন, 'কিন্তু এত রাতে একা একা ফেরা কি ঠিক হবে বিক্রম। চিতাগুলোর কাণ্ড তো জানো, গাছের ডালে উঠে থাকে। লাফিয়ে পড়লে—'

বাধা দিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'হাতের ডবল ব্যারেল রাইফেলটা যখন আছে তখন নিশ্চিন্ত থাকতে পার।' বলে মাহুতকে ডেকে হাতি বার করিয়ে তাঁবুর দিকে রওনা হলেন।

বিক্রম সিং যখন তাঁবুতে ফিরলেন, রাতটা দ্বিতীয় যামের দেউড়িতে এসে থেমেছে। হেমন্তের শুরু, অর্থাৎ হিমঝরার ঋতু এসে গেছে। ময়দার মত গুঁড়ো গুঁড়ো কুয়াশা ঘন হয়ে জমাট বেঁধে আরুলকোটের জঙ্গলের ওপর ছড়িয়ে আছে।

বাঘ এবং হিংস্র জন্তুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তাঁবুগুলোর চারধারে মশাল আর হ্যাজাক জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে, সমস্ত রাত ওগুলো জ্বলবে। কুয়াশার সঙ্গে যুদ্ধ করে রাতের এই দ্বিতীয় প্রহরেই ওরা নির্জীব হয়ে গেছে।

নিজের তাঁবুতে আসতেই চৌহন রাইডিং বুট, বেল্ট, শিকারের পোশাক খুলে অল্প আর উষ্ণ আরামদায়ক জলে গা মুছিয়ে, পা ধুইয়ে, স্লিপিং গাউন পরিয়ে পায়ের কাছে ঘাসের চটি এগিয়ে দিল।

বিক্রম সিং বললেন, 'লছমনকে ডেকে আন, মেয়েটাকে যেন নিয়ে আসে।' বলে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে হেয়ার টনিকের শিশি খুললেন; চুলের স্বাস্থ্য রক্ষার্থে আঙুলের ডগায় খানিকটা নির্যাস তুলে মাথায় মেখে নিলেন, তারপর চুলগুলো পেছন দিকে ফিরিয়ে আলতো হাতে ব্রাশ টানতে লাগলেন।

চুলের পরিচর্যা শেষ হতে না হতেই ফিরে এসে চৌহন জানাল, লছমন এসে গেছে, মেয়েটাকে নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছে।

বিক্রম সিং বললেন, 'ভেতরে আসতে বল।'

চৌহন বাইরে গিয়ে লছমনকে ভেতরে পাঠিয়ে দিল। হিজ হাইনেস যেমন ছিলেন তেমনি বসে রইলেন। কোন রকম ব্যস্ততা, চাঞ্চল্য বা আগ্রহ—কিছু তাঁর মধ্যে দেখা গেল না। প্রলোভনের কোন ছায়াই বিক্রম সিংয়ের চোখেমুখে ফোটে নি। শিকারের আসর থেকে খানিক আগে শুধু ঐ মেয়েটির জন্যই যে উঠে এসেছেন এখনকার এই নিস্পৃহ উদাসীন কৌতূহলশূন্য বিক্রম সিংকে দেখলে সে কথা কে বলবে। কামশাস্ত্রে এদের নামই কি চতুর নায়ক।

পেছন দিকে লছমন আর সেই মেয়েটি তাঁবুতে ঢোকার দরজার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে। লাইফ-সাইজের বিশাল আয়নায় তাদের ছায়া পড়েছে। মেয়েটির মুখ এখনও কাপড়ে বাঁধা, একটা হাত লছমনের থাবার ভেতর আবদ্ধ।

ধীরেসুস্থে মুখে ক্রীম লাগালেন বিক্রম সিং; গলার অনাবৃত অংশে স্কিন-টনিক লোশন। তারপর নেলকাটার দিয়ে নখের অনাবশ্যক অংশগুলো ছেঁটে দিলেন। বয়-বেয়ারা ভৃত্য বাহিনী জুতো পরানো থেকে কোমরে বোতাম আটকানো পর্যন্ত সব কিছুই করে দেয়। কিন্তু শোবার আগে প্রতিদিন নিজে নখ কাটেন বিক্রম সিং—নিজের জন্য এই পরিশ্রমটুকু না করলে তাঁর ভাল লাগে না।

খুব আস্তে লছমন ডাকল, 'হুজুর মহারাজ—'

ওরা এসেছে তা যেন জানেন না এমনভাবে বিক্রম সিং বললেন, 'ও তুই এসে গেছিস—'

'জী মহারাজ—'

এবার আস্তে আস্তে অচঞ্চল অপ্রমত্ত ভঙ্গীতে ঘুরে বসলেন বিক্রম সিং।

সঙ্গের মেয়েটিকে দেখিয়ে লছমন বলল 'ওহী লড়কী মহারাজ—'

'মুখ বাঁধা কেন?'

'চিল্লাবে বলে বেঁধে রেখেছি।'

'খুলে দে।'

মুখের বাঁধন খুলে দিল লছমন। মেয়েটা কিন্তু চিৎকার করল না; স্থির নিষ্পলকে বিক্রম সিংয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তার দুই চোখ দু-টুকরো আগুনের মতো জ্বলতে লাগল, নাকি দেহের সব রক্ত সেখানে গিয়ে জমা হয়েছে; যে কোন মুহূর্তে সে দুটো ফেটে গিয়ে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

এমনভাবে তাকিয়ে থাকলে আরাম পাবার কথা নয়। বিক্রম সিং অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। বললেন, 'ওকে কাছে নিয়ে আয়।'

হাত ধরে একরকম টানতে টানতে মেয়েটাকে মুখোমুখি এনে দাঁড় করাল লছমন।

অদূরে একটা সোফা দেখিয়ে হাতের ইঙ্গিতে বসতে বললেন বিক্রম সিং; মেয়েটা বসল না। দুর্বিনীত ভঙ্গিতে ঘাড় বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিক্রম সিং এবার খুঁটিয়ে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে দেখতে লাগলেন। তামাটে মসৃণ শরীর; তার ওপর তেলতেলা আভার মত কী যেন মাখা। লছমন সকালেই জানিয়েছিল মেয়েটা মারিয়া। কিন্তু মারিয়াদের মতো নাক তার মোটা বা খাঁদা নয়। সেটাতে সুচারু লম্বা একটি ছাঁদ আছে। ঠোঁট দুটো ভারি, কমলার কোয়ার মত সরল এবং পুষ্ট। কোমর সরু; মাথাভর্তি কোঁচকানো চুল, আঙুলের ভাবটা মোটার দিকে। হাতের চওড়া হাড় সুষমার চাইতে শক্তির

কথাটাই বেশি করে ঘোষণা করছে। ভুরু দুটি কিন্তু সরু তুলিতে টানা। চোখ দুটিও মারিয়া সুলভ নয়, ঘন পালকে-ঘেরা এবং দীর্ঘ।

পরনে হলুদ শাড়ি আর লাল জামা। গয়না বলতে রুপোর কাঙনা, হার এবং দুল। স চাইতে যা বেশি করে আকর্ষণ করে তা হচ্ছে মেয়েটির উদ্দাম অফুরন্ত স্বাস্থ্য।

শ্রী, ব্যক্তিত্ব, লাবণ্য—সব মিলিয়ে মেয়েটির ভেতর এমন কিছু আছে যা আর দশট পাহাড়ী মেয়ের থেকে আলাদা; আদিবাসিনী বলে তাকে যেন মনে হয় না। আদিম বন্যতা ছাড তার ভেতর আরো এমন কিছু আছে যা ব্যাখ্যা করা যায় না।

চমৎকার স্বাস্থ্য সত্ত্বেও মেয়েটিকে কিন্তু দুর্বল দেখাচ্ছে। মুখ শুকনো, চুল উস্কোখুস্কে আরক্ত চোখ খানিক উদ্‌ভ্রান্ত, মুখ না-খাওয়া না স্নানের যে চেহারা অনেকটা সেইরকম।

বিক্রম সিং লছমনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ খায় নি?'

'জী নহী মহারাজ।'

'চানও করে নি মনে হচ্ছে।'

'জী মহারাজ।'

'ঘুমোয় নি নিশ্চয়।'

'নহী মহারাজ।'

হিজ হাইনেস বিরক্ত হলেন। রাগত সুরে বললেন, 'একে চান করতে, খেতে দিস ি কেন?'

লছমন বলল, অনেকবার বলেছি মহারাজ, লকীন ও কিছুই করে নি।

'আচ্ছা তুই বাইরে গিয়ে দাঁড়া; ডাকলে আসবি।'

যথানিয়মে রাজভক্তি দেখিয়ে লছমন বেরিয়ে গেল।

মেয়েটা জমাট রক্তপিণ্ডের মত চোখে নির্নিমেষে তাকিয়ে আছে। আগেও আরুলকো এসে অনেক স্বাস্থ্যবতী আদিবাসিনীর সংস্পর্শে এসেছেন বিক্রম সিং। তারা তাঁবুতে ঢুকলে জড়সড় হয়ে থাকত; হাত ধরে টানলে শিকড়সুদ্ধ উঠে আসা লতাটির মত বুকের ওপর লুটিে পড়ত। কিন্তু এ মেয়েটির জাত আলাদা, ধাঁচ আলাদা, গোত্র ভিন্ন। আগুনের উদ্ধত ঋজু শিখ অথবা ঝকঝকে ধারাল ফলাই এর উপযুক্ত উপমা।

বছরে দুবার করে বিশ বছরে চল্লিশবার আরুলকোট এসেছেন বিক্রম সিং। তিনি জানে এই জঙ্গলের সীমারেখা ঘিরে আদিবাসীদের বসতি—তাদের কারো নাম অবুঝমাড়, কারে পায়া, কারো মারিয়া, কারো মুরিয়া। ওদের ভাষা তিনি জানেন না, তবে কাজ চালাবার ম দুচারটে শব্দ শিখেছেন।

বিক্রম সিং বললেন, 'বোসো।'

মেয়েটি এবারও বসল না। চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে নির্ভুল ইংরেজিতে বলল, 'আর য়ু কিং?'

বিক্রম সিং চকিত হলেন। এই অঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষাতেই বললেন, 'তুমি ইংরেজি জানো!'

'জানি। কিন্তু—'

'কী?'

'আপনি আমাদেব ভাষা জানেন না।'

'জানি না!' বিমূঢ়ের মত প্রতিধ্বনি করলেন বিক্রম সিং।

'না।' মেয়েটির স্বভাবের কোন প্রান্তেই ভয় বা সঙ্কোচের অবকাশ নেই। দৃঢ় কঠিন সুরে

সে বলতে লাগল, 'আমি মারিয়া, আর আপনি যা বলছেন তা 'পায়া'দের ভাষা। তা-ও শুদ্ধ নয়, ভুলে ভর্তি।'

'তুমি 'পায়া'দের ভাষা জানো?'

'জানি বৈকি। 'পায়া', 'অবুঝমাড়', 'মুরিয়া'—সবার ভাষাই জানি। কাছাকাছি থাকি, প্রতিবেশী। ওদের ভাষা জানাই তো উচিত।'

মেয়েটিকে যত দেখছেন, তার নির্ভুল ইংরেজি যত শুনছেন, কথা বলাব মার্জিত ঋজু ভঙ্গিটা যত লক্ষ্য করছেন ততই অবাক হয়ে যাচ্ছেন বিক্রম সিং। তাঁর বিস্ময় যেন একটু একটু করে শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছে যেতে লাগল।

বিক্রম সিং বললেন, 'তুমি তো আদিবাসীদের মেয়ে—'

'হ্যাঁ।' মেয়েটি মাথা নাড়ল, 'সে জন্য আমি গর্বিত।'

'নিজের জাত যা-ই হোক সে জন্যে গৌরব বোধ করা অবশ্যই উচিত। তবে আমি সেদিক ভেবে বলিনি।'

একটু চুপ করে রইল মেয়েটা। তারপর বলল, 'কোন দিক ভেবে বলেছেন?'

'এত সুন্দর ইংরেজি তুমি কোথায় শিখলে?'

ফাদারদের কাছে।'

'ফাদার!'

'হ্যাঁ। মানে ঐ মিশনারী।'

বিক্রম সিংয়ের মনে পড়ে গেল, আরুলকোট জঙ্গলের বাইরে মধ্যপ্রদেশের সুবিশাল বনভূমি ছড়িয়ে রয়েছে। সেখানে বহুকাল ধরে বিদেশী মিশনারীরা আদিবাসীদের ভেতর সেবাব্রত চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চার্চ বসিয়েছে, হাসপাতাল বানিয়েছে, স্কুল-কলেজ করেছে। শিক্ষাদীক্ষাহীন বনের মানুষদেব লেখাপড়া শিখিয়ে হাত ধরে ঝকমকে সভ্য জগতের মাঝখানে পৌঁছে দিচ্ছে। এই মেয়েটি তাদের আলোয় আলোকিত।

হঠাৎ মেয়েটি বলল, 'ইউ আর সার্টেনলি কিং বিক্রম সিং?'

বিক্রম সিং পাল্টা প্রশ্ন কবলেন, 'কেমন করে তুমি আমার নাম জানলে?'

'এটা জানতে কষ্ট করতে হয় না।'

'কী রকম?'

'বছরে দু-বার করে আপনি এখানে আসেন তো?' মেয়েটা সোজাসুজি বিক্রম সিংয়ের চোখের দিকে তাকাল।

'আসি।' বিক্রম সিংও তাকালেন; ভ্রূ কুঁচকে গেল তাঁর।

'আপনি এখানে হাজির হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের গ্রামগুলোতে যেখানে যেখানে সুন্দরী মেয়ে আছে, হাহাকার পড়ে যায়। ছেলেবেলা থেকে আপনার নাম এদিককার মেয়েদের জপের মালা হয়ে উঠেছে।' একটু থামল মেয়েটা; জোরে জোরে বারকয়েক শ্বাস টেনে পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'আমার নিজের অভিজ্ঞতা বলে দিয়েছে আপনি রাজা বিক্রম সিং। তাছাড়া—' ঘৃণায় তার চোখ দপ্ দপ্ করতে লাগল।

চোয়াল পাথরের মত কঠিন হয়ে উঠেছে বিক্রম সিং-এর। চাপা তীব্র স্বরে তিনি বললেন, 'তা ছাড়া কী?'

'রাক্ষসের মতো ঐ লোকটাও আপনার নাম বলেছে।'

বিক্রম সিং বুঝলেন, 'রাক্ষস' লছমনের উপমা।

মেয়েটা আবার বলল, 'রাক্ষসটা আরো বলেছে, আপনার জন্যেই ঘরের বেড়া কেটে মুখে কাপড় বেঁধে আমাকে নিয়ে এসেছে।'

বিক্রম সিং কিছু বললেন না; ঠোঁট দুটো শক্তবদ্ধ করে স্থির নিষ্পলকে মেয়েটাকে শুধু দেখতে লাগলেন। আদিবাসিনী এই যুবতীটির ওপর রাগও হচ্ছে; আবার বিচিত্র কৌতুকও বোধ করছেন তিনি। এই মেয়েটাকে ঘিরে তাঁর মন অনুভূতির দুই প্রান্তে এই মুহূর্তে দোল খেয়ে চলেছে।

মেয়েটা আবার বলে উঠল, 'আমাকে আপনার কী দরকার? কেন আমাকে লোক পাঠিয়ে ধরে এনেছেন?' মেয়েটা একই ভাবে তাকিয়ে আছে। চোখ আগেই আরক্ত ছিল; এবার মনে হল সে-দুটি ফেটে পিচকিরির মতো রক্ত ছুটবে।

আদিবাসিনী হলেও মেয়েটা তো যুবতী। তা ছাড়া মিশনারীদের সংস্পর্শে এসেছে, লেখাপড়া শিখেছে। সে এতই সরলা যে হিজ হাইনেসের তাকে দিয়ে কী প্রয়োজন বুঝতে পারছে না? না কি সব বুঝেও জিজ্ঞেস করছে?

একটু ইতস্তত করলেন বিক্রম সিং। মেয়েটার প্রশ্ন এমন ধারাল, তীব্র এবং সরাসরি যে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে বাধল। একটু ভেবে তিনি বললেন, 'ধরো তোমার সঙ্গে একটু আলাপ-পরিচয় করব বলে ঐ লোকটাকে পাঠিয়েছিলাম। গল্প-টল্প করা ছাড়া আর কী দরকার; কিচ্ছু না।'

'আলাপ করার ইচ্ছে হয়েছিল!' সংশয়ে মেয়েটার চোখ কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু—'

'কী?'

'আপনার নামটাই শুধু জানি কিন্তু আপনাকে চিনি না; আপনিও আমাকে চেনেন না। তা হলে ইচ্ছেটা হল কী করে?'

বিক্রম সিং একটু চাতুরালি খেললেন, 'তুমি আমাকে চেন না, আমি কিন্তু তোমাকে চিনি। দূর থেকে দেখেছি।'

চাপা তীক্ষ্ণ স্বরে মেয়েটা চেঁচিয়ে উঠল, 'মিথ্যে কথা।'

'না, সত্যি।'

'সত্যিই যদি, আমাকে ডেকে পাঠান নি কেন? আলাপ করে যেতাম। তার বদলে—' বলতে বলতে মেয়েটা হঠাৎ থেমে গেল।

'তার বদলে কী?'

'চোরের মত অন্ধকারে লোক পাঠিয়েছিলেন কেন?'

মেয়েটা তাঁকে চোর বলছে, লম্পট বলছে, যা ইচ্ছা তাই বলছে। রাজা বলে বিন্দুমাত্র সম্মানও জানাচ্ছে না। তবু রাগের চাইতে তাঁর মধ্যে কৌতুকের খেলাটাই যেন অনেক বেশি করে চলছে। আবার খানিকটা সম্ভ্রমও বোধ করছেন। ব্যক্তিত্ব আর প্রখরতার ধাতুতে তৈরি এমন মেয়ে আগে আর কখনও দ্যাখেন নি বিক্রম সিং। তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তোমার নাম কী?'

'লিমি। কিন্তু আমার কথার জবাব তো দিলেন না।'

বিক্রম সিং বিব্রত বোধ করলেন। কিন্তু মনোভাবটা গোপন করে বললেন, 'এমনি ডেকে পাঠালে তুমি তো আসতে না। তাই—'

'ডেকেই দেখতেন।' স্পষ্ট নির্ভর সুরে লিমি বলল। তার মধ্যে সঙ্কোচ জড়তা অথবা ভয়ের অবকাশ নেই।

বিক্রম সিং চুপ করে ভাবতে লাগলেন।

লিমি তীক্ষ্ণ গলায় বলতে লাগল, 'আসলে আপনার মতলব খারাপ। আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, আমার ক্ষতি করলে ভীষণ বিপদে পড়বেন।'

বিক্রম সিং স্তম্ভিত। কেউ যে তাঁর মুখের ওপর এত সহজে এ জাতীয় কথা বলতে পারে তা ছিল অভাবনীয়। তাঁর চল্লিশ বছরের নারীসঙ্গময় উৎসবের জীবনে এমন একটি দুঃসাহসিকতার অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। একই সঙ্গে তীব্র আকর্ষণ এবং বিতৃষ্ণা অনুভব করলেন বিক্রম সিং। তার ওপর সেই কৌতুকটা তো ছিলই। আস্তে আস্তে বললেন, 'কী বিপদে পড়ব শুনি?'

'শুনতে চান সত্যি?'

'সত্যি বৈকি।'

'আপনার লোক আমাকে চুরি করে এনেছে; এ খবর নিশ্চয়ই এতক্ষণে চারদিকে রটে গেছে।'

ভালোমানুষের মত মুখ করে বিক্রম সিং বললেন, 'রটবার তো কথাই।'

লিমির নীলাভ-পিঙ্গল চোখ ধকধকিয়ে উঠল, 'খোঁজাখুঁজি হুলুস্থুলুও পড়ে গেছে। ফাদাররা সে খবর নিশ্চয়ই পেয়ে গেছেন, আর পেয়েছেন কমিশনার সাহেব—'

বিক্রম সিং চমকে উঠলেন, 'কমিশনার সাহেব!'

'হ্যাঁ, এই ডিস্ট্রিক্টের কমিশনার—মিস্টার শুক্লা। খুব কড়া লোক; তাঁর দাপটে বাঘ-বকরি একঘাটে জল খায়। এখানে আমাকে পেলে কী হবে জানেন?'

'কী?' অন্যমনস্কের মতো উচ্চারণ করলেন বিক্রম সিং।

'আপনার কোমরে রশি পড়বে।'

কমিশনার সাহেব! সেই বান্দর-কে-বাচ্চাটা! শরীরের পেশীগুলো কঠিন হয়ে উঠল বিক্রম সিংয়ের; দাঁতের পাটি শক্তবদ্ধ। ধারাল ছুরির ফলায় কেউ যেন তাঁর মুখখানা গভীর রেখাময় করে তুলতে লাগল। মনে মনে বিক্রম সিং ভাবলেন, লোকটা একবার তাঁর জঙ্গলের সীমানায় পা দিয়ে দেখুক।

মনোভাবটা শেষ পর্যন্ত বাইরে বেরিয়ে আসতে দিলেন না বিক্রম সিং। মুখ থেকে হিংস্র কাঠিন্য ধীরে ধীরে মুছে গেল। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, লিমির স্নান-খাওয়া হয় নি। বললেন, 'তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছ, এবার বোসো। সারাদিন খাও নি, খাবার আনতে বলি?'

'না।'

'কী, না?'

'আমি খাব না, বসব না। নিজের ভাল যদি চান, এক্ষুণি আমাকে আমাদের গাঁয়ে দিয়ে আসুন।'

একটু কী ভেবে খুব সহজ সুরে বিক্রম সিং বললেন, 'গ্রামে ফিরতে চাও; নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেব। কিন্তু—'

রূঢ়স্বরে লিমি বলল, 'কিসের কিন্তু? বাহানাটা কিসের?'

'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এত রাত্রে যাওয়া তো ঠিক না।' বিক্রম সিং বোঝাতে চেষ্টা করলেন।

'কেন ঠিক নয়?' লিমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

'সাপ আছে, শের আছে, ভাল্লুক আছে। সকালবেলা আমি নিজে গিয়ে তোমাকে দিয়ে আসব।'

লিমি এবার আর কিছু বলল না; রাত এবং হিংস্র জন্তুদের কথা বিবেচনা করে এ-প্রস্তাবে বোধ হয় সে রাজী।

বিক্রম সিং বললেন, 'তা হলে এবার খেয়ে নাও।'

এতক্ষণে লিমির মনে হল, খিদে পেয়েছে। পেটের ভেতর কেউ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার টিপে টিপে ধরছে। তা ছাড়া বিক্রম সিং নামে এই লোকটাকে যত খারাপ আর ভয়ঙ্কর মনে হয়েছিল আসলে সে হয়ত ততখানি খারাপ বা ভয়ঙ্কর না। যৌবনের শুরু থেকে এই লোকটার লাম্পট্য আর নারীবিলাস সম্বন্ধে অজস্র ভীতিকর কিংবদন্তি শুনে এসেছে লিমি। ভয়, সন্দেহ আর সুতীব্র ঘৃণা দিয়ে নিজের মনে তার একটা কাল্পনিক মূর্তিও তৈরি করে নিয়েছিল সে। কিন্তু যেটুকু সময় সে তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে তাতে এমন কিছুই লোকটা করে নি বা ইঙ্গিত দেয় নি যাতে সমস্ত সত্তা বিরূপ হয়ে উঠতে পারে। এই লোকটা সম্পর্কে এতদিনের গড়া ভয়ের সংস্কারটা বিন্দুমাত্র না ঘুচলেও বিতৃষ্ণাটা কিছু কমল কি? লিমি বুঝতে পারল না; আগের মতোই সে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইল।

নীরবতা যে সম্মতির লক্ষণ, বুঝতে অসুবিধে হল না। চৌহনকে দিয়ে খাবার আনিয়ে সামনে বসিয়ে খাওয়ালেন বিক্রম সিং। তারপর বললেন, 'রাত অনেক হয়েছে, এবার শোও গিয়ে।'

লছমনকে ডেকে তার একটা ঘরে লিমির শোবার ভাল ব্যবস্থা করে দিতে বললেন বিক্রম সিং। আড়ালে নিয়ে কানে কানে লছমনকে এও বললেন, রাত জেগে সে যেন মেয়েটাকে পাহারা দেয়। লিমি পালালে তার গর্দান যাবে।

লছমনের সঙ্গে যাবার সময় লিমি বলল, 'আমার কথাটা মনে রাখবেন।'

'কোন্ কথাটা?'

'কাল সকালেই আমাকে আমাদের গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন।'

'আমার মনে আছে। সে ব্যাপারে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।' বিক্রম সিং বললেন, 'চান টান করে কাল সকালবেলা চলে এস। চা খাও তো?'

'খাই।'

'আমার এখানে চা খেয়ে রওনা হওয়া যাবে।'

লছমনেরা চলে গেলে চৌহনকে ডেকে বিক্রম সিং বললেন, 'লোকজনদের বলে দে, লছমনের ঘর যে টিলায় তার ওপাশের ঢালে একটা তাঁবু যেন আজ রাতেই তৈরি করে ফেলে। তাঁবুটা অবিকল আমার তাঁবুর মতো হওয়া চাই।'

হিজ হাইনেস বিক্রম সিংয়ের মাথায় লিমিকে ঘিরে বিচিত্র সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ছয়

সারারাত আজও ঘুমও হল না। পেছন দিকে দু হাত পরস্পর আবদ্ধ করে তাঁবুর ভেতর পায়চারি করতে করতে আদিবাসিনী বিচিত্র মেয়েটার কথাই শুধু ভাবতে লাগলেন, বিক্রম সিং। তাকে ঘিরে যে সম্ভাবনা মাথার ভেতর উঁকি দিয়েছে কিভাবে সেটাকে কাজে লাগাবেন তার পরিকল্পনা করতে করতে রাতের আয়ু ফুরিয়ে গেল।

কাল রাত্রে শিকারের আসর থেকে হঠাৎ তাঁবুতে ফিরে এসেছিলেন বিক্রম সিং। অন্য শিকারীরা মাচানে বসেই রাত কাটিয়েছেন। কথা ছিল, ভোরবেলা তাঁদের আনতে হাতি পাঠিয়ে

দেবেন। কিন্তু বিনা ঘুমে নিশিপালন করে এই মুহূর্তে বিক্রম সিং সিদ্ধান্ত করলেন, হাতি পাঠাবেন না। চৌহনকে ডেকে ঘোড়া পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। তারপর প্রাতঃকৃত্যের পালা চুকলে চৌহনকে আবার ডাকলেন। সে এলে বললেন, 'লছমনকে ডেকে নিয়ে আয়; সেই মেয়েটাও যেন আসে।'

একটু পর লিমিকে নিয়ে লছমন এল। এর ভেতরেই স্নান সেরে নিয়েছে লিমি। কালকের সেই শুষ্ক কর্কশ ভাব এখন আর নেই। শক্ত শক্ত গড়নের ভেতরেও বেশ কমনীয় দেখাচ্ছে লিমিকে।

বিক্রম সিং লছমনের উদ্দেশে বললেন, 'তুই মাহুত নিয়ে হাতিতে হাওদা চড়াতে বল। খানিক পর আমরা বেরুব।'

লছমন চলে গেলে বেয়ারাদের ডাকিয়ে ব্রেকফাস্টের বন্দোবস্ত করতে বললেন বিক্রম সিং। সকালের খাওয়া চুকতে বেশিক্ষণ লাগল না। তারপর লিমিকে নিয়ে হাতিতে গিয়ে উঠলেন। নির্জন বনভূমির ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কাজেই রাইফেল এবং কার্তুজ সঙ্গেই রইল। সেই সঙ্গে একটা দূরবীনও নিলেন। আর নিলেন টিফিন-ক্যারিয়ার বোঝাই করে নানারকম সুখাদ্য।

হাতি চলতে শুরু করল। একসময় তাঁবুগুলো পেছনে অদৃশ্য হয়ে গেল; দূর থেকে শালবনের ফাঁক দিয়ে ঝিলকি নদীর চকিত রেখা চোখে পড়ল।

লিমি কাছাকাছি বসে আছে। তার দিকে আড়ে আড়ে তাকাতে লাগলেন বিক্রম সিং। সরলা আদিবাসিনী জানে না তাকে নিয়ে কী বিচিত্র চতুর খেলাতেই না মেতেছেন তিনি।

বিক্রম সিং সারা জীবনে কত মোহময়ীর সান্নিধ্যে তো এসেছেন; তারা বুকের ওপর বিগলিত হয়ে পড়ার জন্যই উন্মুখ হয়ে থেকেছে। তাদের জন্য সাধনা করতে হয় নি, তপস্যা করতে হয় নি, ধ্যান করতে হয় নি। অনায়াসে পেতে পেতে তাঁর ধারণা হয়েছিল, মেয়ে মাত্রেই সহজলভ্যা। কিন্তু আদিবাসীদের এই মেয়েটা? মেয়েমানুষ সম্পর্কে সারা জীবনের অভিজ্ঞতাকে একেবারে মূল্যহীন করে দিয়েছে লিমি।

তাঁবু থেকে বেরুবার পর একটাও কথা হয় নি। হাতির গলায় কাঁসার ঘণ্টার ঝুন ঝুন আওয়াজ ছাড়া চারদিকের বনভূমি একেবারে স্তব্ধ।

একসময় বিক্রম সিং ডাকলেন, 'লিমি—'

লিমি তাকাল। বিক্রম সিং বললেন, 'তোমাদের গ্রামের নাম কী?'

'কোগুাগাঁও।'

'ওখানে যাবার পথ চেনো?'

আরুলকোটের জঙ্গলে আগে আর কখনও আসেনি লিমি। এখান থেকে কিভাবে কোন্‌দিকে গেলে সেখানে পৌঁছনো যায় তার জানা নেই। খানিক দিশেহারা হয়ে পড়ল সে। ঈষৎ বিভ্রান্তের মতো বলল, 'না।'

বনভূমি থেকে বেরুবার পথ জানে না লিমি, তাতে খুশিই হলেন বিক্রম সিং। লিমিকে ঘিরে মনে যে খেলার মহড়াটা কাল রাত থেকেই তিনি দিতে শুরু করেছেন সেদিক থেকে সুবিধেই হল। বললেন, 'আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আমি খুঁজে বার করে নেব'খন।

লিমি কিছু বলল না; মুখচোখ দেখে মনে হল সে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছে।

একটুক্ষণ নীরবতা। তারপর বিক্রম সিংই আবার বললেন, 'আচ্ছা লিমি—'

লিমি সাড়া দিল, 'কী বলছেন?'

'তোমার বাবা মা আছে?' সাগ্রহে লিমির দিকে তাকালেন বিক্রম সিং।

'আছে।' নিস্পৃহ সুরে সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল লিমি।

বিক্রম সিং বললেন, 'ভাইবোন আছে?'

আগের স্বরেই লিমি বলল, 'আছে।'

'ক' ভাই, ক' বোন?'

'দু ভাই, তিন বোন।'

'তুমি বড়, ছোট না মেজো?'

'আমি ভাইবোনদের ভেতর সব চাইতে বড়।'

একটু ভেবে বিক্রম সিং বললেন, 'তোমার বাবা কী করে?'

লিমি বলল, 'ক্ষেতি আর মৌমাছির চাষ!'

বিক্রম সিং অবাক হলেন, 'মৌমাছির চাষ! কী করে করতে হয়?'

'আমি ঠিক জানি না। তবে ছোট ছোট কাঠের বাক্স গাছের মাথায় ডালপালার ফাঁ বাবাকে ভাল করে বেঁধে রেখে আসতে দেখেছি। মৌমাছি তার ভেতর চাক বেঁধে থাকে।

'মৌমাছির চাষ করে কী হয়?'

'মধু হয়।'

'তোমরা তা হলে অনেক মধু খাও।' ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বিক্র সিং।

উদাসীন সুরে লিমি বলল, 'না।'

'না!'

'মধু আমরা খাই না; বাবা হাটে গিয়ে সব বেচে আসে।'

একটু ভেবে বিক্রম সিং বললেন, 'ছোট ভাইবোনেরা কী করে?'

লিমি বলল 'মিশনারীদের স্কুলে পড়ে।'

'তুমিও পড়?'

'না।'

'তবে?'

'আমি নার্সিং শিখেছি, মিশনারীদের হাসপাতালে কাজ করি।'

এবার কী বলতে যাচ্ছিলেন বিক্রম সিং, হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকে উঠলেন সামনের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল, উঁচু টিলা পেরিয়ে কমলনয়নরা ফিরে আসছেন।

কাছাকাছি আসতে শিকারীরা ঘোড়া থামালেন। রাত জাগার ফলে সবার চোখ রক্তব ঢুলুঢুলু।

এদিকে বিক্রম সিংয়ের হাতিও থেমে গিয়েছিল। হিজ হাইনেস বললেন, 'তারপর, গে কিরকম হল?'

শিকারীরা বিক্রম সিংয়ের ছত্রীর তলায় রূপসী আদিবাসিনীকে অবশ্যই দেখতে পেয়েছে সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য রীতিবিরুদ্ধ।

কমলনয়ন শিকার সম্বন্ধে হতাশ মুখভঙ্গি করলেন, 'হোপলেস।'

'মানে!'

'শুধু শুধু রাত জাগাই সার হল।'

'কেন, কিছু ব্যাগ করতে পার নি?'
'তা করেছি।'
'কী কী করেছ?' বিক্রম সিং উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।
নিষ্প্রভ সুরে কমলনয়ন বললেন, 'তেমন কিছুই না; একটা চিকারা হরিণ আর গোটা আট-ক খরগোশ।'
'ব্যস্?'
'ব্যস্।'
'কোথায় সেগুলো?'
'মাচানে রেখে এসেছি।'
'তোমরা এখন তাঁবুতে ফিরছ তো?'
'হ্যাঁ।'
'ফিরে কারোকে পাঠিয়ে দেবে, হরিণ খরগোশগুলো নিয়ে আসবে।'
'তাই ভেবে রেখেছি।'
জগমোহন একা একটা ঘোড়া ছুটিয়ে আসে নি; তেমন অবস্থা তার নয়। সমস্ত রাত হুইস্কি য়েছে, তার ঘোর এখনও কাটে নি। সে এসেছে ভায়লাভাইর ঘোড়াতে; ভায়লাভাইর মর জড়িয়ে বসে আছে। মাথাটা ঘাড় থেকে স্খলিত হয়ে ঝুলে ঝুলে পড়ছে যেন। রাত াব কল্যাণে চোখদুটি জমাট রক্তপিণ্ড; তার সঙ্গে হুইস্কির ঘোর লেগে আছে।
স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছিল না জগমোহন। তবু তারই ভেতর একবার শিথিল ঘাড়খানা ক তুলে চোখ মেলল। জড়ানো জড়ানো স্বরে বলল, 'হুজৌর মহারাজ—'
বিক্রম সিং বললেন, 'কি বলছ?'
'শের না, ভালুক না, বাইসন না—' বলতে বলতে জগমোহনের জড়িত কণ্ঠস্বর বুজে ।
বিক্রম সিং প্রতিধ্বনি করলেন, 'শের না, ভালুক না, বাইসন না—তাতে হল কী?'
'আমরা রাত জেগে, আঁখ টান টান করে কিছুই শিকার করতে পারি নি। লেকিন আপনি—'
'আমি কী?'
'বহুত বহুত বড়িয়া—' ঘাড় আবার ঝুলে পড়তে শুরু করল জগমোহনের।
'সকালবেলা এ এক ভারি মাতালের পাল্লায় পড়া গেল তো। একটা কথা ঠিকমত গুছিয়ে তে পারে না। বহুত বহুত বড়িয়া কী?'
হ্যাঁচকা টানে মাথাটা আবার খানিক তুলল জগমোহন। লাল টকটকে চোখে সম্পূর্ণ তাকিয়ে শে কেশে গলাটা সাফ করে নিল। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল, 'বহুত বহুত বড়িয়া চিড়িয়া র করে ফেলেছেন।' বলতে বলতে মাথা ঝুলে পড়ল; ঘাড়ের ওপর সেটাকে আর খাড়া তে পারল না জগমোহন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঢুলতে শুরু করল সে।
সবাই স্তম্ভিত। জগমোহনের ইঙ্গিত বুঝতে কারো অসুবিধে হয় নি। লিমির ব্যাপারে যে ত সে দিয়েছে সেটা তার পক্ষে অনধিকার-চর্চা, রীতিমত অপরাধ। হিজ হাইনেসের গা কামিনী সম্বন্ধে ঠোঁটে কুলুপ এঁটে রাখাই অলিখিত নিয়ম।
কিছুক্ষণের জন্য পাথরের মত ভারী নিরেট জমাট নৈঃশব্দ নেমে এল। জগমোহনের ং সম্পর্কে সবাই যখন শঙ্কিত, শ্বাসরুদ্ধ, সেইসময় অপ্রত্যাশিতের মতো হঠাৎ হো হো হেসে উঠলেন হিজ হাইনেস বিক্রম সিং. 'ওয়েল সেড চুহামারনেবালা, ভেরি ওয়েল ! বহুত আচ্ছা—বহুত আচ্ছা—'

ব্যাপারটা এত সহজে এমন লঘু কৌতুকের ভেতর মিটে যাবে, শিকারীরা কেউ ভাবতে পারেন নি। তাঁরা স্বস্তিবোধ করলেন।

এক সময় হাসি থামিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'তোমরা তাঁবুতে ফের; আমি খানিকটা প আসছি।'

শিকারীরা চলে গেলেন। হাতি তাঁদের বিপরীত দিকে চলতে লাগল।

ঝিলকি নদীর পার ধরে শালের বন থাকলেও খুব নিবিড় নয়; ফাঁকা ফাঁকা শালপাতা ঝাঁঝরি দিয়ে টুকরো টুকরো সোনালী রোদ চারদিকে ছড়িয়ে আছে; বাকিটা ছায়া।

যৌবনের শুরু থেকে বিক্রম সিং সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তি শুনে শুনে মনের ভেতর যে ভ আর ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা সামান্য একটুখানিই কেটেছে লিমির; অবশ্য কেটেছে কিনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত নয় সে। সেই রাক্ষসের মতো লোকটা পরশু রাত্রে তাকে ধরে আন পর এখন পর্যন্ত কোন বিশ্রী অভিজ্ঞতা হয় নি। বরং আজ, এই মুহূর্তে তাকে গ্রামেই পৌঁ দিতে চলেছেন বিক্রম সিং।

হঠাৎ লিমি বলে উঠল, 'ওরা কারা?'

লিমি কাদের কথা বলছে বুঝতে পারলেন বিক্রম সিং। বললেন, 'ওরা আমার বন্ধু।'

'কী বলছিল ওরা?'

বিক্রম সিং ঈষৎ চকিত হলেন। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে লিমির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বুঝতে পার নি?'

'না।'

বিক্রম সিং কী বলবেন হঠাৎ ভেবে পেলেন না।

লিমি আবার বলল, 'ইংরেজি, আমার মাতৃভাষা আর পায়াদের বুলি ছাড়া আমি আর কি বুঝি না। আপনারা কী ভাষায় কথা বলছিলেন?'

বিক্রম সিং আশ্বস্ত হলেন। ভাগ্যিস জগমোহনদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেন নি বললেন, 'হিন্দুস্থানীতে বলছিলাম।'

'আপনার মাতৃভাষা?'

'হ্যাঁ।'

'ওরা কী বলছিল, বললেন না তো।'

'তেমন কিছু না।'

লিমির সরু ভ্রূ দুটি কুঁচকে গেল। সন্দিগ্ধ সুরে বলল, 'কিন্তু—'

লিমির কণ্ঠস্বরে এমন একটা কম্পন আছে যাতে কিছুটা চমক লাগল বিক্রম সিংয়ের আস্তে আস্তে বললেন, 'কিন্তু কী?'

'ওরা অমন হাসাহাসি করছিল কেন?'

একটু চুপ করে থেকে চাতুর্যের আশ্রয় নিলেন বিক্রম সিং। লিমির প্রশ্নের সঠিক উত্তর এড়িয়ে গিয়ে মিথ্যেই বললেন, 'হাসির কথা হচ্ছিল কিনা—ওরা আমার বন্ধু; ঠাট্টা—ঠাট্টা করছিল।'

লিমি বলল, 'ঠাট্টা করুক, হাসুক, যা ইচ্ছে করুক। কিন্তু—'

'আবার কী হল?'

'আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে মাতালটা ঐ রকম করছিল কেন?'

বিক্রম সিং বুঝলেন জগমোহনের কথা বলছে লিমি। বললেন, 'তোমাকে তো আগে দে নি; তাই জিজ্ঞেস করছিল তুমি কে।'

আপনি কী বললেন?'

বললাম তুমি কাছাকাছি একটা গ্রামের মেয়ে। কাল এই জঙ্গলে এসে পথ হারিয়ে ফেলেছিলে; তোমাকে দিয়ে আসতে যাচ্ছি।'

চক্ষুণি আর কোন প্রশ্ন করল না লিমি।

তাঁর ব্যাখ্যা লিমি পুরোপুরি বিশ্বাস করছে কিনা বিক্রম সিং বুঝতে পারলেন না। জগমোহন াষায় কথা বলছিল তা হয়ত ধরতে পারেনি লিমি কিন্তু তার চোখমুখের ভঙ্গি, কণ্ঠস্বরেব ন-পতন, ইঙ্গিতময় হাসাহাসি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছে। বিক্রম সিং টের পেলেন এ-সবের তাঁর নির্দোষ কৈফিয়তটা ঠিক মিলছে না। নিজেব কাছেই সেটা খাপছাড়া মনে হতে ন।

হঠাৎ লিমি বলে উঠল, 'আপনি বেশ বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারেন তো।'

বিক্রম সিং চমকে উঠলেন, 'কী রকম?'

আমার সম্বন্ধে ওদের যা বলেছেন তা কি সত্যি?'

আবছা অস্ফুট গলায় কী উত্তর দিলেন, বিক্রম সিং নিজেই বুঝতে পারলেন না।

চলতে চলতে শালবন ঘন হতে লাগল। সূর্যটা ইতিমধ্যে আকাশের খাড়া দেওয়াল বেয়ে কখানি ওপরে উঠে এসেছে। রোদের সোনালী রঙটা খানিক আগে ছিল কোমল, এখন ধারাল আঁচ লেগেছে। শালের গাঢ় সবুজ পাতাগুলো উত্তুরে বাতাসে জ্বলন্ত ঝালরের দুলছে।

এক সময় মুগ্ধ গলায় চেঁচিয়ে উঠল লিমি, 'কী সুন্দর! কী সুন্দর!'

অবমনস্কের মতো কী ভাবছিলেন বিক্রম সিং। হয়ত লিমির কথা, হয়ত বা অন্য কিছু। চ হয়ে চোখ ফেরালেন, 'কী ব্যাপার?'

লিমি বলল, 'নদীর দিকে তাকান।'

বিক্রম সিং তাকালেন। ঝিলকি নদীর নীল দেহ ঘিরে কালকের সেই দৃশ্য; বাদামী রঙের বের টুকরোগুলো ওপর অসংখ্য ময়ূর বসে আছে।

লিমি বলল, 'কত ময়ূর, দেখেছেন!'

হ্যাঁ; কালও দেখেছি।' বিক্রম সিং বলতে লাগলেন, 'কালও ওরা এই জায়গাটায় এসে ছিল।'

এই জায়গাটা ওদের পছন্দ হয়েছে।'

বোধ হয়।'

ময়ূরদের দিকে চোখ রেখে লিমি বলল, 'আমার বাবা কী বলে জানেন?'

একটু আগে যে জাতীয় কথাবার্তা হচ্ছিল তাতে খুব একটা স্বস্তিবোধ করছিলেন না বিক্রম ময়ূরগুলো তাঁকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তিনি উৎসাহিত হয়ে উঠলেন, 'কী বলে?'

'যে জায়গাটা ময়ূরদের পছন্দ রোজ রোজ তারা সেখানে আসে।'

তা হলে তো ভালই হল। এখানে এলে রোজ ময়ূর দেখা যাবে।' বলতে বলতে হঠাৎ লাভাইর কথা মনে পড়ে গেল বিক্রম সিংয়ের, 'লিমি, তুমি একটা কথা জানো?'

'কী?' জিজ্ঞাসু চোখে লিমি তাকাল।

ময়ূরের মাংস নাকি খায়।'

'খায় বৈ কি। আমরা মাঝে মাঝে খাই।'

'খেতে ভাল?'

খুব।'

আর কিছু না বলে পাশ থেকে শটগান তুলে নিলেন হিজ হাইনেস। তাক করতে যা
সেই সময় ভয়চকিত স্বরে লিমি বলে উঠল, 'না—না—'

বিক্রম সিং চোখ ফেরালেন, 'কী হল?'

লিমি বলল, 'ওদেব মারবেন না। যেমন আছে ওরা তেমনি থাক। খুব ভাল লা
দেখতে।'

বন্দুক নামিয়ে রাখলেন বিক্রম সিং। বললেন, 'খেতে যখন ভাল তখন তোমাকে ময়
মাংস খাওয়াব।'

'মাংসের দরকার নেই। তা ছাড়া—'

'কী?'

'ময়ূরের মাংস খাবই বা কখন; আপনি তো আমাকে গ্রামে রেখে আসতে চলেছেন

স্থির নিষ্পলকে লিমির দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিক্রম সিং নিঃশব্দে হাসলেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তাও তো বটে।'

লিমি আর কিছু বলল না।

খানিকটা নীরবতা। তারপর বিক্রম সিং বললেন, 'মারতে যখন দিলেই না তখন এক
করা যাক।'

'কী?'

'ময়ূরগুলোব বরং ফটোই তুলে নিই।'

'বেশ তো।'

'এক্ষুণি তো আর সম্ভব হবে না; ডেভালপ করে পরে তোমাকে একটা কপি পাঠিয়ে
আসব, কেমন?'

লিমি খুব খুশি। বলল, 'আচ্ছা।'

বিক্রম সিং ক্যামেরা নিয়ে এসেছিলেন। চোখের কাছে সেটা ধরে একেব পর এক অনেক
ছবি তুলে ফেললেন।

তারপর অনেকটা সময় কাটল।

ঝুম ঝুম ঘুণ্টি বাজিয়ে হাতি চলেছে। একসময় ছত্রীব তলা থেকে হামাগুড়ি দিয়ে মা
কানে কানে ফিসফিসিয়ে কী যেন বলে এলেন বিক্রম সিং; লিমি শুনতে পেল না। অবশ
সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেসও করল না সে।

দেখতে দেখতে সূর্যটা আকাশের মধ্যবিন্দুতে পৌঁছে গেল। বনভূমির গায়ে গ
ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যেও বোদের তাপ বেশ কড়াই লাগছে।

ঝিলকি নদীর নীল স্রোত ডাইনে রেখে পাশাপাশি যাচ্ছিলেন বিক্রম সিংরা। একটু অ
একটা বাঁক ঘুরে বনভূমির নিভৃত অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছেন। সঙ্গী নদীটা এখন আর প
নেই। নৃত্যপর ময়ূরদের সেই রমণীয় দৃশ্যও চোখের সামনে থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

বিক্রম সিং বললেন, 'অনেক বেলা হল।'

আকাশের দিকে তাকিয়ে লিমি বলল, 'হ্যাঁ, এখন দুপুর।'

'আমার কিন্তু খিদে পেয়েছে। তোমার?'

সত্যিই খিদে পেয়েছে লিমির। চোখ নত করে বসে রইল সে, কিছু বলল না।

বিক্রম সিং হাসলেন, 'খাওয়ার কথায় লজ্জার কী আছে?'

লিমি এবাব বলল, 'একেবারে বাড়ি গিয়েই খাব।'

'তা কেমন করে হয়—'

'কেন?'

'তোমার গ্রামে যাবার পথ তো চিনি না; খুঁজে খুঁজে বার করতে হবে। কখন পারব তার ছু ঠিক নেই। ততক্ষণ না খেয়ে থাকা ঠিক নয়।'

লিমি উত্তর দিল না।

বিক্রম সিং বললেন, 'তা ছাড়া—'

'কী?'

'আমি খাব আর তুমি খাবে না, তা তো হতে পারে না।'

দ্বিধান্বিত সুরে লিমি বলল, 'কিন্তু—'

'আবার কী?' বিক্রম সিং সোজা লিমির চোখের দিকে তাকালেন।

'আমি খেলে আপনার কম হয়ে যাবে।'

'এই কথা!' বিক্রম সিং হাসলেন, 'তোমার দুর্ভাবনার কারণ নেই; বাবুর্চিরা আমার একার বার দেয় নি। তোমার আমার মাহুতের—তিনজনের মতো দিয়েছে।'

বিক্রম সিং এ-ব্যাপারে সত্যি কথাই বলেছেন। আপত্তি করার ফাঁক কোথাও নেই। কাজেই মি চুপ করে রইল।

হিজ হাইনেস তাড়া লাগালেন, 'দেখ লিমি, আমি একেবারেই খিদে সহ্য করতে পারি না।'

মৃদু স্বরে লিমি বলল, 'বেশ তো, খান না।'

'খান না বললেই কি খাওয়া যায়?'

'কেন?'

'আমি কি কোনদিন নিজের হাতে খাবার নিয়ে খেয়েছি? ঐ টিফিন ক্যারিয়ারটা খুলে প্ট খাবার সাজিয়ে নাও। ঐ যে ওখানে প্লেট গেলাস-গেলাস আছে।' আঙুল বাড়িয়ে সব খিয়ে দিলেন বিক্রম সিং।

নির্দেশমত টিফিন ক্যারিয়ার খুলে খাবার সাজাতে বসল লিমি।

খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প চলল। একতরফা বিক্রম সিংই বলে গেলেন। টুকরো টুকরো সংলগ্ন অসংখ্য কথা; লিমি শুধু মাঝে মাঝে হুঁ-হাঁ করে যেতে লাগল।

কথায় কথায় গল্পে গল্পে দুপুর গেল; বনভূমির মাথায় রোদের রঙ হলুদ হতে হতে জানিয়ে য় গেল বিকেল এসে গেছে! লতাপাতা ডালপালার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে যে হলদে দটুকু আসছিল, ক্রমশঃ তা-ও ম্লান বিষণ্ণ নিরানন্দ হয়ে গেল; অর্থাৎ হেমন্তের সন্ধ্যে নেমে াসতে আর দেরি নেই।

আশ্চর্য! সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আরুলকোটের জঙ্গলে লক্ষ্মীছাড়ার মতো ঘুরে ড়াল হাতিটা কিন্তু লিমিদের স্থান কোগুাগাঁও-এ যাবার পথটা কিছুতেই আর খুঁজে বার করা গল না।

একবার আকাশের দিকে তাকালেন বিক্রম সিং, তারপর তারা দুটো চোখের কোণে এনে মির দিকে কিছুক্ষণ ঐভাবেই তাকিয়ে থেকে খুব আস্তে আস্তে চিন্তাগ্রস্তের মতো ডাকলেন, লিমি—'

লিমি কি ভাবছিল, মুখ তুলে তাকাল।

বিক্রম সিং বললেন, 'তাই তো—'

'কী?'

'ভারি বিপদ হল—'

'বিপদ!'

বিক্রম সিং বললেন, 'সন্ধ্যে হয়ে গেল; এক্ষুণি অন্ধকার ঘন হয়ে যাবে। এদিকে—' ব বলতে চুপ করে গেলেন।

'কী?'

গ্রামে যাবার পথটাই তো বার করা গেল না।'

লিমির চোখেমুখে উৎকণ্ঠার ছায়া পড়ল। ভীত উদ্বিগ্ন শঙ্কিত সুরে সে বলল, 'এখ হলে কী হবে কিং?'

খানিক কি চিন্তা করে বিক্রম সিং বললেন, 'অন্ধকার বনের ভেতর ঘোরা নিরাপদ চিতাগুলো আবার গাছ বাইতে পারে। হয়ত ওপর থেকে আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে প তুমিই বল না, কী করা যায়—'

'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'আমিও কি পারছি। তবে—'

'কী?'

'একটা কাজ অবশ্য করা যায়, কিন্তু তুমি আবার—' বক্তব্য সম্পূর্ণ না করে হঠাৎ গেলেন হিজ হাইনেস বিক্রম সিং।

উৎসুক সুরে লিমি বলল, 'কী কাজ?'

'বলব?'

'নিশ্চয়ই বলবেন। নইলে কাজটা কী, জানব কেমন করে?'

'বলছিলাম, রাত্রি যখন হয়েই আসছে, আজ না হয় তাঁবুতেই ফিরে যাই। কাল স আবার বেরুনো যাবে।'

লিমি উত্তর দিল না; বিক্রম সিংয়ের চোখে নিজের নীলাভ-পিঙ্গল চোখ নিবদ্ধ রাখল।

বিক্রম সিং আবার বললেন, 'কাল যেমন করে হোক তোমাদের গ্রামটা খুঁজে বার কর

কি আর করা। বিক্রম সিং অন্যায় কিছু বলেন নি; রাত্রিবেলা বনভূমির গাঢ় অন্ধ কোথায় ঘুরে বেড়াবে তারা? অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিমি বলল, 'আচ্ছা।'

সাত

সন্ধ্যের খানিকটা পর নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন হিজ হাইনেস বিক্রম সিং। লিমি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন।

তাঁবুতে পা দিয়েই বিক্রম সিং ডাকলেন, 'চৌহন—'

চৌহন চোখ-কান মেলে স্নায়ুগুলো কুকুরের মতো সজাগ করে বসে ছিল। ডাকামাত্র এল, 'হুজৌর মহারাজ—'

'রাত্তিরে ঘোড়া ছোটাতে পারে আর সিনায় বেশ সাহস আছে—এমন লোক অ নৌকরদের ভেতর ক'জন আছে?'

'বহুত।'

'বহুত দরকার নেই; দু'জন হলেই চলবে। ডেকে আন—'

'এক্ষুণি?'

'হ্যাঁ, এক্ষুণি।'

চৌহন ছুটল; খানিক পরে দুটো লোক সঙ্গে করে ফিরে এল।

বিক্রম সিং তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী চোখে লোক দুটোকে দেখলেন। বেশ জোয়ান এবং সাহসীই নে হল। জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কী তোদের?'

লোকদুটো জানাল, তাদের একজনের নাম বিরজু, দ্বিতীয় জন মহাদেও। 'বিক্রম সিং লেন, 'আজ রাত্তিরে তোমাদের দুজনকে শহরে যেতে হবে।'

'মহারাজের যখন হুকুম নিশ্চয়ই যাব।'

'ঘোড়ায় চেপে যাবি; সঙ্গে বন্দুক নিবি। ঝড়েব বেগে যাবি, ঝড়েব বেগে আসবি। কাল ভারের মধ্যে ফিরে আসা চাই।'

'জান কবুল হুজৌর মহাবাজ।'

একরাশ টাকা তাদের হাতে দিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'ভাল ভাল শাড়ি আব মেয়েদের মা যা পাস সব কিনে আনবি।'

লোকদুটো ঘোড়া নিয়েই এসেছিল; তাঁবুর বাইরে গিয়ে আর দাঁড়াল না। বিদ্যুৎ গতিতে ঘাড়া ছুটিয়ে দিল।

মহাদেও আর বিরজু চলে গেলে চৌহনের দিকে চোখ ফেরালেন বিক্রম সিং। সে তাঁবুর বজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। বিক্রম সিং বললেন, 'লছমন যে টিলার ওপর থাকে তার ওদিকের লে কাল একটা তাঁবু তৈরি করতে বলেছিলাম; সেটা হয়েছে?'

'হয়েছে মহারাজ।' চৌহন মাথা নাড়ল।

লিমি তাঁবুর একধারে নিঃশব্দে বসে আছে। বিক্রম সিং তাকে বললেন, 'চল লিমি—'

নিরুত্তরে উঠে দাঁড়াল লিমি; বিক্রম সিংকে অনুসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এল।

লছমনের ঝুপড়ির ওপারে চড়াইয়েব ঢালে নতুন তাঁবুটা হ্যাজাক আর মশালের আলোয় লমল করছে। ভেতরে ঢুকে খুঁটিযে খুঁটিয়ে প্রথমটা দেখে নিলেন; আসবাবপত্র এবং আরামের বস্থা অবিকল তাঁর তাঁবুব মতই। খুশি হলেন হিজ হাইনেস; ঠিক এমনটিই তিনি চেয়েছিলেন।

বিক্রম সিং বললেন, 'তাঁবুটা কেমন লাগছে লিমি?'

চারদিক দেখে লিমি সংক্ষেপে মন্তব্য করল, 'খুব ভাল।'

'সবার পছন্দ হবে?'

'হওয়াই সম্ভব।'

'তুমি এখানে থাকবে।'

লিমি চমকে উঠল, 'আমি!'

আস্তে ঘাড় কাত করলেন বিক্রম সিং।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে গেল লিমির। চকিত স্বরে সে বলল, 'তা কেমন করে হয়?'

'কেন?'

'আমি তো কালই চলে যাচ্ছি।'

ঠোঁট কামড়ে তাড়াতাড়ি বিক্রম সিং বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কালই যাবে। আমি তোমাকে চিরকাল থাকার কথা বলিনি।'

লিমি উত্তর দিল না।

বিক্রম সিং আবার বললেন, 'সারাদিন ঘোরাঘুরিতে নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। এবার বিশ্রাম কর, আমি যাই। হ্যাঁ ভাল কথা—'

'কী?' দু-চোখে প্রশ্ন নিয়ে লিমি তাকাল।

'এই তাঁবুতে থাকতে তোমার অসুবিধে হবে না তো?'

বিদ্যুৎ চমকের মতো নিজেদের বাড়িটা চোখের সামনে ভেসে উঠল লিমির। কাঠের বে আর বেতপাতায়-ছাওয়া শুয়োরের খোঁয়াড়ের মতো আলোবাতাসহীন যে দু-খানা ঘর তাদে আছে তাদের পেছনে সভ্য জগতের বসবাস প্রণালীর কোন ছাপই নেই। ওখানে দশ-বারো জ মানুষ গাদাগাদি দিয়ে পড়ে থাকে। ইংরেজি শিখেছে, মিশনারীদের সংস্পর্শে এসেছে, তবু ব করার ব্যাপারে পৃথিবীর আদিম যূথবদ্ধ মানুষদের থেকে খুব একটা দূরে যেতে পারে লিমিরা। বাড়িময় কুকুর আর শুয়োরদের ছোটাছুটি, ভাই-বোনদের চিৎকার, অর্ধোল প্রতিবেশীদের আনাগোনা, চিটচিটে নোংরা বিছানা—দ্রুত সরে যাওয়া দৃশ্যপটের মতো চোখে ওপর ছায়া ফেলে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তুলনায় এই তাঁবুটা মিথ্যে একটা স্বপ্নের মতো। আরাম এবং বিলাসের এত অজস্র উপকর আগে আর কখনও দ্যাখে নি লিমি, গল্পেও এদের কথা শোনে নি। আস্তে আস্তে সে শুধু বল পারল, 'অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক বলছ?'

'হ্যাঁ। এত আরামে আমি কখনও থাকি নি।'

লিমিকে রেখে তার তাঁবুতে পাহারার বন্দোবস্ত করে নিজের তাঁবুতে ফিরে এলেন বিক্র সিং। খানিক বিশ্রাম করে স্নান আর প্রসাধনের পর্ব চুকিয়ে খেয়ে নিলেন। তারপর কমলনয়নদে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা এলে বললেন, 'তারপর কী ইচ্ছে তোমাদের?'

কমলনয়ন বললেন, 'কোন্ ইচ্ছের কথা বলছ?'

'আজ শিকারে যাবে না?'

'যাবার জন্যে তো মুখিয়েই আছি। তবে—'

'কী?'

'খবর পেলাম একটু আগে তুমি ফিরে এসেছ। সারাদিন ঘোরাঘুরি করেছ; নিশ্চয়ই খ টায়ার্ড। এত ধকলের পর তোমার পক্ষে বেরুনো সম্ভব কি?'

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না। তোমরা বেরুতে রাজী হলে আমিও রাজী।'

'তা হলে চল।'

একটু পর হাতিতে হাওদা চড়িয়ে শিকারের সরঞ্জাম আর বড় বড় পাঁচ ব্যাটারীর হাি টর্চ নিয়ে সবাই রওনা হলেন।

আজ আর কাল রাতের সেই মাচানটায় গিয়ে বসলেন না তাঁরা; অন্য একটা মাচা গেলেন। যথারীতি হাতি আর মাহুতকে মাচানের তলার ঘরে চালান করে ছাগলের টো সামনে রেখে নিশিযাপন শুরু হল।

স্নায়ু টান টান করে শিকারীরা প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যে লাগলেন বিক্রম সিং; বার বার তাঁর মনোযোগ বিক্ষিপ্ত হয়ে যেতে লাগল। আদিবাসীদের বিচিত্র মেয়েটা থেকে থেকে তাঁর হৃদপিণ্ডে তরঙ্গ তুলে যাচ্ছে।

রেডিয়াম ঘড়ির জ্বলজ্বলে ডায়ালে রাতের আয়ু যখন দেড়টা সেই সময় দূরের ঝোপে খস খচ শব্দ শোনা গেল। খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে কে যেন আসছে। ঝোপটায় খুব কাছেই ছাগলটা বাঁধা রয়েছে।

শিকারীরা চকিত হলেন; বুকের ভেতর শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসতে লাগল। সমস্ত ইন্দ্রিয়

চাখের মণিতে এনে তাঁরা তাকিয়ে রইলেন। প্রতিটি সেকেন্ড হৃদপিণ্ডে হাতুড়ির ঘা দিয়ে লল।

খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখা গেল ঝোপের ভেতর থেকে নীল আগুনের দুটো বিন্দু আস্তে আস্তে ছাগলটার দিকে এগিয়ে আসছে। ছাগলটার গলা চিরে হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকার বেরিয়ে এল; পরক্ষণেই সে যেন মৃত্যুভয়ে জমাট বেঁধে গেল।

শিকারের ওপর প্রথম গুলিটা মারবেন হিজ হাইনেস, এটাই রাজকীয় প্রথা। তিনি যদি লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ হন তখন অন্য শিকারীর পালা।

সবাই রাইফেল উঁচিয়ে তাক করে বসে আছেন; এমন কি জগমোহনও। পাশ থেকে বাতাসের মতো কে ফিসফিসিয়ে উঠল, 'ইওর হাইনেস—'

'বল—' শিকারের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে উত্তর দিলেন বিক্রম সিং।

'চিতা মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ—টর্চ মারো।'

পাশ থেকে হান্টিং টর্চ তুলে নিয়ে শিকারীটি নীল আগুন দুটির ওপর বোতাম টিপে আলো ফেললেন। চিতার চোখ স্থির হয়ে রইল; সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার করলেন বিক্রম সিং। রাইফেলের শব্দ ছাপিয়ে বনভূমি-কাঁপানো গর্জন শোনা গেল; তারপর লাফের আওয়াজ—ঝোপ পেরিয়ে একটা ঝড় দূরের নিবিড় জঙ্গলে দ্রুত মিলিয়ে যেতে লাগল।

বিক্রম সিংয়ের টর্চটা তো ছিলই, আরো কতকগুলো হান্টিং টর্চ গোলাকার জোরাল আলো ফেলে ফেলে সন্ধান করতে লাগল। কিন্তু না, বনভূমির কোথাও চিতার চিহ্নমাত্র নেই।

হতাশ সুরে বিক্রম সিং বললেন, 'প্রথম শিকার, তা-ও মিস করলাম।'

সবাই খানিকটা অবাকই হয়েছেন। জানোয়ারের পায়ের শব্দ শোনামাত্র না দেখেই যিনি টার্গেট হিট করতে পারেন, অনেক উঁচুতে আকাশের নীল ছুঁয়ে বিন্দুর মতো যে সব পাখি ওড়ে ইচ্ছে করলে অনায়াসে তাদের যিনি লক্ষ্যভেদ করতে পারেন, সেই বিক্রম সিং কিনা হাত-কুড়ি দূরের একটা নিশ্চিত শিকার ফসকালেন।

বিক্রম সিংও কম অবাক হন নি। মৃগয়ায় এসে এমন ব্যাপার তাঁর জীবনে আর কখনও হয়নি। মাত্র বিশ হাত দূরে একটা শিকার, তাও ছুটছে না নড়ছে না—স্থির নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। তাকেও মারতে পারলেন না! তবে কি—তবে কি যখন চিতাটাকে দেখছিলেন তখন অবচেতনে সেই আদিবাসিনী মেয়েটা অন্য কোন প্রতিক্রিয়া ঘটিয়ে যাচ্ছিল। আর তারই ফলে মৃগয়ায় ব্যর্থ হয়েছেন বিক্রম সিং!

পাশ থেকে ভায়লাভাই ফিসফিসিয়ে উঠলেন, 'কী হল মহারাজ?'

'কী?' চোখ ফিরিয়ে বিক্রম সিং তাকালেন।

'আপনি টার্গেট মিস করবেন, এ যে আমি কল্পনাও করতে পারি না।'

বিক্রম সিং চুপ করে রইলেন।

এবার কমলনয়ন শর্মা অনুচ্চরে স্বরে বললেন, 'শরীর কি তোমার ঠিক নেই?'

বিক্রম সিং বললেন, 'ঠিকই আছে।'

ওধার থেকে জগমোহন রঙ্গভরা সুরে বলে উঠল, 'মালুম হচ্ছে দিলটাই গড়বড় হয়েছে মহারাজের—বিলকুল গড়বড়।'

একটু আস্কারা পেলে জগমোহনের রসিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। বিক্রম সিং ধমক দিয়েই বললেন, 'দিল্লেগি কোরো না চুহামারনেবালা।'

হিজ হাইনেসের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, কাঠিন্য কর্কশতা অথবা বিরক্তি—যাতে আ কিছু বলতে সাহস পেল না জগমোহন।

এরপর সবাই চুপচাপ। পৃথিবীর হৃদপিণ্ডের গুহায়িত বিলাপের মতো একটানা ঝিল্লিস্ব ছাড়া এই নিঝুম বনভূমিতে এখন আর কোন শব্দ নেই।

মাচানের ওপর অন্য শিকারীদের সঙ্গে চোখ টান করে বসে রইলেন বিক্রম সিং। রেডিয়া ডায়ালে ঘড়ির কাঁটা যত ঘুরতে লাগল ততই হতাশ হয়ে পড়তে লাগলেন তিনি। নতু শিকারের সম্ভাবনা আজ আর নেই বলেই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল বিক্রম সিংয়ের; কাল সকালে আবার লিমিকে নি বেরুতে হবে। সারা দিন বনভূমিতে ঘুরে ঘুরে কেটে যাবে। অতএব এখন একটু ঘুমে দরকার—নিদারুণ ভাবেই দরকার।

বিক্রম সিং এক সময় উঠে পড়লেন। বললেন, 'পয়লা শিকার ফসকে গেছে; আজ আ কিছু হবার আশা নেই।'

সবাই সায় দিলেন, 'তাই মনে হচ্ছে।'

'আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে; তাঁবুতে ফিরব। তোমরা কী করবে?'

সবার হয়ে কমলনয়ন বললেন, 'আমরা আরেকটু দেখি, যদি কিছু পেয়ে যাই।'

'বেশ; কাল সকালে ঘোড়া পাঠিয়ে দেব'খন।'

মাহুতকে ডেকে হাতি নিয়ে তাঁবুর দিকে চলে গেলেন বিক্রম সিং।

আট

পরের দিন ভোর হতে না হতে সেই লোক দুটো—বিরজু আর মহাদেও—ঘোড়া ছুটি শহর থেকে ফিরে এল। খালি হাতে তারা ফেরে নি; এই সময়টুকুর ভেতর চমৎকাব চমৎকা শাড়ি আর জামা যোগাড় করে এনেছে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে শাড়ি-টাড়ি দেখে খুশি হলেন বিক্রম সিং। তারপর স্নান সে প্রসাধনের পর্ব চুকিয়ে ফেললেন। তারও পর চৌহনকে পাঠিয়ে লিমিকে নিজের তাঁবুতে ডে আনলেন।

লিমিও ইতিমধ্যে স্নান সেরে ফেলেছে। কালকের সেই হলুদ শাড়ি আর লাল জামাটাই তা পরনে। লছমন তাকে ঘরের বেড়া কেটে ছোঁ মেরে তুলে এনেছিল। ঐ রকম অবস্থায় আর দু চারটে জামাকাপড় তো পুঁটলি বেঁধে আনা সম্ভব নয়; আর এখানেও কেউ শাড়ি-জামা মজু করে রাখে নি। কাজেই পরনের ঐ এক রকমের হলুদ শাড়ি আর লাল ব্লাউজটাই লিমি বোজ পরতে হচ্ছে, বদলানো আর সম্ভব হচ্ছে না।

বিক্রম সিং জিজ্ঞেস করলেন, 'কাল ঘুম হয়েছিল?'

'হ্যাঁ।' আস্তে মাথা নাড়ল লিমি।

একটু চুপ করে থেকে বিক্রম সিং বললেন, 'বাড়ি যাবে তো?'

'হ্যাঁ।'

'এখনই?'

ঘাড় কাত করে লিমি জানাল, এখনই।

'তা হলে এসো ব্রেকফাস্টটা সেরে নিই।'

ব্রেকফাস্ট সারা হলে বিক্রম সিং বললেন, 'আমার একটা অনুরোধ আছে লিমি।'

জিজ্ঞাসু চোখে লিমি তাকাল।

'দু' দিন আমাদের এখানে রইলে তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমাব খুব ইচ্ছে—' বলতে বলতে হঠাৎ থমকে গেলেন বিক্রম সিং।

লিমির চোখমুখ উৎসুক হয়ে উঠল, 'কী?'

'আমি তোমায় ক'টা জিনিস উপহার দিতে চাই।'

'কী জিনিস?'

কাল রাত্রে লোক পাঠিয়ে যে শাড়ি আর জামাগুলি আনিয়েছেন সেগুলো লিমিকে দেখালেন বিক্রম সিং। বললেন, 'এগুলো।'

একসঙ্গে এত শাড়ি, এত রঙবাহাব দামী দামী জামা-কাপড় আগে আর কখনও দ্যাখে নি লিমি। মুগ্ধ নির্নিমেষ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমাকে এগুলো দিতে চাইছেন!'

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'এমনি।' হিজ হাইনেস বলতে লাগলেন, 'ওগুলো যতদিন ছিঁড়ে না যায় আমার কথা তোমার মনে পড়বে। তোমাকে কিন্তু নিতেই হবে। নেবে তো?'

লিমি চুপ করে রইল। তার নীরবতা যে সম্মতিরই অন্য নাম বুঝতে অসুবিধে হল না।

একটু পর কালকের মতো লিমিকে নিয়ে হাতিতে উঠলেন বিক্রম সিং। সঙ্গে রাইফেল উঠল, শটগান উঠল, খাবারের বাক্স উঠল, ক্যামেরা দূরবীনও উঠল। কিছুই তাঁবুতে পড়ে থাকল না। আজ নতুন যা উঠল তা হল শাড়ি-জামার বিরাট একখানা বাক্স। পরিপাটি করে নিজের হাতে বাক্সটা স্বয়ং গুছিয়ে দিয়েছেন হিজ হাইনেস।

হাতি চলতে শুরু করল। কাল দক্ষিণে গিয়েছিলেন, ঝিলকি নদীর পার ধরে আজ বিপরীত দিকে অর্থাৎ উত্তরে চললেন বিক্রম সিংরা।

যেতে যেতে কালকের মতই গল্প চলল। এলোমেলো অসলগ্ন সব কথা। কালকের তুলনায় আজ খানিকটা সহজ হয়েছে লিমি; তার আড়ষ্টতা এবং বিরূপতা অনেকখানিই কেটে গেছে। নিস্পৃহ আগ্রহশূন্য মুখে হুঁ-হুঁ করে আজ শুধু মাথা নেড়েই যাচ্ছে না সে; নিজে থেকেও দু-চারটে কথা বলছে।

একটা গাছ দেখিয়ে হঠাৎ বিক্রম সিং বললেন, 'তোমরা মারিয়ারা এই গাছটাকে কী বল?'

লিমি বলল, 'চুযালা।'

আরেকটা গাছ দেখালেন বিক্রম সিং। লিমি তার মারিয়া নাম বলল।

গাছের নাম জেনেই বিক্রম সিংয়ের কৌতূহল সীমাবদ্ধ রইল না। লতা, পশু, পাখি, মেঘ, আকাশ—ইত্যাদি ইত্যাদির মারিয়া সমশব্দ জানতে লাগলেন। এত অসংখ্য শব্দ আর নাম মনে রাখার গরজ নেই, শুনছেন এবং তৎক্ষণাৎ ভুলে যাচ্ছেন। তিনি ছাড়া কে আর জানে, এ শুধু কালহরণেব খেলা।

কিছুক্ষণ এভাবে সময় কাটিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'আমার ভারি সাধ হচ্ছে—'

সহজ গলায় লিমি সাধটা জানতে চাইল।

বিক্রম সিং বললেন, 'আমাকে তোমাদের ভাষাটা শেখাবে লিমি?'

কী বলতে গিয়ে সচেতন হয়ে উঠল লিমি, 'উঁহু—'

আহত সুরে বিক্রম সিং বললেন, 'শেখাবে না!'

'কেমন করে শেখাব? তা তো সম্ভবই না।'

'কেন?'

'আমি তো আজই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি; আর কোনদিন আপনার সঙ্গে হয়ত দেখাও হবে না। ভাষাটা শেখাব কেমন করে?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন বিক্রম সিং। মুখখানা হতাশ এবং করুণ করে বললেন, 'তা বটে—'

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বিক্রম সিংই আবার শুরু করলেন, 'একটা কথা বলছিলাম লিমি—'

'বলুন না—'

'দু-দিন তো তুমি আমাদের এখানে রইলে—'

'হ্যাঁ।'

'আজ চলে যাচ্ছ—'

পরিপূর্ণ চোখে বিক্রম সিংয়ের দিকে তাকিয়ে লিমি বলল, 'তাতে কী হয়েছে?'

'তোমার কোন স্মৃতিই আমাদের কাছে থাকবে না।' আবেগে বিক্রম সিংয়ের কণ্ঠস্বর দুলতে লাগল, 'তাই ভাবছি; অবশ্য যদি তোমার আপত্তি না থাকে—'

'কী ভাবছেন?'

'তোমার ক'টা ফটো তুলব।'

লিমি এককথায় রাজী। গাছের ছায়ায়, নদীর স্রোতের মাঝখানে উঁচু পাথরের ওপর, হাতির পিঠে কারুকার্য-করা ছত্রীর তলায়—নানা ভাবে, নানা ভঙ্গিমায়, নানা পশ্চাৎপটে একের পর এক লিমির অগণিত ফটো তুললেন বিক্রম সিং।

ফটো তুলতে তুলতে দুপুর হয়ে গেল। বিক্রম সিং বললেন, 'খিদে পেয়েছে; খেতে টেতে দেবে তো?'

আজ আর বেশি কিছু বলতে হল না; প্লেটে খাবার সাজিয়ে বিক্রম সিং এবং মাহুতকে প্রথমে দিয়ে নিজে একটা প্লেট নিল লিমি।

গল্প করতে করতে খাওয়া-দাওয়া চলল; এদিকে হাতি ঝুম ঝুম ঘুণ্টি বাজিয়ে চলছে। হঠাৎ দূর থেকে হাওয়ার তরঙ্গে দোল খেতে খেতে একটা স্বর ভেসে এল, 'হে-এ-এ-এ, হে-এ-এ-এ—'

চমকে বিক্রম সিং বললেন, 'কেউ ডাকছে মনে হচ্ছে।'

মাহুত সায় দিল, 'জী মহারাজ।'

'হাতি থামাও।'

হাতি থেমে গেল। এদিকে পাশ থেকে দূরবীনটা তুলে নিয়েছেন হিজ হাইনেস। সেটা চোখে লাগিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে দেখতে পেলেন, দূরের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চৌহন আসছে।

বিক্রম সিং মাহুতকে বললেন, 'সাড়া দাও।'

মুখের কাছে হাতটা চোঙার মত করে মাহুত চেঁচিয়ে উঠল, 'হে-এ-এ-এ-এ—' হাওয়ার তরঙ্গে সে শব্দ দুলতে দুলতে চলে গেল।

বনভূমিতে এ রীতি প্রচলিত। মুখের কাছে ঐ ভাবে হাত এনে শব্দ করে নিজের নিজের অবস্থান বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

খানিক পরেই চৌহন এসে পড়ল। উত্তেজনায় এবং অনেকখানি পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আসার জন্য তার মুখ লাল, কপাল বেয়ে ঘাম ঝরছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ভয়ার্ত সুরে সে বলল, সর্বনাশ হয়েছে হুজৌর মহারাজ।'

চোখমুখ ধারাল হয়ে উঠল বিক্রম সিংয়ের। তার ইন্দ্রিয়গুলি কিসের আভাসে যেন চকিত হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ কাঁপা গলায় বললেন, 'কী হয়েছে?'

লিমির দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করতে লাগল চৌহন। তার দ্বিধার কারণ খানিকটা যেন আন্দাজ করতে পারলেন বিক্রম সিং। গোপনীয় কোন ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে যা একান্তে তাঁর কাছেই হয়ত বলতে চায় চৌহন।

অবশ্য মারিয়া আর ইংরেজি ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানে না লিমি। চৌহন যা বলছে তা হিন্দুস্থানী।

যাই হোক, হাতি থেকে বিক্রম সিং নেমে এলেন; ওদিকে চৌহনও ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। কাছে এসে ফিসফিসিয়ে সে বলল, 'কমশন (কমিশনার) সাহিব আমাদের তাঁবুতে এসেছে।'

রক্তস্রোতে কিছুক্ষণ ঝনঝনিয়ে কী যেন বেজে গেল বিক্রম সিংয়ের। বান্দর-কে-বাচ্চাটার এত বড় সাহস যে তাঁর তাঁবু পর্যন্ত ধাওয়া করেছে! চোয়াল পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠল। চাপা তীব্র স্বরে হিজ হাইনেস বললেন, 'কমশন সাহিব!'

'জী হুজৌর মহারাজ।'

'কুত্তাটা এখন কোথায়?'

'তাঁবুতে বসে আছে।'

'ভাগিয়ে দিতে পারলি না?'

'বললাম, মহারাজের সাথ এখন ভেট মুলাকাত হবে না; উনি জঙ্গলে বেরিয়েছেন। তবু গেল না। মালুম হচ্ছে—'

'কী?'

'আপনার সাথ মুলাকাত না করে সে যাবে না।'

'আমার কাছে তার কী দরকার?'

চৌহন বলল, 'তা বলতে পারব না মহারাজ। তবে আপনি তাঁবুতে না ফেরা পর্যন্ত লোকটা বসে থাকবে।'

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে লিমিকে দেখিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'ওর কথা আবার বান্দর-কে-বাচ্চাটাকে বলিস নি তো?'

'না মহারাজ।'

'তুই এক কাজ কর; এখানে থাক।'

'জী মহারাজ।'

'আমি তোর ঘোড়াটা নিয়ে তাঁবুতে যাচ্ছি। আরেকটা কথা, লিমিকে কমিশনার বজ্জাতটার কথা বলবি না।'

'জী মহারাজ।'

ঘোড়াতে উঠে বিক্রম সিং লিমিকে বললেন, 'জরুরি দরকার, আমাকে একবার তাঁবুতে যেতে হচ্ছে।'

'কখন ফিরবেন?'

'যাব আর আসব; তুমি ততক্ষণ বোসো।' বলতে বলতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

তাঁবুতে ফিরে বিক্রম সিং দেখলেন কমিশনার একা আসেন নি; এই অঞ্চলের এস. পি, ডি. এস. পি, ও. সি. এবং জন-দুয়েক পাদ্রীসাহেবও এসেছেন। এই বনভূমিতে ঘোড়া ছাড়া বাহন নেই; কাজেই ঘোড়া ছুটিয়েই তাঁদের আসতে হয়েছে। হাতিতেও আসা যায় কিন্তু রাজ-রাজড়া ছাড়া হাতি পোষার ক্ষমতা ক'জনের?

তাঁবুর সামনের খোলা জায়গায় ভৃত্যবাহিনী বেতের সোফা পেতে রেখেছিল; কমিশনার সদলবলে সেখানে বসে আছেন।

বিক্রম সিং ঘোড়া থেকে নেমে সেখানে আসতেই সবাই উঠে দাঁড়ালেন; সসম্ভ্রমে নত হয়ে অভিবাদন জানালেন।

মনে মনে কাঠিন্য অনুভব করছিলেন হিজ হাইনেস। তবু যথাসম্ভব সৌজন্য বজায় রেখে একটা সোফায় নিজেকে সঁপে দিলেন, সবাইকে বসতে বললেন।

পাদ্রী দুজন ছাড়া অন্যান্যদের সঙ্গে আগেই পরিচয় ছিল। তবু আনুষ্ঠানিকভাবে আরেকবার তাঁদের সঙ্গে হিজ হাইনেসের পরিচয় করিয়ে দিলেন কমিশনার। পাদ্রীদের একজনের নাম ফাদার হ্যানস, দ্বিতীয় জন ফাদার লিন্‌জে। ফাদার হ্যানসের বয়েস পঞ্চাশের সীমান্তে; জাতিতে প্রুশিয়ান। টকটকে রঙ, তীক্ষ্ণ নাসা, প্রাণবন্ত চোখ—সব কিছুই তাঁর আর্যসুলভ। ফাদার লিন্‌জে ইংরেজ। বয়েস ষাট পেরিয়ে গেছে। গায়ের চামড়া শিথিল, রেখাময়। হ্যানসের তুলনায় তিনি অনেক বেঁটে। বয়েসের ভার পড়েছে দেহে, ফলত কিঞ্চিৎ স্থূল। লিন্‌জের সমস্ত বিস্ময় তাঁর চোখে—সে চোখ যেমন তীক্ষ্ণ তেমনি দূরভেদী। ধারাল ছটার মতো কী যেন সেখানে মাখানো। তাঁর চোখের দিকে কেউ তাকিয়ে থাকবে সাধ্য কি।

ফাদার হ্যানস এবং ফাদার লিন্‌জে—দুজনেই নাকি কুড়ি বছর ধরে বস্তার জেলার আদিবাসীদের সেবা করে আসছেন।

পরিচয়-পর্বের পর কিছুক্ষণ কুশল-প্রশ্ন। তারপর বিক্রম সিং জানতে চাইলেন তাঁদের যথাযথ আপ্যায়ন করা হয়েছে কিনা।

কমিশনার সাহেব জানালেন, রাজভৃত্যেরা হিজ হাইনেসের মর্যাদা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। রাজকীয় আপ্যায়ন তারা করেছে; মেহমানদারিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নি।

বিক্রম সিং বললেন, 'আরেকটু কফি-টফি হবে নাকি?'

কমিশনার হাত জোড় করে বললেন, 'না, ধন্যবাদ।'

'অন্য কোন রিভারেজ—সে, হুইস্কি আর—'

'না-না ধন্যবাদ।'

কিছুক্ষণ নীরবতা। তারপর কমিশনার সাহেবই ধীর ত্বরাহীন সুরে আরম্ভ করলেন, 'খানিক আগে আমরা এসেছি।' বলে বিক্রম সিংয়ের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

বিক্রম সিং উত্তর দিলেন না। পকেট থেকে চুরুট বার করে লাইটার জ্বালিয়ে ধরিয়ে নিলেন।

কমিশনার আগের সুরেই আবার বললেন, 'এসে শুনলাম, হিজ হাইনেস জঙ্গলে বেরিয়েছেন।'

'হ্যাঁ—' আস্তে মাথা নাড়লেন বিক্রম সিং। সতর্ক ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার নৌকর জঙ্গলে গিয়ে খবর দিলে আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমার কাছে আপনার কিছু দরকার আছে কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই জন্যে হিজ হাইনেসকে বিরক্ত করতে হল মেহেরবানি করে আমার অপরাধ নেবেন না।'

লোকটার বিনয়ে খুশিই হলেন বিক্রম সিং। বললেন, ঠিক আছে। এবার আপনার দরকারি থাটা সেরে ফেলুন। আমাকে আবার জঙ্গলে ফিরতে হবে।

তৎক্ষণাৎ কিছু বললেন না কমিশনার। খুক খুক একটু হাসলেন; খুব সম্ভব বক্তব্যটাকে মনে ন গুছিয়ে নিতে লাগলেন। একটু পর বললেন, 'আপনার কাছে একটা অভিযোগ নিয়ে সেছি।'

'যথা—'

'যদি অভয় দেন তো বলি।'

'অভয় না দিলেও আপনি বলবেন। সে যাই হোক, স্বচ্ছন্দে বলে যান।'

চুরুটে লম্বা একটা টান দিলেন বিক্রম সিং।

কমিশনার একটুক্ষণ থতিয়ে রইলেন। পরক্ষণেই সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বললেন, 'কাল াপনার জঙ্গলে একটা ব্যাপার ঘটেছে যা খুবই দুঃখের এবং আরো দুঃখের সে-কথা আমাকে নতে আসতে হয়েছে।'

বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড মুহূর্তের জন্য থমকে গেল যেন। তবে কি লিমির জন্যই এরা ছুটে সেছে? লিমি জানিয়েছিল মিশনারীদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। মিশনারীদের কাছে নাভাবে অশেষ ঋণে তারা ঋণী। পাদ্রী দুটো তাকে উদ্ধার করতেই কি কমিশনারের সঙ্গে ভিযানে বেরিয়েছে? মনের ভেতর যাই থাক, বাইরে কিন্তু বিক্রম সিং স্থির, দৃঢ়, অবিচলিত। কুঁচকে বললেন, 'দুঃখের ব্যাপারটা কী?'

'আপনার এখানে সরকারি রিজার্ভ ফরেস্টের চারটে চিঁকারা হরিণ মারা পড়েছে।'

খানিকটা আশ্বস্ত হলেন বিক্রম সিং। তা হলে লিমি নয়। বুকের ভেতর থেকে নিঃশ্বাসটা বার সহজ স্রোতে বেরিয়ে এল। চুরুট নিভে গিয়েছিল, আবার সেটা ধরিয়ে বিক্রম সিং নলেন, 'মারা পড়েছে মানে?'

খুব আস্তে কমিশনার বললেন, 'তা তো আপনি নিজেই জানেন।'

খাড়া হয়ে উঠে বসলেন বিক্রম সিং 'কী বলতে চান আপনি?'

কমিশনারের চোখ দুটো ঈষৎ কপিশ, চুমরানো গোঁফের প্রান্ত দীর্ঘ পরিচর্যার সূচীতীক্ষ্ণ। াকটা বেশ লম্বা; পাক্কা ছ'ফুট তো হবেই। কিছু বেশিই হতে পারে। মজবুত শিরদাঁড়া, চওড়া জি, বিস্তৃত কপাল—সমস্তই যেন দম্ভ আর ক্ষমতার প্রতীক। সব মিলিয়ে অসহ্য, নিদারুণ কমের অসহ্য।

কমিশনারের ঠোঁটের প্রান্ত উত্থিত হল। তিনিও সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'আমার খে যখন শুনতে চান শুনুন। আপনার জঙ্গলে কাল চারটে চিঁকারা হরিণ মারা হয়েছে। কিন্তু ইনত এ নিষিদ্ধ।'

চাপা তীব্র স্বরে বিক্রম সিং বলে উঠলেন, 'আইন!'

'ইয়াস।'

'কিসের আইন, কার আইন?'

চিবিয়ে চিবিয়ে কমিশনার বললেন, 'কিসের আইন কার আইন—এ কথা আপনাকে বলতে ব বলে দুঃখিত। শুনে রাখুন, এ আইন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার।'

খানিকটা সময়ের জন্য ইঙ্গিতময় নীরবতা নেমে এল। তারপর কমিশনারের গলা শোনা াল, 'আমরা আগেও এ-কথা জানিয়েছি, ইস্তাহার বিলি করেছি, এমন কি ঢ্যাঁড়া পর্যন্ত দেওয়া য়েছে। তবু আপনার জঙ্গলে সরকারি পশু মারা বন্ধ হচ্ছে না।'

চারটে চিকারা হরিণ মারা হয়েছে; সে খবর লোকটা কেমন করে পেল ভেবে প্রথমা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন বিক্রম সিং। দুটোর বদলে লোকটার কি হাজার চোখ! একেবা সহস্রাক্ষ ইন্দ্র? বিস্ময়টা অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি; একটু পরই অসহনীয় রাগে মাথা শিরাগুলো যেন ফেটে পড়বে, মনে হল। অতি কষ্টে নিজেকে সংযত করলেন তিনি। দাঁতে দাঁ চেপে বললেন, 'চিকারা হরিণগুলোর গায়ে কি সরকারি ছাপ মারা ছিল?'

'না।'

'তা হলে জানতে পারলেন কী করে?'

'জেনেছি কোনোভাবে। তা ছাড়া রিজার্ভ ফরেস্টের জন্তু-জানোয়ারদের সংখ্যার লি আছে।'

'আপনি বুঝি প্রত্যেক দিন দু-চার বার করে জন্তু-জানোয়ারদের দাঁড় করিয়ে লিস্ট মিলি মিলিয়ে রোল কল করেন?'

বিদ্রূপ গায়ে না মেখে কমিশনার বললেন, 'আমি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নৌকর; সরকা কানুনটা অনেকবার আপনাকে জানানো হয়েছে। তবু আরেকবার জানিয়ে দিতে চাই—'

'স্বচ্ছন্দে।'

'সরকারি ফরেস্টের পশুপাখি আর মারা চলবে না।'

'বেশ। কিন্তু—'

'বলুন—'

'আপনাদের জন্তু-জানোয়ারদের গায়ে তো সরকারি তকমা আঁটা নেই; চিনব কেম করে?'

'চেনা কি খুব কঠিন?'

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকিয়ে রইলেন বিক্রম সিং।

কমিশনার সাহেব বললেন, 'বাইসন, চিকারা হরিণ, চিতা বাঘ—সরকারি ফরেস্ট ছা আর কোথাও নেই; ওগুলো সরকারি সম্পত্তি। ওদের না মারলেই হয়। তাতে আইনও বাঁচ ঝামেলাও হবে না।'

চুরুট হাতে স্থির নিষ্পলকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বিক্রম সিং। তারপর শক্ত চোয়ালের ভেতর থেকে স্বরটাকে মুক্তি দিয়ে বললেন, 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি

'নিশ্চয়ই।' কমিশনারের চোখের পাতাও নিশ্চল।

'আপনি এই মুহূর্তে যেখানে বসে কথা বলছেন সেই জায়গাটার নাম জানেন?'

'জানি বৈকি, আরুলকোট।'

'এখানকার মালিক কে, জানা আছে?'

বিক্রম সিংয়ের নির্দোষ প্রশ্নটার ভেতর কোনো গভীর ইঙ্গিত আছে কিনা, বুঝতে পা গেল না। সতর্ক চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে কমিশনার বললেন, 'আছে।'

খুব নিরীহ সুরে বিক্রম সিং এবার বললেন, 'আরুলকোট জঙ্গলের সীমানা কতখানি, কে কি আপনাকে তা বলে দিয়েছে?'

'আজ্ঞে না।'

'আমার কাছ থেকেই তা হলে জেনে নিন। এটার আয়তন প্রায় তিন হাজার একর।'

বিক্রম সিং কী বলতে চান এবারও বুঝতে না পেরে কমিশনার তাকিয়েই রইলেন।

বিক্রম সিং বলতে লাগলেন, 'আপনি তো ট্যাঁড়া-ট্যাঁড়া নোটিশ-ফোটিশ অনেক কিছু দিয়েছেন। সরকারি কানুনে তালিম দেবার জন্যে আজ ছুটেও এসেছেন।'

কমিশনার অস্পষ্ট গলায় কিছু বললেন, শোনা গেল না।

বিক্রম সিং থামেন নি, 'ও ব্যাপারে আমার কিছু বক্তব্য আছে। আপনি যখন এসেই ড়ছেন ভালোই হয়েছে। সামনা-সামনি কথাটা হয়ে যাক। নইলে আবার লোক মারফত নাতে হত; সে অনেক হাঙ্গামা।'

কমিশনার বললেন, 'বেশ তো বলুন না—'

বিক্রম সিং তক্ষুণি শুরু করলেন, 'আমার জঙ্গলের সীমানার ভেতর যা-ই আসুক না কেন, শু-পাখি-জানোয়ার, দেখা মাত্র গুলি করব। এটাই আমার দস্তুর বলেন দস্তুর, কানুন বলেন নুন। আপনার ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট যা খুশি করতে পারে।' হিজ হাইনেসের কণ্ঠস্বর একেবারে দলে গেছে। এখন সেটা হিংস্র, নিষ্ঠুর, করাতের মতো কর্কশ। তাঁর চোখেমুখে কোথাও জন্য বা ভদ্রতার চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া গেল না এই মুহূর্তে।

কমিশনার আর কিছু বললেন না; চোখের তারা দুটো দপ্‌দপ্ করতে লাগল শুধু; দাঁতের পব দাঁত ক্রমশঃ চেপে বসতে লাগল।

বিক্রম সিং বললেন, 'আচ্ছা গুড আফটারনুন। নষ্ট করার মতো আমার আর সময় নেই।' লতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

কমিশনার আর কী করে বসে থাকেন, সদলবলে তাঁকেও উঠে দাঁড়াতে হল। এবার তিনি খুললেন, 'কিন্তু—'

'আবার কী?' ভ্রূকুটি তীক্ষ্ণ হল বিক্রম সিংয়ের।

'আমার আরো দুটো কথা বলবার আছে যে—'

একটুক্ষণ কি চিন্তা করে বিক্রম সিং বললেন, 'দুটোই মাত্র; তার বেশি হলে আমার পক্ষে শানা সম্ভব হবে না। তাড়াতাড়ি বলুন—'

চোখের তারায় ধূর্ততা নেচে গেল কমিশনারের। খুব আস্তে আস্তে তিনি বললেন, 'আপনার শ্চয়ই 'একসেশন অব নেটিভ স্টেটস' বলে একটা কথা জানা আছে?'

'আপনি কী বলতে চান?'

'বলতে চাই দেশীয় রাজ্যগুলোর অন্তর্ভুক্তিকরণের কাজ শুরু হবে শিগ্‌গির। তখন—'

বিক্রম সিং এবার কিছু বললেন না।

কমিশনার একই রকম নিস্তরঙ্গ নির্দোষ সুরে বলে যেতে লাগলেন, 'তখন খুব সম্ভব এই ঙ্গল আপনার থাকবে না, সরকারি সম্পত্তি হয়ে যাবে।'

লোকটার ধৃষ্টতায় বিক্রম সিং স্তম্ভিত; ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নগণ্য এক নৌকরের এতখানি সাহস কী করে হয় তিনি তা ভেবে পেলেন না।

দিন-দুয়েক লিমিকে নিয়ে বেশ মেতে ছিলেন বিক্রম সিং; সেই মাতামাতির মধ্যে াকসেশনে'র ভাবনাটা ভুলে থাকতে পেরেছিলেন। ঐ নোংরা ছুঁচোটা সেই স্পর্শকাতর পন স্নায়ুতে ভালো রকম একটা ঘা বসিয়েছে।

অসহ্য রাগে সমস্ত শরীর কঠিন হয়ে উঠেছে বিক্রম সিংয়ের; চোখের তারা জ্বলছে। পালের দুধারে দুটো রক্তবাহী স্ফীত শিরা যেন ফেটে পড়বে। সরকারি ইস্তাহারে রিজার্ভ বেস্টের জন্তু-জানোয়ার মারা সম্পর্কে কদিন আগে নিষেধাজ্ঞা দেখে শরীরের সব রক্ত মাথায় য়ে চড়েছিল হিজ হাইনেসের; প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যক্ষ-রক্ষ পশু-পাখি-মানুষ—ইন্ডিয়া ভর্নমেন্টের যে কেউ আরুলকোট জঙ্গলে পা দিলেই হয়, গুলি চালিয়ে দেবেন। সে কথা বার াব, এমন কি একটু আগেও সমারোহের সঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন।

কিন্তু জলজ্যান্ত বান্দর-কে বাচ্চাটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ওপর লম্বা লম্বা : বলে মেজাজ যথেষ্ট পরিমাণে বিষাক্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও বন্দুক টেনে বার করতে পার না বিক্রম সিং। তবে কি অ্যাকসেশন অব নেটিভ স্টেটসের দুর্ভাবনাটা চোরাবানের ভেতরে ভেতরে নিঃশব্দে তাঁকে এত দুর্বল করে দিয়েছে যে বন্দুক তুলে নেবার শক্তিটুকু প অবশিষ্ট নেই!'

তীব্র চাপা গলায় বিক্রম সিং বললেন, 'আপনার প্রথম কথা নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কমিশনার তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করলেন।

'এবার দ্বিতীয়টা শেষ করে ফেলুন।'

'সে কথাটা আমার না; এঁদের।' পাদ্রী দুজনকে দেখিয়ে দিলেন কমিশনার, 'তবে—

জিজ্ঞাসু চোখে বিক্রম সিং তাকালেন।

কমিশনার বললেন, 'তবে এ জেলার শাসক হিসেবে সে সম্বন্ধে আমারও কিঞ্চিৎ মাথা আছে।'

'অত ভণিতা না করে যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন—' নীরস রুক্ষ এবং রূঢ় স্বরে ধমকেই উঠলেন বিক্রম সিং।

কমিশনার চমকে গেলেন যেন। তারপর দ্রুত বলতে শুরু করলেন, 'দক্ষিণ দিকে আপ জঙ্গলের সীমানা যেখানে শেষ হয়েছে তার বাইরে মারিয়ারা থাকে; সে কথা হিজ হাইনে কি জানা আছে?'

একটু নীরব থেকে বিক্রম সিং সরাসরি অস্বীকারই করলেন 'না।'

কমিশনার দমলেন না, 'সে যাই হোক, সেখানে মারিয়াদের অনেকগুলো গ্রাম আছে। ভেতর একটার নাম কোণ্ডাগাঁও—'

লিমি জানিয়েছিল তাদের গ্রামের নাম কোণ্ডাগাঁও। কমিশনারের মুখে ঐ নামটা শো সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম সিংয়ের ধমনীতে রক্তস্রোত কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেল; তারপরেই বেগে ছুটতে লাগল। মনে হল, হৃদপিণ্ডের ভেতর প্রচণ্ড শব্দ করে কী যেন ভাঙচুর শুরু গেছে।

কেমন যেন দুর্বলতা অনুভব করতে লাগলেন বিক্রম সিং। কিন্তু অতল স্তর ঠেলে ভেত অস্থিরতাকে তিনি বাইরে বেরিয়ে আসতে দিলেন না। চোখ-মুখ কুঁচকে বিরক্ত গলায় বল 'কী ব্যাপার, আপনি ট্রাইব্যাল রূপকথা ফাঁদতে বসলেন নাকি?'

কমিশনার খানিকটা থমকে গেলেন।

বিক্রম সিং আবার বললেন, 'আপনাকে কিন্তু আগেই জানিয়ে দিয়েছি, নষ্ট করবার ম অঢেল সময় আমার হাতে একটুও নেই।'

এবার কিছুটা ধাতস্থ হতে পেরেছেন কমিশনার। বেশ জোরালো গলায় বললেন, 'রূপ নয়, ইওর হাইনেস—'

'তবে কী?'

'এই মিশনারী ফাদার দু'জন আমার কাছে অভিযোগ এনেছেন যে—'

কমিশনার তাঁর ব্যক্তব্য শেষ করতে পারলেন না। তার আগেই বিক্রম সিং বলে উঠ 'আপনার কাছে কে কী অভিযোগ করেছে তা শুনতে কি আমি বাধ্য?'

কমিশনার বললেন, 'আজ্ঞে না। তবে '

'কী?'

'আপনি যদি অনুগ্রহ করে শোনেন আমার কিছু উপকার হতে পারে।'

'আপনার উপকার অপকার নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই কমিশনার সাহেব।'

'কিন্তু—'

'বলুন।'

'ব্যাপারটা খুবই গুরুতর; সবারই শোনা উচিত।'

'যত সংক্ষেপে সম্ভব বলুন।'

কমিশনার বলতে লাগলেন, 'এঁদের অভিযোগ, দিনকয়েক হল একটি মেয়ে কোগুাগাঁও থকে উধাও হয়ে গেছে। তার নাম লিমি।'

একটুক্ষণ থমকে থেকে বিক্রম সিং বললেন, 'পৃথিবীতে প্রতিদিন হাজার হাজার মেয়ে ধাও হয়ে যাচ্ছে।'

'তা অবশ্য যাচ্ছে।'

'তা হলে ওকথা আমাকে শোনাবার অর্থ কী?'

কিছুক্ষণ দ্বিধাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে থাকলেন কমিশনার। তারপর নিজেকে দৃঢ় করে বললেন, এই জন্যে শোনাচ্ছি যে ঐ ঘটনাটা কিছু রহস্যময়।'

'কী রকম।' কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর হল।

'আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি হিজ হাইনেস যেদিন এখানে শিকারে আসেন সেদিনই মেয়েটা ধাও হয়েছে। স্ট্রেঞ্জ কো-ইন্সিডেন্স—দৈব যোগাযোগই বলা যেতে পারে।'

বিক্রম সিং স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন, কমিশনারও নিষ্পলকে তাকিয়ে আছেন। দু-জোড়া চাখ যেন পরস্পরের ফাঁদে আটকে গেল।

অনেকটা সময় এইভাবে কাটল; তারপর বিক্রম সিং চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হোয়াট ডু ইউ মীন?'

'প্রমাণ যখন হাতে নেই তখন আমি কিছুই 'মীন' করতে পারি না।'

'তবে।'

'বেয়ার ফ্যাক্টটাই আপনাকে শুধু জানালাম।'

লোকটার স্পর্ধার শেষ সীমা কি পার হয়ে গেছে? রাগের ঘোবে বিক্রম সিং বুঝতে পারলেন না! মনে পড়ল লিমি এখন অনেক—অনেক দূরে নিরাপদ দূরত্বে হাতির পিঠে বসে আছে। বান্দর-কা-বাচ্চাটার সাধ্য নেই তাকে খুঁজে বার করতে পারে।

কর্কশ গলায় বিক্রম সিং বললেন, 'আপনার সন্দেহ হলে আমার তাঁবুগুলো সার্চ করে দেখতে পারেন। তবে একটা কথা।'

দু চোখে প্রশ্ন ফুটল কমিশনারের।

বিক্রম সিং বলতে লাগলেন, 'যদি লিমিকে আমার এখানে না পাওয়া যায় তা হলে—' এই পর্যন্ত বলে হঠাৎ থামলেন।

'তা হলে কী?' রুদ্ধস্বরে কমিশনার জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার বিপদ আছে।'

তাড়াতাড়ি দু-হাত জোড় করে কাঁচুমাচু মুখে কমিশনার বললেন, 'ছি-ছি, আপনাকে সন্দেহ করব এতবড় মাথা আমার ঘাড়ে নেই।'

বিদ্রূপের সুরে হিজ হাইনেস বললেন, 'তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' কমিশনার আগের সুরে বলে চললেন, 'আমি ঘটনাটা আপনাকে জানালাম। অপরাধ হয়ে থাকলে ক্ষমা চাইছি।'

বিক্রম সিং মনে মনে কিছুটা তৃপ্তিবোধ করলেন। শেষ পর্যন্ত ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের নৌকরট তাঁর কাছে মাথা নুইয়েছে। আত্মপ্রসাদে খানিকটা স্ফীত হয়ে তিনি বললেন, 'আচ্ছা গুড বাই আপনারা এখন আসতে পারেন।'

কমিশনার খুব আস্তে আস্তে এবার বলে উঠলেন, 'ইওর হাইনেস—'

'বলুন—'

'আপনার কাছে আগেভাগে একটা অনুমতি চেয়ে রাখছি।'

'কী সম্বন্ধে?'

'প্রয়োজন হলে আপনার এখানে আবার আসব।'

কমিশনারের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যাতে বিক্রম সিংয়ের সমস্ত সত্তার ভেতর দিে ঝনঝনানির মত কী বয়ে গেল। একটু আগে লোকটা বিনয়ের অবতার হয়ে উঠেছিল, সেট বোধহয় কপটতা।

চিবিয়ে চিবিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'আসতে চাইছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'—

'বেশ তো আসবেন, তবে—'

'কী?'

'তৈরি হয়েই আসবেন।'

নিষ্পলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে কমিশনার বললেন, 'আপনি যখন বলছেন তখন তাই হবে।' বলে আর অপেক্ষা করলেন না। সামনেই ঘোড়াগুলো চরে বেড়াচ্ছিল; দলবল নিে তাদের পিঠে গিয়ে উঠলেন।

যতক্ষণ কমিশনার আর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ এবং বাহনগুলিকে দেখা গেল একদৃষ্টে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন বিক্রম সিং। সুদূর টিলা পেরিয়ে নিবিড় বনভূমির ভেতর তাঁরা অদৃশ হয়ে গেলে আস্তে আস্তে চৌহনের সেই ঘোড়াটায় গিয়ে উঠলেন। এখন লিমির কাছে যেতে হবে।

বিক্রম সিং যখন লিমির নিকট পৌঁছুলেন তখন আকাশের কোথাও সূর্যটাকে খুঁজে পাওয গেল না। অরণ্য ঘন ছায়ার ভেতর ডুবে যেতে শুরু করেছে; মাথার ওপর পাখিদের অশ্রান্ত চেঁচামেচি চলছে।

ঘোড়া থেকে নেমে হাতিতে গিয়ে উঠলেন বিক্রম সিং। কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'তাঁবুতে ফিরে ভয়ানক ঝামেলায় পড়ে গেলাম; ফিরতে দেরি হয়ে গেল।'

লিমি উত্তর দিল না।

কুণ্ঠিত মুখে বিক্রম সিং বললেন, 'এদিকে যে বিপদ হয়ে গেল—'

এবারও লিমি নিশ্চুপ; শুধু চোখ তুলে তাকাল।

বিক্রম সিং বলতে লাগলেন, 'সন্ধ্যে হয়ে এল; অন্ধকারে তোমাদের গ্রামের পথটা আজও খুঁজে বার করতে পারব বলে ভরসা হচ্ছে না।

লিমি নিরুত্তর।

বিক্রম সিং একই সুরে বলে যাচ্ছেন, 'তুমি নিশ্চয়ই রাগ করছ। কিন্তু আমার কথাট একবার যদি ভাল করে বিবেচনা কর—'

লিমি এতক্ষণে মুখ খুলল। হিজ হাইনেসকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'না, রাগ করিনি কাজের ঝামেলায় আটকে গেলে কী আর করা যাবে। আপনি ইচ্ছে করে নিয়ে যাচ্ছেন না, ত তো নয়।'

'তা হলে সত্যি রাগ কর নি?'

'বললাম তো করিনি তবু বিশ্বাস হচ্ছে না? আপনি আচ্ছা ছেলেমানুষ তো।' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল লিমি। বলার সুরে নিজের অজান্তে খানিকটা অন্তরঙ্গতা ফুটে উঠেছে। এ জাতীয় ঘনিষ্ঠতা তার নিজের পক্ষেই অবাঞ্ছিত। তবে কি ঘৃণা ভয় আর আতঙ্কের উপাদানে বিক্রম সিংয়ের বিরুদ্ধে যে দুর্গটা কৈশোরের শুরুতেই সে তৈরি করেছিলে এই দুদিনেই তার ভিত শিথিল হয়ে যাচ্ছে?

বিক্রম সিং হাসলেন। মাহুতকে বললেন, 'আজ আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই। চল ফিবে যাই।'

যতখানি সম্ভব নীরস সুরে লিমি বলল, 'আজ যা হবার তা তো হয়েই গেল। কাল কিন্তু কোন কথা শুনব না। যে ভাবেই হোক আমাকে কোণ্ডাগাঁও পৌঁছে দিয়ে আসবেন।'

বিক্রম সিং তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, সে কথা আর বলতে—'

বনভূমি থেকে ফিরে টিলার সেই নতুন তাঁবুটায় লিমিকে রেখে নিজের তাঁবুতে এলেন বিক্রম সিং। এসে খানিক বিশ্রামের পর স্নান এবং প্রসাধন পর্ব চুকিয়ে ফেললেন।

বিকেলবেলা বান্দর-কে-বাচ্চা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের ঐ নৌকরটা মেজাজ একেবারে খারাপ করে দিয়ে গেছে। লিমিকে নিয়ে বেশ ভুলেই ছিলেন।

এই মুহূর্তে 'অ্যাকসেশন অব নেটিভ স্টেটস'-এর সেই পুরনো দুর্ভাবনাটা মাথার ভেতর হাজারটা ছুঁচ বিঁধিয়ে যাচ্ছে। যে কোনদিন ওটার বাস্তবে রূপায়ণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। নঈ দিল্লী থেকে বিক্রম সিং শুনে এসেছেন নাকের বদলে নরুনের মতো রাজত্বের বদলে রাজমর্যাদার বিনিময়ে বার্ষিক কিছু কিছু ভাতা মিলবে। ভদ্ররকমের জামা-কাপড় পরিয়ে 'ভাতা' বলা হচ্ছে, আসলে ওটা ভিক্ষেই।

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে উঠল বিক্রম সিংয়েব।

ব্যাটারি চালিত চমৎকার রেডিও সেট ছিল তাঁবুর কোণে। আস্তে আস্তে চাবি ঘুরিয়ে নানা স্টেশন ধরতে লাগলেন হিজ হাইনেস। কোথাও গান হচ্ছে, কোথাও নাটক, কোথাও খবর, কোথাও যন্ত্রসঙ্গীত। দুনিয়ায় কত রকমের যে ভাষা আছে তার হিসেব নেই।

প্রথমে আস্তে আস্তে চাবি ঘোরাচ্ছিলেন বিক্রম সিং। তারপর জোরে জোরে ঘোরাতে লাগলেন। তীক্ষ্ণ দ্রুত আর্তনাদের মতো বিচিত্র অসংখ্য অবিরত শব্দে তাঁবুর বাতাস বিদীর্ণ হয়ে যেত লাগল। ওগুলো যেন শব্দ না, তাঁর মাথার ভেতর এই মুহূর্তে যা চলেছে তারই প্রতিধ্বনি।

রেডিও বন্ধ করে একটা চুরুট ধরালেন বিক্রম সিং; তারপর কী মনে পড়তে গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'চৌহন—'

চৌহন দরজার বাইরে থাবা পেতে বসে ছিল, ডাকামাত্র ছুটে এল।

বিক্রম সিং বললেন, 'কাল যে লোকদুটো শহরে শাড়ি কিনতে গিয়েছিল তাদের নাম কী?'

'মহাদেও আর বিরজু।'

'ওদের ডেকে নিয়ে আয়।'

চৌহন ছুটল; একটু পরেই মহাদেও আর বিরজুকে নিয়ে সে হাজির।

বিক্রম সিং চৌহনের সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আজও তোদেব শহরে যেতে হবে।'

দু-জনেই আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ ঠুকল। তারপর জানাল, হুজৌর মহারাজের হুকুমে তারা জান দিতে পারে, শহরে যাওয়া তো সামান্য ব্যাপার।

কাল তারা শাড়ি এনেছিল, আজ লিমির জন্য প্রসাধনের জিনিস আনতে বললেন বিক্রম সিং।

লোকদুটো চলে গেলে দাবার ছক সাজিয়ে বসলেন হিজ হাইনেস। নিজেই ঘুরে ঘুরে দু-দিকের চাল দিতে লাগলেন। কিন্তু না, খুব বেশিক্ষণ দাবা ভাল লাগল না। এক লাথিতে দাবার ছক উল্টে দিয়ে ডাকলেন, 'চৌহন—'

'হুজৌর মহারাজ—' ছায়াসঙ্গী চৌহন তৎক্ষণাৎ দরজার কাছ থেকে ছুটে এল।

'জগমোহনরা কোথায়?'

'যারা যার তাঁবুতে।'

'ওদেরকে ডেকে নিয়ে আয়।'

একটু পর জগমোহনরা এল। কাল রাত্রে মাচান থেকে উঠে আসার পর এই প্রথম তাদেব সঙ্গে দেখা হল বিক্রম সিংয়ের।

কিছুক্ষণ শিকারের গল্প চলল। হিজ হাইনেস জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর, কালও রাত জাগা সারা হল নাকি কমল?'

কমলনয়ন বললেন, 'না ভাই।'

বিক্রম সিং নড়ে চড়ে উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'হাঁউ-মাউ-খাঁউ, কিসের গন্ধ যেন পাই পাই মনে হচ্ছে—'

'কালকের নিশিযাপন সাকসেসফুল বলতে পার। তুমি চলে আসার পর শিকারের অর্ধেক চার্ম তো চলে গেল। তবু ঠাট বজায় রাখতে চোখ টান করে ঘাঁটি আগলে পড়ে আছি; ভোর রাতের দিকে হঠাৎ পায়ের শব্দ। জোড়া প্যান্থার। আমার গুলিতে একটা পড়ল, ভায়লাভাই সাহেবের গুলিতে তার জুড়িটা।'

বিক্রম সিং উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, 'রীতিমত সুসংবাদ। পরশুও আমি চলে আসার পব হরিণ মেরেছিলে। কাল মারলে প্যান্থার। শিকারের ব্যাপারে আমি অপয়া হয়ে যাচ্ছি নাকি! সে যাক, আজ বেরুচ্ছ না?'

'কী করে বেরুই; তুমি যাবে, না যাবে না বুঝতে পারছি না। তুমি শিকার পার্টিতে না থাকলে পুরো আনন্দই মাটি।' কমলনয়ন বলতে লাগলেন, সেই বিকেল থেকে আমরা অবশ্য বেরুবার জন্যে রেডি হয়ে বসে আছি।'

'আমাকে খবর দাওনি কেন?'

'তুমি জঙ্গল থেকে ফিরলে সন্ধ্যেবেলা। নিশ্চয়ই খুব টায়ার্ড হয়ে ছিলে। তাই আর তাড়া দিলাম না।' কমলনয়ন হাসলেন।

বিক্রম সিং হাই তুলে তুড়ি দিতে দিতে বললেন, 'তা ভাই একটু টায়ার্ডই আছি; সারাদিন খুব একচোট ছোটাছুটি ঘোরাঘুরি গেছে।'

কমলনয়ন কী একটু ভেবে বললেন, 'তা হলে আজকের দিনটা বন্ধ থাক।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই ইচ্ছে। রাতে তোফা একখানা ঘুম দিয়ে কাল থেকে পুরোদমে লাগা যাবে।'

'সেই ভাল।'

আরো কিছুক্ষণ নানারকম এলোমেলো অসংলগ্ন গল্প চলল। তারপর বিক্রম সিং জগমোহনের দিকে ফিরলেন, 'তারপর চুহামারনেবালা—'

জগমোহন অ্যাটেনসনের ভঙ্গিতে খাড়া দাঁড়িয়ে একটা স্যালুট ঠুকল। বলল, 'আদেশ করুন ীর মহারাজ। নৌকর বিলকুল রেডি—'

'আজ যখন বেরুনো হচ্ছে না তখন একটু হাসাও হে। চুহামারনেবালা হাসাবে, তোমাদের ত্তি নেই তো?' বিক্রম সিং কমলনয়নের দিকে তাকালেন।

'না-না, আপত্তি কিসের? এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব।' সবাই সমস্বরে সায় দিলেন।

জগমোহন প্রথমে গলার ভেতর থেকে নানারকম পশুপাখির ডাক বার করতে লাগল, কটা হরবোলা। জন্তু-জানোয়ারের ডাকেই কিন্তু জগমোহনের উৎসাহ সীমাবদ্ধ থাকল না। । ধীরে সেটা খাত বদল করে আদিরসের দিকে ছুটতে লাগল। নানারকম রসালো অশ্লীল কেটে আর অঙ্গভঙ্গি করে নারীদেহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিতে লাগল সে। গাঁজলা চর উগ্র উত্তেজক নেশার মতো আসর জমে উঠল।

জগমোহনের ভাঁড়ামি যখন শীর্ষবিন্দুতে সেই সময় বিক্রম সিং চেঁচিয়ে উঠলেন, 'বহুত ছা, বহুত আচ্ছা—'

বাকি সবাই তারিফের সুরে হল্লা করে উঠলেন, 'কেয়াবাত, কেয়াবাত—'

গল্প-গুজব হাসি-হল্লায় রাতের অনেকখানি কাবার করে এক সময় জগমোহনরা বিদায় । অ্যাকসেশন, কমিশনার, এস পি, ডি. এস. পি, পাদ্রী সাহেব, বিকেলের সেই ব্যাপার—সব কার হয়ে সেই দুর্ভাবনাটা যেন বেশ কিছুটা হাল্কা হয়ে গেছে। হিজ হাইনেস ভাবলেন, যা র তাই হবে। বিপদ যদি কিছু আসে তিনি তার মুখোমুখি দাঁড়াবেন। অকারণে ভেবে ভেবে । গরম করে তোলার কোন মানে হয় না।

নয়

পরের দিন সকালবেলা যথারীতি লিমিকে নিয়ে বেরুতে যাবেন, এমন সময় চৌহন এসে ার, 'হুজৌর মহারাজ—'

'কী ব্যাপার?' বিক্রম সিংয়ের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল।

'হাকোয়াওলারা এসে গেছে।'

'কোথায়?'

'লছমনের ঘরের দাওয়ায় বসে আছে।'

'হাকোয়াওলা' শব্দটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। শিকারের নানা রকম পদ্ধতি আছে। অধিকাংশ ারী রাত্রিবেলা মাচানে বসে বাঘ-ভাল্লুকের-প্রতীক্ষা করেন। অনেকে আবার ঐটুকুতে সন্তুষ্ট তাঁরা দিনের বেলা নিচে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর সুবিধামত জায়গা দেখে দম বন্ধ করে বসে কন। আর উল্টো দিকে অনেক দূর থেকে একদল লোক সমস্বরে হাঁক ছাড়তে ছাড়তে জন্তু-নায়ার তাড়িয়ে নিয়ে আসে। রেঞ্জের ভেতর শিকারকে পাওয়া মাত্র শিকারীরা লক্ষ্যভেদ ন। যারা চেঁচামেচি করে হল্লা বাধিয়ে জন্তু-জানোয়ার তাড়িয়ে আনে তাদের বলা হয় কায়াওলা।'

বিক্রম সিংই লছমনকে, হাকোয়াওলাদের খবর দিতে বলেছিলেন। তারা এসে পড়তে একটু স্তিবোধ করলেন হিজ হাইনেস। চৌহনকে বললেন, 'কমলদের ডেকে নিয়ে আয় তো; তাড়ি আসবি।'

একটু পরে কমলনয়নরা এলে বিক্রম সিং বললেন, 'হাকোয়াওলাদের খবর পাঠিয়েছিলাম, । এসে গেছে।'

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'তাই নাকি? রীতিমত সুসংবাদ—'

বিক্রম সিং বললেন, 'হাকোয়াওলারা লছমনের ঘরের দাওয়ায় বসে আছে; ওদের নি খানিকটা পর তোমরা শিকারে বেরিয়ে পড়।'

'তুমি যাবে না!' একটু যেন বিমূঢ় আর বিস্মিতই দেখাল কমলনয়নদের।

'না ভাই।'

কমলনয়নরা কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন।

বিক্রম সিং বললেন, 'আমার পক্ষে দিনের বেলা জন্তু-জানোয়ারের পেছনে ঘোরা সং হবে না। রাত্রিবেলা তোমাদের সঙ্গে মাচানে গিয়ে বসব।'

জগমোহন হঠাৎ তার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতাটি করে বলল, 'দিনের বেলা হিজ হাইনেস ব্ সেই চিড়িয়াটার পেছনে ঘোরাব ব্রত নিয়েছেন।'

জগমোহনের কথায় কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেয় না; বিক্রম সিংও দিলেন না। তবু কিছ অপ্রতিভই যেন তাঁকে দেখাল। আগের কথাটা শুধরে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'রোজ রে না, মাঝে মাঝে দিনের বেলাতেও তোমাদের সঙ্গে বেরুব।'

কমলনয়নরা একসময় উঠে পড়লেন। তাঁরা বিদায় নিলে লিমিকে নিয়ে হাতিতে উঠে বিক্রম সিং। কাল আর পরশুর সেই সরঞ্জাম—বন্দুক, দূরবীন, জলের সোরাই, খাবারের বা লিমির শাড়ির প্যাকেট—ইত্যাদি ইত্যাদি তো ছিলই। তার সঙ্গে নতুন আরেকটা সুদৃশ্য বে বাস্কেট যুক্ত হয়েছে। ওটা মেয়েদের নানা লোভনীয় প্রসাধনের উপকরণে বোঝাই।

আজও সমস্ত দিন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালেন বিক্রম সিং. লিমির সঙ্গে প্রচুর গল্প করলেন, ত অসংখ্য ফটো তুললেন। কিন্তু সারাদিন ঘুরেও কোগুাগাঁওয়ের পথটা কিছুতেই খুঁজে বের ব গেল না। কাজেই সন্ধ্যেবেলা তাঁবুতে ফিরে আসতে হল।

এরপর থেকে রোজ সকালবেলা লিমিকে নিয়ে বেরুনো একটা নেশার মতো হয়ে উঠ কোনদিন তাঁরা যান উত্তরে, কোনদিন পুবে, কোনদিন বা পশ্চিমে। সকালে বেরিয়ে নিং বনভূমিতে সেই সন্ধ্যে পর্যন্ত বিচিত্র ঘোরের ভেতর ঘুরে বেড়ান বিক্রম সিং। গল্প করেন, ছ তোলেন, হাসি-পরিহাসে মেতে ওঠেন। তারপর সারাদিনের ক্লান্তি গায়ে মেখে দিনান্তে ফি আসেন। দিনেব পর দিন ঘুরেও কোগুাগাঁওয়ের পথ কিছুতেই আর খুঁজে বার করা সম্ভব হ না।

সন্ধ্যেবেলা ফিরেই প্রথমে সেই সাহসী লোকদুটোকে শহরে পাঠিয়ে দেন; কোনদিন ত নিয়ে আসে গয়না, কোনদিন লিমির ভাইবোনদের জন্য চমৎকার চমৎকার খেলনা। কোনদি বা অন্য কিছু। উপহারের একটা স্তূপ জমে উঠেছে।

যাই হোক সাহসী লোক দুটোকে শহরে পাঠিয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেন হিজ হাইনে তারপর স্নান সেরে কফি খেয়ে সারাদিনের তোলা ফটোগুলো নিজের হাতে ডেভলাপ কর বসেন। কারণ পরের দিন লিমিকে সেগুলো দিখিয়ে মুগ্ধ করে দিতে হবে তো। (রাজর্ব ব্যাপার; এই বনভূমিতেও বিক্রম সিংয়ের জন্য ডার্করুমের ব্যবস্থা আছে।)

রাত্রিবেলা রোজই অবশ্য কমলনয়নদের সঙ্গে শিকারে যান বিক্রম সিং, কিন্তু মৃগয়ায় তঁ মন নেই। কিছুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো বসে থেকে হঠাৎ একসময় হাতি নিয়ে তাঁবুতে ফি আসেন।

লিমিকে নিয়ে বিচিত্র খেলার ছক কেটেছিলেন বিক্রম সিং। সেটা এইরকম; কোগুাগাঁ লিমিদের বাড়ি; সেটা তো দুর্গম অজানা মেরুদেশ না যে খুঁজে বার করা যাবে না। অনায়াে

তা আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু বিক্রম সিংয়ের ইচ্ছা অন্যরকম। তিনি স্থির করেছেন লিমিকে নিয়ে রোজ জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবেন কিন্তু কোণ্ডাগাঁও-এ যাবেন না। লিমি ভাববে সত্যিই তো বিক্রম সিংয়ের চেষ্টার কোন ত্রুটি নেই, কোণ্ডাগাঁও যাবার পথটা খুঁজে না পাওয়া গেলে কী আর করা যাবে।

চাতুরির খেলাটা খেলতে গিয়ে কখন যে তার জালে জড়িয়ে পড়েছেন, বিক্রম সিংয়ের খেয়াল নেই। এখন সকালবেলা লিমিকে নিয়ে বেরুতে না পারলে তাঁর ভাল লাগে না। সমস্ত দিনটা আদিবাসিনী মেয়েটার সঙ্গ, তার হাসি, কথা—সব কিছু যেন বিক্রম সিংকে আচ্ছন্ন করে রাখে। রাতে তাঁবুতে ফিরে যখন বিছানায় যান তখন পর্যন্ত সেই ঘোরটা কাটে না। ঘুমের ভেতরেও বুঝি সম্মোহিত হয়ে থাকেন হিজ হাইনেস।

নারীর জন্য কোন দিন সাধনা করতে হয় নি বিক্রম সিংকে। সামান্য ত্যাগও স্বীকার করেন নি কোনদিন অথবা তপস্যা।

তাঁর প্রমোদের সহচরী হবার জন্য লিমিকে ছোঁ মেরে ঘুমন্ত গ্রাম থেকে তুলে এনেছিল লছমন। ইচ্ছা করলে যে কোন মুহূর্তে বিক্রম সিং তাকে নিজের শয্যার প্রান্তে টেনে আনতে পারেন; তার অটুট উদ্দাম লোভনীয় দেহ যে কোন সময় ডলে-পিষে-ধামসে, যা খুশি তাই করে নিজের কামনাকে পরিতৃপ্ত করতে পারেন। কিন্তু পরিচয় হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রম সিংয়ের মনে হয়েছে, এ মেয়েটির জাত আলাদা। এতকাল যাদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন সেই সব বিগলিত মোহময়ীদের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। তারপর বনভূমিতে তার সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে কবে যে বিক্রম সিং সাধনা শুরু করে দিয়েছেন, নিজেই জানেন না।

আশ্চর্য! দিনের বেলাটাই শুধু লিমির সঙ্গে থাকেন বিক্রম সিং। সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে লিমিকে তার তাঁবুতে পাঠিয়ে নিজের তাঁবুতে চলে আসেন। কিন্তু ভুলেও কোনদিন রাত্রিবেলা লিমির তাঁবুতে যান না অথবা তাকে নিজের তাঁবুতে ডেকে পাঠান না।

এদিকে বিক্রম সিং সম্বন্ধে লিমির মনোভাবও অনেকখানি বদলে গেছে। এতকাল তাঁর সম্পর্কে যে সমস্ত কিংবদন্তি সে শুনেছে তার অনেকখানিই এখন মিথ্যে মনে হয়। ঘৃণা বিতৃষ্ণা আর বিরূপতার রঙ ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য সংশয়টা এখনও পুরোপুরি কাটে নি; কেননা সেটা ছেলেবেলা থেকেই তার অস্তিত্বের ভেতর মিশে আছে।

দশ

একেক দিন একেক রকম গল্প করেন বিক্রম সিংরা। গল্প নয়, ওগুলো যেন মধুর গুঞ্জনময় প্রলাপ।

কোনদিন মারিয়া সমাজে বিয়ের প্রথাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নেন বিক্রম সিং, কোনদিন উৎসবের খবর সংগ্রহ করেন। জন্ম অথবা মৃত্যুর সময় কী কী রীতি পালন করতে হয় তার খুঁটিনাটি সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্ন করেন। লিমিদের গ্রামে কী কী দর্শনীয় জিনিস আছে, হাটবাজার কতদূরে ইত্যাদি ইত্যাদি কত কথা যে জিজ্ঞেস করেন তার হিসেব নেই।

এত কথা জানার প্রয়োজন নেই বিক্রম সিংয়ের। নগর বন্দরের ফেনায়িত কলরব থেকে অনেক দূরে নির্জন বনভূমিতে পৃথিবীর আদিম সন্তানদের জীবন কিভাবে কাটে তা জানবার জন্য তো আর ঘুম হচ্ছে না তাঁর। নিতান্তই দীর্ঘ অলস সময়ের শূন্যতা ভরবার জন্যই এত কথা, এত গল্প, এত অবিরাম গুঞ্জন।

সাগ্রহে বিক্রম সিংয়ের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যায় লিমি। গ্রামের প্রসঙ্গে বলে, 'জানেন আমাদের কোণ্ডাগাঁওয়ের দিকে আর সব যেমন-তেমন, জলের ভীষণ কষ্ট।'

'তাই নাকি?' বিক্রম সিং ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

'হ্যাঁ। দু মাইল দূরে একটা নদী আছে, রোজ সেখান থেকে আমাদের জল নিয়ে আসতে হয়। শীতকালে ততটা কষ্ট হয় না। কিন্তু গরমকালে অতখানি পথ ভেঙে জল আনতে প্রাণ একেবারে বেরিয়ে যায়।'

সহানুভূতির সুরে বিক্রম সিং বলেন, 'দু মাইল তো আর একটুখানি রাস্তা না, প্রাণ বেরুবারই কথা।'

লিমি বলে, 'ফাদাররা টিউবওয়েল বসাবে বসাবে করছে, তাও তো দু-বছর হয়ে গেল। বসায় আর না।'

ফাদারদের কথায় চমক লাগে বিক্রম সিংয়ের; পরক্ষণেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। মনে পড়ে যায়, ক'দিন আগে লিমির খোঁজে দুজন মিশনারী এসেছিল। একটু চুপ করে থেকে বলেন, 'বসাচ্ছে না কেন?'

'বলছে ইন্ডিয়া স্বাধীন হয়ে গেছে—'

'তাতে কী হয়েছে?'

'ওরা কোথা থেকে নাকি গ্রান্ট পায়। স্বাধীনতার পর গ্রান্টের টাকা অনেক কমে গেছে। টিউবওয়েল বসাবার মতো ফান্ড নেই।'

একটু ভেবে বিক্রম সিং বলেন, 'একটা কাজ করলে কী হয়?'

'কী কাজ?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় লিমি।

'আমি যদি তোমাদেব ওদিকে গোটাকয়েক টিউবওয়েল বসিয়ে দিই?'

কৃতজ্ঞ সুরে লিমি বলে, 'তা হলে গ্রামের লোক বেঁচে যায়। সমস্ত জীবন তারা আপনাকে আশীর্বাদ করবে।'

বিক্রম সিং বলেন, 'যত শিগ্‌গির হয় তোমাদের গ্রামে আমি টিউবওয়েল বসিয়ে দেব।'

একদিন বিক্রম সিং লক্ষ্য করলেন, সেই পুরনো হলুদ শাড়ি আর লাল জামাটা পরেই রোজ আসছে লিমি। আহত সুবে তিনি বললেন, 'এ কি।'

লিমি জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'তোমার জন্যে এত শাড়ি এত জামা এনে দিলাম। তুমি তা পরো নি কেন?'

'আমার লজ্জা করে।'

'লজ্জা করলে চলবে না। তোমাদের গ্রামের পথটা খুঁজে পেলে সারাজীবনে আব হয়ত দেখাই হবে না। শাড়িটাড়িগুলো পরলে তোমাকে কেমন দেখায় আমার বুঝি দেখতে ইচ্ছে করে না?'

লিমি উত্তর দিল না।

আশ্চর্য, পরের দিন নতুন জামা-কাপড়ে রাজেন্দ্রাণী সেজে হাতিতে উঠল লিমি। মুগ্ধ বিক্রম সিং শুধু বললেন, 'বাঃ!'

আগে বিক্রম সিংকেই উপযাচক হয়ে প্রথমে কথা বলতে হত; লিমি শুধু উত্তর দিয়ে যেত। ইদানীং লিমিও প্রথমে মুখ খুলতে শুরু করেছে।

একদিন লিমি বলল, 'আপনাকে কিন্তু রাজা বলে মনে হয় না।'

বিক্রম সিং চকিত হলেন, 'কেন?'

'একটা বইতে আমি রাজার ছবি দেখেছি---' বলতে বলতে চুপ করল লিমি।

'কিরকম ছবি?' রাজা উৎসুক হলেন।

'মাথায় মুকুট, গলায় লম্বা লম্বা সোনার হার, কানে কি সব গয়না, শুঁড়তোলা সোনার জ-করা নাগরা জুতো—আপনার কিন্তু সেসব কিচ্ছু নেই।'

পরের দিন সত্যিকার রাজবেশে, লিমির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে সাজসজ্জা করে সামনে এসে ড়ালেন বিক্রম সিং। ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, 'এইবার রাজা মনে হচ্ছে?'

বিস্মিত চমৎকৃত আদিবাসিনী শুধু বলতে পারল, 'হ্যাঁ; সত্যিকারের রাজা।'

একদিন লিমি বলল, 'আচ্ছা—'

'বল—' বিক্রম সিং তাকালেন।

'আপনার কে কে আছে?'

'কেউ না।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

সত্যিই কেউ নেই বিক্রম সিংয়ের। বাবা না, মা না, ভাইবোন কেউ না। ছেলেমেয়েও না। য়ে করেছিলেন সৌরাষ্ট্রের এক রাজকুমারীকে। রানী গত বছর মারা গেছেন।

একটু চুপ করে থেকে লিমি বলল, 'আমি জানি আপনি এখানে বছরে দু-বার শিকার রতে আসেন।'

বিক্রম সিং বললেন, 'ঠিকই জানো।'

'আপনি যে-রাজ্যের রাজা তার নাম কী?'

'বুরহনগড়।'

'আমাদের এই বস্তার জেলা থেকে সেটা কতদূরে?' দু' চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকাল মি।

'অনেক দূরে।'

'অনেক দূরে তো বুঝলাম।' লিমি বলতে লাগল, 'কত মাইল হবে?'

বিক্রম সিং মনে মনে হিসেব কষে বললেন, 'তা চার-পাঁচশ মাইল নিশ্চয়ই হবে।'

'সেখানে অনেক লোকজন আছে, না?'

'হ্যাঁ।'

সবলা কিশোরীর মতো অসীম আগ্রহে লিমি জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'আর কী কী জিনিস াছে সেখানে?'

এতদিন বিক্রম সিংই জিজ্ঞেস করেছেন। আদিবাসী সমাজের বিয়ের রীতি-নীতি, জন্ম এবং ৃত্যুতে পালনীয় প্রথা, লোকাচার, দেশাচার—ইত্যাদি ইত্যাদি নানা বিষয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে য়েছেন। এবার লিমির পালা।

বিক্রম সিং বললেন, 'বড় বড় বাড়ি, পাকা রাস্তা, রাজপ্রাসাদ, সৈন্যসৈন্য, দরবার—' লতে বলতে হঠাৎ থমকে গেলেন।

লিমি তাড়া লাগাল, 'কী হল, চুপ করে গেলেন যে?'

বিক্রম সিং শুনতে পেলেন না যেন। লিমির সঙ্গে নিঝুম বনভূমিতে ঘুরতে ঘুরতে ক' দিন গতের সব কিছু বিস্মৃত হয়ে ছিলেন। বুরহনগড় স্টেটের প্রসঙ্গ আসতে বিদ্যুৎ-চমকের মতো াকসেশনের কথা মনে পড়ে গেল। ভেতরে ভেতরে ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি;

পুরনো দুর্ভাবনাটা দিন-কয়েকের জন্য কোথায় কোন অদৃশ্যে আত্মগোপন করেছিল, চারদি থেকে হুড়মুড় করে আবার সেটা হানা দিতে লাগল।

লিমি আবার বলে উঠল, 'কী ভাবছেন অত?'

চিন্তিত দূরমনস্কের মতো আগের জের টেনে বিক্রম সিং এবার বললেন, 'চিড়িয়াখা আছে, মিউজিয়ম আছে, পোলো খেলার মাঠ আছে। সিনেমা হল-থিয়েটার-কলেজ-স্কুল— আবার তিনি থেমে গেলেন।

লিমির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'সব আপনার?'

বিক্রম সিং উত্তর দিলেন না। অতল গভীর এক ভাবনা কোন এক পাতালে ক্রমশ তাঁ টেনে নিতে লাগল।

লিমি এদিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, 'রাজাদের খুব সুখ, না?'

'কী রকম?' চোখ তুলে বিচিত্র দৃষ্টিতে তাকালেন হিজ হাইনেস।

'তাদের কোন কিছুর অভাব নেই। কত সোনা-দানা-হীরে-মুক্তো-লোকজন তাদের। দিনরা খালি খাও-দাও ফুর্তি কর, আনন্দ কর।'

'রাজাদের সম্বন্ধে চমৎকার একখানা ধারণা করে রেখেছ দেখছি।' বিক্রম সিং হাসলে

লিমি প্রশ্ন করল, 'কেন, আমি যা বললাম তা কি সত্যি নয়?'

'না।'

'না!'

লিমির কণ্ঠস্বরে এবং চোখেমুখে যে বিস্ময় আর বিমূঢ়তা ছিল তা লক্ষ্য করে বিক্রম সি বললেন, 'ফুর্তি-টুর্তি আমোদ-আহ্লাদ ছাড়া রাজাদের আরো অনেক কিছু করতে হয়।'

'আবার কী করতে হয়?'

'দুশ্চিন্তা; তাদের মাথা ভর্তি নানারকম ভাবনা।'

আস্তে মাথা দুলিয়ে লিমি বলল, 'বাজে কথা।'

'কে বললে বাজে কথা।' হিজ হাইনেস অবাক হলেন।

'আমার মনে হয়।' অগের মতোই মাথা দোলাল লিমি।

বিক্রম সিংকে এবার ক্ষুব্ধ দেখাল। বললেন, 'আমাকে ছাড়া আগে আর কখনও রা দেখেছ?'

'না।'

'দেখনি বলেই ওরকম মনে হয়। দেখলে আর হত না।'

একটুক্ষণ থতিয়ে রইল লিমি। তারপর বলল, 'চোখের সামনে আপনি রাজা রয়েছে আপনার কি কোন চিন্তা আছে?'

'আছে বৈকি।'

'কী?'

চাক চাক বরফের মতো যে দুর্ভাবনাটা হৃৎপিণ্ডে অনড় হয়ে আছে, কারো কাছে বল পারলে একটু হাল্কা হাওয়া যেত। বিক্রম সিং যা ভুলতে চান, ক্ষণকালের জন্য হলেও ভুলতে এতদূরে এই বনভূমিতে ছুটে এসেছেন—এই মুহূর্তে সেই দুর্ভাবনাটা দুর্বহ মনে হ আরুলকোটের জঙ্গলে কোথায় সেই বিস্মৃতির ঈশ্বর যিনি তাঁর অনুভব থেকে সব যন্ত্রণা মু দিতে পারেন? না, তাঁর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

যাই হোক প্রায় অচেনা এক আদিবাসিনীর কাছে ক্ষুব্ধ হৃদয়াবেগ সংযত রাখতে পারলেন া বিক্রম সিং। তিনি যে রাজা, মানবজাতির শীর্ষবিন্দুতে যাঁর সিংহাসন পাতা আর এই লিমি রীব বনবাসিনী—তাঁর বন্ধু না, আত্মীয় না—এসব মনে রইল না। আত্মবিস্মৃতের মতো বিক্রম সিং বলে উঠলেন, 'শুনতে চাও?'

বিক্রম সিংয়ের মুখ-চোখের চেহারা দেখে লিমি হতবাক। কণ্ঠস্বরে বিস্ময়, আগ্রহ এবং বমূঢ়তা মিশিয়ে বলল, 'যদি বলেন নিশ্চয়ই শুনতে চাই—'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বললেন না বিক্রম সিং। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দেশীয় রাজ্যগুলির ারতভুক্তির কথা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। অ্যাকসেশনটা বাস্তবে রূপ নেবার পর ফলাফল ী হবে, সব বললেন।

লিমি নিষ্পলকে তাকিয়ে রইল।

বিষণ্ণ হেসে স্খলিত সুরে বিক্রম সিং আবার বললেন, 'আজ আমাকে রাজা দেখছ, দু'দিন র আমি আর রাজা থাকব না।'

লিমি এবারও নিরুত্তর।

গাঢ় বিষাদময় সুরে বিক্রম সিং বলতে লাগলেন 'রাজা না থাকার মানে জানো?'

লিমির গলায় এবার স্বর ফুটল, 'কী?'

'ওটার সঙ্গে সঙ্গে রাজত্ব যাবে, লোকলস্কর-সৈন্যসামন্ত সব কিছু যাবে। মান-মর্যাদা কিছু াকবে না। আমি একেবারে পথের ধুলোয় মিশিয়ে যাব।'

বিক্রম সিংয়ের কণ্ঠস্বরে বলার ভঙ্গিতে এমন কিছু ছিল যা মনের গভীর অন্তঃপুরকে ছুঁয়ে ায়; যা অভিভূত করে ফেলে।

লিমিও অভিভূত হয়ে গেল। তার মনে হচ্ছে, অসীম ক্ষমতাবান সুখী নৃপতি নয়, অতি াধারণ অসহায় নিঃস্ব সব খোয়ানো একটি মানুষের কাছে বসে আছে। গাঢ় গভীর স্বরে সে লল, 'আপনার তো তা হলে খুব কষ্ট।'

বিক্রম সিংয়ের মুখে মলিন হাসি ফুটল, 'এবার বুঝলে তো রাজাদেরও দুঃখ-কষ্ট দুশ্চিন্তা- ভাবনা আছে। তারা শুধু ফুর্তি করে দিন কাটায়—তোমার এই ধারণাটা ঠিক না।'

লিমি উত্তর দিল না।

একটু চুপ করে থেকে বিক্রম সিং আবার বললেন, 'তুমি তো জানো, বছরে দু-বার করে আমি আরুলকোটের জঙ্গলে শিকার করতে আসি। একবার গ্রীষ্মে, আরেকবার হোলি খেলার ময়, মানে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে।'

'জানি।'

'এবার এসেছি হেমন্তে। দুঃখ আর দুশ্চিন্তা ভুলব বলে এবার আরুলকোটের জঙ্গলে াকারে এসেছিলাম। এসে বোধহয় ভালই হয়েছে। আর কিছু হোক আর নাই হোক তোমার দখা পেয়েছি অন্তত।'

লিমি চুপ; একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শুধু। তার চোখমুখ সহানুভূতিতে আচ্ছন্ন, সিক্ত।

এগার

সকালবেলা লিমিকে সঙ্গে নিয়ে হাতিতে ওঠা, সমস্তদিন বনভূমিতে ঘুরে বেড়ানো, সন্ধ্যেবেলা তাঁবুতে ফিরে আসা, একটু বিশ্রাম করে ভায়লাভাইদের সঙ্গে আবার শিকারে বেরুনো—এবার এসময়ে আরুলকোটে আসার পর দিনগুলো মোটামুটি এই ছকেই কেটে যাচ্ছিল।

আজও সকালবেলা লিমিকে নিয়ে বেরুতে যাবেন ঠিক সময় জগমোহনরা এসে পড়ল জিজ্ঞাসু চোখে বিক্রম সিং বললেন, 'কী ব্যাপার?'

সবার হয়ে কমলনয়ন শর্মা বললেন, 'আজ সকালবেলাটা তোমার বেরুনো চলবে না।'

জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়ে রইলেন বিক্রম সিং, কিছু বললেন না।

কমলনয়ন এবার ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, 'হাকোয়াওলারা আসার পর একদিনও তুমি দিনের বেলা শিকারে যাও নি। আমরাই শুধু গেছি। তাড়া খেয়ে জানোয়ারগুলো যখন ছুটতে থাকে, সেই ছুটন্ত জানোয়ারদের একমাত্র তুমিই মারতে পারো। আমরা গুলি করলে টার্গেটে লাগে না; প্রায় রোজই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছি, আরুলকোটে এমন নিষ্ফলা অভিযান আর কখনও হয়েছে বলে মনে পড়ছে না। বাঘ-ভাল্লুকগুলোর কাছে মান-সম্মান আর রইল না।'

বিক্রম সিং হেসে ফেললেন, 'আজ সকালে না হয় না-ই বেরুলাম, তা তোমরা আমাকে নিয়ে কী করতে চাও?'

'তোমাকে নিয়ে আজ শিকারে বেরুব।' কমলনয়ন বলতে লাগলেন, 'হাকোয়াওলারা রেডি হয়ে আছে, এখন তুমি গেলেই হয়।'

একটু কী ভেবে নিয়ে হিজ হাইনেস বললেন, 'আচ্ছা তোমরা একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।' কথাবার্তা হচ্ছিল তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে; বিক্রম সিং ভেতরে এসে ঢুকলেন।

ভেতরে একটা সোফায় লিমি বসে ছিল; বিক্রম সিংয়ের সঙ্গে কোণ্ডাগাঁওয়ের পথটা খুঁজতে যাবার জন্য সে উন্মুখ হয়ে আছে।

হিজ হাইনেস কাছে আসতেই লিমি জিজ্ঞেস করল, 'কারা যেন এসেছে মনে হল—'

'হ্যাঁ।' আস্তে ঘাড় কাত করলেন বিক্রম সিং।

'কারা। আমি চিনি?'

'চেনো; ওরা আমার বন্ধু।'

লিমি আর কিছু বলল না।

কুণ্ঠিত মুখে বিক্রম সিং বললেন, 'বুঝলে. একটা ব্যাপার হয়েছে—'

এবারও কিছু না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে লিমি তাকাল।

বিক্রম সিং আবার বললেন, 'বন্ধুদেব খুব ইচ্ছে, এখন আমি ওদের সঙ্গে একটু বেরুই'

'কিন্তু—' লিমিকে চিন্তান্বিত দেখাল।

'বল—' লিমির মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন বিক্রম সিং।

'আপনি ওদের সঙ্গে বেরিয়ে গেলে মুশকিল হবে।'

'কেন?'

'আমাদের গ্রামে যাবার পথটা খুঁজে বার করতে হবে না? কতদিন হয়ে গেল আপনাদের এখানে এসে আটকে আছি।'

বিক্রম সিং ব্যস্তভাবে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'সে কথা আমি ভুলে যাই নি; খুব বেশিক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে কাটাব না। দুপুরবেলার ভেতরেই ফিরে আসব। আর এসেই তোমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ব. কেমন?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও লিমি বলল, 'আচ্ছা।'

'যতক্ষণ না ফিরি তুমি কি আমার তাঁবুতে বসবে?'

'না।'

'তা হলে তোমার তাঁবুতে গিয়েই বোসো।' চৌহনকে ডেকে লিমিকে তার তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেন, বিক্রম সিং। তারপর বাইরে এসে কমলনয়নদের বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে যাব কিন্তু একটা শর্ত আছে?'

সমস্বরে কমলনয়নরা বললেন, 'কী?'

'দুপুরের মধ্যে আমায় ছেড়ে দিতে হবে। তারপর এক মিনিটও আর থাকতে পারব না।'

কমলনয়ন বললেন, 'আমাদের ছেড়ে দেবার কী আছে; তোমার যখন খুশি উঠে চলে আসবে। কেউ তোমায় আটকাবে না।'

'বেশ চল—'

সবাই বেরিয়ে পড়লেন।

আরুলকোটের অন্তঃপুরে যে জায়গাটা সব চাইতে নিঝুম, সব চাইতে স্তব্ধ হাকোয়াওলা আর কমলনয়নদের সঙ্গে নিয়ে একসময় সেইখানে এসে থামলেন বিক্রম সিং।

জায়গাটাকে ঘিরে ছোট-বড় অসংখ্য টিলা, টিলার মাথায় ঘন ঝোপ, চারদিকে ইতস্তত শালবন, কিছু কিছু অশোক আর আমলকিও চোখে পড়ছে।

গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে টুকরো টুকরো নীলাকাশ দেখা যায়। সেখানে বুনোটিয়ার ঝাঁক চক্কর দিয়ে চলেছে। আরো উঁচুতে আকাশের নীল আর হেমন্তের ভবঘুরে সাদা সাদা মেঘ যেখানে একাকার, সেখানে শঙ্খচিলেরা ডানা মেলে স্থির হয়ে আছে; হঠাৎ দেখলে মনে হয় পটে-আঁকা ছবিটি।

বেলা তেমন হয় নি; ঝিরঝির করে যে পুবে-হাওয়া বইছে তাতে শীতের আমেজ লেগেছে। বাতাসটুকু গা-জুড়নো, আরামদায়ক। ডালপালা আর পাতার ফাঁক দিয়ে যে রোদ এসে এখানে ওখানে দুলছে তা যেন জালির কাজকরা।

চারদিক ভাল করে দেখে বিক্রম সিং বললেন, 'আমার কিন্তু এই জায়গাটা বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমাদের মতামত বল—'

অন্য সবাই খানিক ঘুরে এদিক-সেদিক দেখে নিলেন। তারপর সবার মুখপাত্র হয়েই যেন কমলনয়ন বললেন, 'আমরা যে জন্যে এসেছি সে দিক থেকে জায়গাটা চমৎকার; এখানেই বসবার ব্যবস্থা করা যাক।'

শটগান, ডবল-ব্যারেল রাইফেল, কার্তুজ, দূরবীন—যাবতীয় সাজ-সরঞ্জামই নিয়ে আসা হয়েছিল। সেই সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার-দাবার, চুরুট, ক্যামেরা, লাইটার ইত্যাদি। তবে এই সকালবেলা হুইস্কির বোতলগুলোকেই শুধু অবহেলা করা হয়েছে, আদর করে কেউ আর সেগুলো নিয়ে আসে নি।

হাকোয়াওলারা এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের হাতে ক্যানেস্তারা আর সেগুলো পেটাবার জন্য কাঠের লম্বা লম্বা টুকরো। তারা এখানকার বাসিন্দা নয়, ছত্তিশগড়ের আদিবাসী। ভারী ঠোঁট, চাপা ভাবলেশহীন চোখ, বাদামী রঙ, ঈষৎ কটা চোখ, চওড়া পেশল বুক—এ সবের মধ্যে কোথায় যেন খানিকটা নিষ্ঠুরতা ফুটে রয়েছে।

বিক্রম সিং হাকোয়াওলাদের উদ্দেশে বললেন, 'তোরা ঐদিকে যা—' বলে সোজা দক্ষিণে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন, 'আধমাইল খানেক গিয়ে দাঁড়াবি; আমরা বাঁশির আওয়াজ দিলে তখন কাজ শুরু করবি।'

হাকোয়াওলাদের আর কিছু বলতে হবে না; তারা দলবদ্ধ হয়ে খাড়া দক্ষিণে হাঁটতে শুরু করল এবং নিমেষে টিলার পর টিলা পেরিয়ে ঘন বনের ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছত্তিশগড়ের এই লোকগুলোকে তালিম দেবার প্রয়োজন নেই। কেননা এরা শিক্ষিত হাকোয়াওলা; চেঁচামেচি করে টিন পিটিয়ে জন্তু-জানোয়ার তাড়িয়ে এনে শিকারীদের বন্দুকের নলের মুখে ধরে দেওয়া তাদের জীবিকা।

সারা বস্তার জেলাটাই শিকারীদের স্বর্গ; এখানে অসংখ্য বনভূমি, অগণিত বাঘ-ভালুক, বাইসন-হরিণ-খরগোশ-ময়ূর, পাখ-পাখালি। শিকার যাদের নেশা, শিকার যাদের সখ তার কি এই আনন্দলোকে না এসে পারে!

শুধু বিক্রম সিংরাই না, বর্ষার ক'টা মাস বাদ দিলে সমস্ত বছর এখানে বন্দুক বাগিয়ে শিকারীরা হানা দিচ্ছেই। আর মৃগয়াপার্টি এলেই ছত্তিশগড়ী ঐ হাকোয়াওলাদের ডাক পড়বেই।

যাই হোক, হাকোয়াওলারা চলে যাবার পর বিক্রম সিং ব্যূহ সাজিয়ে নিলেন। পুবদিকের উঁচু টিলাটায় যে ঝোপ তার ভেতর বসালেন ভায়লাভাইকে, পশ্চিমের টিলার ঝোপে জগমোহন আর হরিকিষেণ ব্যাসকে, উত্তরে ত্রিহুতমল পাঠক আর মহেশ দেশাইকে। কমলনয়নকে সঙ্গে নিয়ে বিক্রম সিং স্বয়ং রইলেন দক্ষিণ দুয়ারে; কেননা ওটাই মুখ। ওখান দিয়েই তাড়া-খাওয়া জানোয়ারের দল জলোচ্ছ্বাসের মত ছুটে আসবে।

ফাঁদ বেশ ভালই পাতা হয়েছে; সৈন্য সাজানোও চমৎকার। কোন কারণে বিক্রম সিংরা যদি লক্ষ্যভেদ করতে না পারেন, হরিকিষেণ ব্যাসেরা আছেন, তাঁরা ব্যর্থ হলে আছেন ভায়লাভাইরা। ভায়লাভাইদের নিশানা ঠিক না হলে আছেন ত্রিহুতমল আর মহেশ দেশাই। সুতরাং বাঁচবার পথ কোথাও খোলা নেই; মৃত্যু চার দুয়ারেই ওৎ পেতে আছে।

বিক্রম সিং হাঁকলেন, 'জগমোহন হরিকিষেণ রেডি?'

পশ্চিমের টিলা থেকে সাড়া এল, 'রেডি।'

বিক্রম সিং হাঁকলেন, ত্রিহুতমল মহেশ রেডি?'

উত্তরের টিলা থেকে সাড়া এল 'রেডি।'

বিক্রম সিং হাঁকলেন, ভায়লাভাই রেডি?'

পুবের টিলা থেকে সাড়া এল, 'রেডি—'

পাশে কমলনয়ন বসে ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বিক্রম সিং বললেন, 'তুমি রেডি তো?'

ঘাড় কাত করে কমলনয়ন জানালেন, তিনিও প্রস্তুত।

বিক্রম সিং আবার গলা চড়ালেন, 'তা হলে হাকোয়াওলাদের জানিয়ে দিই?'

উত্তর-পুব-পশ্চিম—সব দিকের টিলা থেকে উত্তর ভেসে এল, 'হ্যাঁ—'

বিক্রম সিং পকেট থেকে একটা হুইসিল বার করে জোরে ফুঁ দিলেন। অরণ্যের ভেতর দিয়ে তার তীক্ষ্ণ আওয়াজ হাওয়ার তরঙ্গে দোল খেতে খেতে ভেসে গেল।

একটু পরেই বনভূমির আত্মাকে চমকে দিয়ে দক্ষিণের দূর প্রান্ত থেকে মিলিত কণ্ঠের প্রচণ্ড চিৎকার উঠল, 'হো—ও—ও— ও—ও'—সেই সঙ্গে একটানা ঠিক টিন পেটাবার শব্দ।

চিৎকার আর ক্যানেস্তারার বাজনা এক জায়গায় থমকে নেই; কানের পর্দা ফাটাতে ফাটাতে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে।

এদিকে আরুলকোট জঙ্গলের এই নিভৃত অন্তঃপুর জুড়ে প্রলয় শুরু হয়ে গেছে। হাড়গিলা পাখি, খরগোশ, বুনো শিয়াল, হরিণ, বনবেড়াল, ভাম—ঊর্ধ্বশ্বাসে দিগ্বিদিকে ছুটে যাচ্ছে। যে পাখিরা বাসা ছেড়ে আকাশে ওড়ে নি তারাও বনভূমির মাথায় উঠে গলা ফাটিয়ে সমানে চেঁচিয়ে চলেছে আর চক্কর দিচ্ছে। মৃত্যুর দূতেরা যে হাজির, বনের এই অন্দরমহলের বাসিন্দারা যেন নিমেষে টের পেয়ে গেছে।

দল-ছুট্ একটা খরগোশ ছুটতে ছুটতে বিক্রম সিংয়ের কাছাকাছি চলে এসেছিল। কমলনয়ন
ক তুলে ধরলেন। বিক্রম তাঁর হাত চেপে ধরে বললেন, 'ওয়েট—'

খরগোশটা ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল।

মাচানে বসে যখন শিকার চলে তখন হিজ হাইনেস প্রথম গুলি ছুড়বেন—এটাই রাজকীয়
।। তিনি ব্যর্থ হলে অন্যের পালা। কিন্তু হাকোয়াওলারা যখন জন্তু-জানোয়ার তাড়িয়ে আনে
ন ঐ রকম বাধ্যবাধকতা নেই। তখন যে কেউ যখন খুশি লক্ষ্য ভেদ করতে পারে।

খরগোশের পর এল এক ঝাঁক হাড়গিলা, তারপর বুনো শিয়াল, অবশেষে হরিণ। প্রতিবারই
ক তুলতে গেছেন কমলনয়ন, প্রতিবারই তাঁকে থামিয়ে দিয়েছেন বিক্রম সিং।

কমলনয়ন খানিক বিরক্তই হলেন, 'কি ব্যাপার, মারতে দিচ্ছ না কেন?'

বিক্রম সিং বললেন, 'এ সব মেরে হাতে গন্ধ করে কী লাভ?'

'আরে বউনি তো হোক, তারপর বাঘ-ভাল্লুক পেলে মারা যাবে'খন।'

'উঁহু, বউনি করতে হলে বাঘ-ভাল্লুক দিয়েই করা ভাল।'

'বেশ, তোমার যখন ইচ্ছে—'

কমলনয়নের কথা শেষ হবার আগেই বুম-বুম গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। ঠিক কোন্
ঃ থেকে শব্দটা এল বুঝতে পারা গেল না।

বিক্রম সিং বললেন, 'ওরা বোধহয় হাড়গিলা খরগোশ দিয়েই বউনি করল।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

এদিকে খরগোশ-হাড়গিলা-হরিণ তাড়াতে তাড়াতে হাকোয়াওলারা কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে
ল। বিক্রম সিং বললেন, 'তাই তো—'

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে কমলনয়ন তাকালেন।

বিক্রম সিং আবার বললেন, 'হাকোয়াওলারা এসে পড়ল কিন্তু হরিণ-খরগোশ ছাড়া আর
ছুই তো বেরুল না। বাঘ-ভাল্লুক বোধহয় ওদিকে নেই।'

'বোধহয়।'

'এখন কী করা যায়?'

কমলনয়ন বললেন, 'কী করবে তুমিই বল।'

একটু ভেবে বিক্রম সিং বললেন, 'এক কাজ করা যাক, দক্ষিণ দিকে যখন কিছু নেই তখন
শ্চম থেকেই তাড়া দিতে বলা যাক।'

'বেশ, বলো।'

বিক্রম সিং হাকোয়াওলাদের পশ্চিমে পাঠালেন। তারপর ঝোপে ঝোপে আগের মতো দুর্গ
জয়ে হুইসিলে সংকেত দিলেন।

আবার হাকোয়াওলাদের চিৎকার আর ক্যানেস্তারার বাদ্য-ঝনঝনায় বনভূমি চকিত হয়ে
ল। তারপরেই পাখিদের সন্ত্রস্ত চেঁচামেচি, ভীত পশুদের উর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি শুরু হয়ে
ল। কিন্তু আশ্চর্য, এবারও হরিণ-খরগোশ ছাড়া বিশেষ কিছুই চোখে পড়ল না। নতুনের
তর শুধু আট-দশটা বন-মোরগ কঁক কঁক করে উড়ে গেল। কিন্তু কোথায় বা বাইসন,
থায় বা বাঘ কোথায় বা চিতা আর কোথায় বা শম্বরের ঝাঁক।

কিন্তু না, হিজ হাইনেসের প্রতিজ্ঞা খরগোশ হরিণের মতো নগণ্য নিরীহ প্রাণী দিয়ে মৃগয়ার
ব মেটাবেন না। এই অরণ্যে যার সব চাইতে দুর্দান্ত, সব চাইতে হিংস্র, সব চাইতে
ক্তপিপাসু—তাদের হৃদপিণ্ড বিদ্ধ না করা পর্যন্ত তৃপ্তি কোথায়? অন্তত বিক্রম সিংয়ের মতো

শিকারী খরগোশ-মোরগ মেরে হাত নষ্ট করতে পারেন না; ডবল-ব্যারেল রাইফেলের ম
রক্ষার্থেই পারেন না।

কাজেই হাকোয়াওলাদের উত্তরে যেতে হল। এখানেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কি, আরুলকোটের জঙ্গল থেকে বাঘ বাইসনেরা দেশান্তরী হয়ে গেছে?

এদিকে সূর্যটা বুকে হেঁটে হেঁটে কখন যে মধ্যাকাশের কাছাকাছি চলে এসেছে, খেয়াল। পাতার ভেতর দিয়ে যে হলুদ রঙের টুকরো টুকরো নিস্তেজ রোদ আসছিল ক্রমশঃ তা ধ হয়ে উঠছে, ঝিরঝিরে সেই পুবে বাতাসের গা থেকে ঠাণ্ডা শিহরণ কখন মুছে গেছে।

ওপর দিকে তাকিয়ে বিক্রম সিং চঞ্চল হলেন। হেমন্তের জ্বলন্ত নীলাকাশে সেই শঙ্খচিল এখনও স্থির চিত্রার্পিত হয়ে আছে। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল লিমিকে কথা দিয়ে এসে দুপুরবেলা তাকে নিয়ে কোণ্ডাগাঁওয়ের রাস্তা খুঁজতে বেরুবেন।

ওদিকে হাকোয়াওলারা তাড়া দিতে দিতে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। চারদিকের থেকে শিকারীরাও বেরিয়ে এসেছেন।

হতাশ অন্যমনস্ক সুরে বিক্রম সিং বললেন, 'না, কিছু হবার নয়। জন্তু-জানোয়ার এবার আর প্রাণ দিতে রাজী না।'

কে যেন বলে উঠলেন, 'সাধ করে কে প্রাণ দিতে চায়।'

'তা বটে।' বিক্রম সিং বলতে লাগলেন, 'সব দিক তো দেখা হল, আজ আর আশা। শুধু শুধু বসে থেকে কী হবে; চল ফিরে যাই।'

কমলনয়ন বললেন, 'সব দিক হয় নি—'

তাঁর দিকে ফিরে বিক্রম সিং বললেন, 'হয় নি মানে?'

'এখনও পুব দিকটা বাকি।'

'তিন দিকেই মিলল না; সব বাঘ-ভাল্লুক তোমার জন্যে পুবদিকে গিয়ে বসে আছে

'তা হয়ত নেই। তবে—' বলতে বলতে থেমে গেলেন কমলনয়ন শর্মা।

'তবে কী?'

'ঐ একটা দিকের জন্যে খুঁত থেকে যায় কেন?'

অনিচ্ছুক সুরে বিক্রম সিং বললেন, 'তবে দ্যাখো লাস্ট ট্রাই করে। আগে থেকেই পুবেও কিচ্ছু মিলবে না। সব দিক টুঁ-টুঁ—'

হঠাৎ জগমোহন বলে উঠল, 'আমার কী মনে হয় জানেন মহারাজ?'

ভ্রূ কুঁচকে হিজ হাইনেস বললেন, 'কী?'

'ঐ সালে বান্দর-কে-বাচ্চা কমিশনারটা রিজার্ভ ফরেস্টের তামাম শের ঔর ভাল্লুক পিঁজ ভেতর পুরে রেখেছে। এদিকে ওরা না এলে মারবেন কেমন করে?'

সবাই গলা ফাটিয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

কমিশনারের নামটা শোনামাত্র বিক্রম সিংয়ের ওপর দিয়ে চকিতে ছায়া পড়তে প দ্রুত মিলিয়ে গেল। হিজ হাইনেস বললেন, 'আচ্ছা, তোমাদের যখন এত ইচ্ছে তখন ষোল পূর্ণ হোক। পুব দিকটা দেখেই যাওয়া যাক।'

আবার রণসজ্জা শুরু হয়ে গেল। ঝোপে ঝোপে কেল্লা সাজিয়ে হাকোয়াওলাদের পুব পাঠিয়ে দিলেন বিক্রম সিং। তারপর আরম্ভ স্নায়ু টান-টান করে প্রতীক্ষা।

ওদিকে সংকেত পেয়েই হাকোয়াওলারা উদ্দামভাবে ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে। বনভূমি ডলে-পিষে-মুচড়ে-দুমড়ে দুর্বার বেগে আসছে যেন।

অন্য শিকারীদের কথা জানেন না বিক্রম সিং, তবে তাঁর নিজের কথাটা বলতে পারেন। য়ার ব্যাপারে এখন আর তিনি উৎসাহ বোধ করছেন না। ইন্দ্রিয়গুলোকে বারবার শাণিত রে তুলতে চাইছেন, বার বার সেগুলো শিথিল হয়ে যাচ্ছে। মনোযোগটা কিছুতেই একাগ্র রে শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে আসতে পারছেন না।

যথারীতি বনমোরগ, শিয়াল, চিঁকারা হরিণ, এক-আধটা দাঁতাল শুয়োর সামনে দিয়ে ছুটে রিয়ে গেল। দূরমনস্কের মতো দেখে গেলেন বিক্রম সিং।

কতক্ষণ কেটে গেছে, খেয়াল নেই। হঠাৎ কোমরের কাছটায় মৃদু ধাক্কা লাগতে চমকে মলনয়নের দিকে ফিরে বললেন, 'কী হল?'

ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে কমলনয়ন চাপা সতর্ক গলায় বললেন, 'হস্-স্-স্-স্ কথা লো না।'

গলা নামিয়ে হিজ হাইনেস জানতে চাইলেন, 'কেন? কী হয়েছে?'

কমলনয়ন সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলেন, 'ঐ দ্যাখো—'

বিক্রম সিং দেখলেন হাকোয়াওলাদের তাড়া খেয়ে একজোড়া ডোরাদার ছুটে এসে একটা র্জুন গাছের তলায় থমকে দাঁড়িয়েছে। গায়ের রঙ সোনালি-হলুদ, তার ওপর কেউ যেন যত্নে ব্রাশ টেনে কালো কালো ডোরা এঁকে দিয়েছে। লম্বায় খুব বেশি হবে না। ফুট বারোর তো। চোখের তারা ঝকঝকে মার্বেল গুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। তাদের গায়ে গাছপালার ক দিয়ে দুপুরের জাফরি কাটা ঝিলমিলে রোদ এসে পড়েছে।

এবার আরুলকোটের জঙ্গলে আসার পর এই প্রথম ডোরাকাটা চোখে পড়ল।

হাকোয়াওলারা দুর্দম গতিতে ছুটে আসছে। অর্জুন গাছের তলায় বাঘ দুটো সন্ত্রস্ত হয়ে ঠেছে; ভীত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। খুব সম্ভব কোন দিকে পালানোটা নিরাপদ, খনও স্থির করে উঠতে পারছে না।

এদিকে কমলনয়ন চঞ্চল হয়ে উঠলেন, 'কী হল বিক্রম?'

বাঘের দিকে চোখ রেখে বিক্রম সিং বললেন, 'কী হবে?'

'কী হবে মানে!' কমলনয়ন অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, 'এমন সুযোগ আর কখনও পাবে! কার আর কখনো এইরকম সামনে এসে দাঁড়াবে না। নাও, কুইক—রাইফেলটা তুলে নাও—'

যেন উদ্যম নেই—এইরকম ভঙ্গিতে রাইফেলটা তুলে নিলেন বিক্রম সিং। তারপর শিথিল য়ুর যেখানে যত উৎসাহ অবশিষ্ট ছিল সব কুড়িয়ে নিয়ে নিশানা ঠিক করতে লাগলেন।

হাকোয়াওলারা আরো কাছে এসে পড়েছে। ক্যানেস্তারা পেটানো আওয়াজের সঙ্গে মিলিত ৎকার একাকার হয়ে চারদিক জুড়ে যা চলছে এক কথায় তা অবর্ণনীয়।

বিক্রম সিংয়ের রাইফেল থেকে গুলি বেরুতে যাবে সেইসময় কী হল, বাঘ দুটো হঠাৎ লাফ য়ে সামনের টিলায় গিয়ে উঠল। সেখান থেকে তীরের মতো জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গল।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো বসে রইলেন বিক্রম সিং। তারপর আস্তে আস্তে রাইফেলটা পাশে মিয়ে রেখে বললেন, 'যাঃ!'

কমলনয়ন তাকিয়ে ছিলেন, আজও মিস করলে!'

'তাই তো দেখছি—' বিক্রম সিং হাসলেন, সেদিন রাত্তিরে বিশ হাত দূরে টার্গেট হিট রতে পারি নি। আজ শিকার সামনে এসে দাঁড়াল, তাও মারতে পারলাম না। এ্যাবসোলুটলি হপলেস, নাকি বল?'

কমলনয়ন বললেন, এবার এখানে এসে একটা জানোয়ারও ব্যাগ করতে পার নি। ব
মেয়েমানুষ আর শিকারের ব্যাপারে চিরদিন তুমি সাকসেসফুল।'

মেয়েমানুষের কথায় লিমির মুখ মনে পড়ল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বিক্রম বললেন, 'সব সময় সার্থক হওয়াও এক ধরনের একঘেয়েমি। দু-একটা ব্যর্থতার নজির না।'

'তাতে লাভ?'

'লাভ-লোকসান জানি না। বৈচিত্র্য আর কি—'

কমলনয়নের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'তোমার কী হয়েছে বল তো বিক্রম?'

'কিছু না; এখন উঠে পড়। বেলা ঢের হয়েছে, খিদে পেয়েছে মারাত্মক।'

দলবল নিয়ে খানিক পর তাঁবুতে ফিরে এলেন বিক্রম সিং। মৃগয়ায় এসে আজও f হল না; দিনটা নেহাতই বিফলে গেল।

বার

শিকার থেকে ফিরে এসেই চৌহনকে তাঁবুতে পাঠিয়ে দিলেন বিক্রম সিং। বললেন, ' সঙ্গে করে নিয়ে আসবি।'

ইতিমধ্যে দুপুর পেরিয়ে গেছে। সূর্যটা আর মধ্যাকাশে নেই, পশ্চিমের ঢালু বেয়ে খানিকটা গড়িয়ে নিচের দিকে নেমেছে।

একটু পর লিমি এল। বিক্রম সিং জবাবদিহির সুরে বললেন, 'আমার বড্ড দেরি গেল—'

শান্ত গলায় লিমি জানতে চাইলে, 'কেন?'

'আর বলো কেন—' বিক্রম সিং বলতে লাগলেন, 'অনেক আগেই এসে পড়তে পার কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা কিছুতেই আসতে দিলে না। এদিকে দুপুর গড়িয়ে গেছে—'

লিমি উত্তর দিল না।

বিক্রম সিং আবার বললেন, 'তোমার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?'

অস্ফুট গলায় লিমি বলল, 'না।'

বিক্রম সিং ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, চৌহনকে ডেকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি খাবার দিতে এখানেই আনতে বলবি।'

খাওয়া-দাওয়ার পালা দ্রুত চুকিয়ে লিমিকে নিয়ে হাতিতে উঠলেন বিক্রম সিং। মাহ বললেন, 'রোজই তো হয় উত্তরে নয় দক্ষিণে যাও। আজ পশ্চিম দিকে চল—'

'জী হুজৌব মহারাজ—'

ঠুন ঠুন ঘুন্টি বাজিয়ে হাতি পশ্চিমে চলতে শুরু করল।

লিমি বলল, 'আজ যেমন করে পারেন আমাদের গ্রামের পথটা খুঁজে বার করুন।'

'দেখি চেষ্টা করে।'

তারপর অন্য দিনের মত সময় কাটাবার জন্যে নানারকম কথা হতে লাগল। গল্পে তাঁরা কোথায় চলে এসেছিলেন, খেয়াল নেই। হঠাৎ দূর থেকে মৌমাছির গুঞ্জনের মত এক শব্দ ভেসে আসতে লাগল।

বিক্রম সিং প্রথমটা চকিত হলেন। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা কর কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। খুব আস্তে চিন্তান্বিত মুখে ডাকলেন, 'প্যারেলাল—'

'জী মহারাজ—' মাহুত মুখ ফিরিয়ে তাকাল।

'কী ব্যাপার বল তো?'

'বুঝতে পারছি না।'

খানিক ভেবে বিক্রম সিং বললেন, 'হাতি থামাও।'

মাহুত জিভ উল্টে বিচিত্র শব্দ করল। এটা সঙ্কেত; সঙ্গে সঙ্গে হাতি পা মুড়ে বসে পড়ল।

বিক্রম সিং বললেন, 'কিসের গণ্ডগোল, একটু খোঁজ নাও তো।'

হাতি থেকে নেমে মাহুত চলে যাচ্ছিল, বিক্রম সিং তাকে থামালেন, 'ও কি, খালি হাতেই চলে যে? একটা বন্দুক নিয়ে যাও। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে ওভাবে যাওয়া ঠিক না।'

রাজার মাহুত; একটু-আধটু বন্দুক চালানোর অভ্যেস তার আছে। রাইফেল নিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে সতর্ক পায়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিক্রম সিং উদগ্রীব হয়ে ছিলেন; কিছুক্ষণ পরে মাহুত ফিরে এল। আসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার প্যারেলাল?'

মাহুত যা জানাল, সংক্ষেপে এইরকম। বিক্রম সিংরা এখন যেখানে আছেন সেই জায়গাটা থেকে ক' পা গেলেই আরুলকোট জঙ্গল শেষ; আরুলকোটের এটাই পশ্চিম সীমান্ত। সীমানার পারে সিকি মাইল গেলেই একটা পুরনো মন্দির; মন্দিরটা ঘিরে কী উপলক্ষে যেন বিরাট মেলা বসেছে। সারা বস্তার জেলা তো বটেই, আরো দূর-দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ এসে সেখানে ভিড় জমিয়েছে। হিজ হাইনেস যে গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছেন তা ঐ মেলার মানুষদের মিলিত কণ্ঠস্বর।

সব শোনার পর বিক্রম সিং একটু কী ভাবলেন। তারপর হঠাৎ লিমির দিকে ফিরে উৎসাহের সুরে বললেন, 'মেলা দেখতে যাবে?'

লিমি বলল, 'কিন্তু—' বলেই চুপ করল।

তার দ্বিধার কারণটা বুঝলেন বিক্রম সিং। বললেন, 'এখনও ভাল করে বিকেল হয় নি; ঢের বেলা আছে। মেলা দেখে এক্ষুনি ফিরে আসব।'

মেলা কী বস্তু বিক্রম সিং কি আর জানেন না? খুব জানেন। নোংরা, কদর্য জঘন্য—কাঁড়ি কাঁড়ি বাজে লোক ওখানে জমা হয়ে মাছির মতো ভনভন করতে থাকে। ধুলোয়-ঘামে-চিৎকারে সস্তা খাবারের মেলা নরকের আর এক নাম। যিনি পৃথিবীপালক, বিশ্ববন্দিত, যিনি হিজ হাইনেস—তাঁর পক্ষে ওখানে ঐ ভিড়ের ভেতর একাকার হয়ে যাওয়া অকল্পনীয় ব্যাপার।

মেলার কথা বলতে গেলে গা ঘিন ঘিন করে বিক্রম সিংয়ের; স্নায়ুর ভেতর একটা বমির ভাব পাকিয়ে উঠতে থাকে। তবে যে উনিই ওখানে যেতে চাইছেন? নিশ্চয়ই গরীব সাধারণ মানুষদের জন্য তাঁর প্রাণে আবেগের নদী উথলে ওঠে নি। সেই পুরনো কৌশলটাকেই নতুন খাতে বইয়ে দিতে চাইছেন বিক্রম সিং; অর্থাৎ কালহরণের খেলাটা চালিয়েই যেতে হবে। দিনের পর দিন কোণ্ডাগাঁওয়ের পথ খোঁজার ছলে কত গল্প আর করা যায়! লিমিদের গ্রাম, তাদের প্রতিবেশী, তার বাবা-মা-ভাই-বোন, তাদের সমাজের উৎসব-পরব—কোন কথা জানতে আর বাকি নেই। করতে গেলে সেই পুরনো প্রশ্নগুলিই করতে হয়; জানতে গেলে সেই পুরনো কথাই জানতে হয়। মেলায় গেলে মোটামুটি একটা বিচিত্র পরিবেশের আস্বাদ পাওয়া যাবে। লিমি ক'দিন ধরে এই জঙ্গলের ভেতর রয়েছে; বৈচিত্র্য হয়ত তার ভালই লাগবে।

বিক্রম সিং বললেন, 'চল—'

একটু ইতস্তত করে লিমি হাতি থেকে নেমে এল। বিক্রম সিং মাহুতকে বললেন, 'তুমি এখানে অপেক্ষা কর; আমরা ঘুরে আসছি।'

'জী হুজৌর মহারাজ—' মাহুত হাতিতে উঠে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

বিক্রম সিং একটা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে লিমিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

জায়গাটা চমৎকার। ছোটখাটো একটি পাহাড়ের চূড়ো ঘিরে মেলাটা রীতিমত জমজমা হয়ে উঠেছে।

একটা নদী চোখে পড়ল; পাহাড়টাকে বেষ্টন করে নিচের দিকে ঢলের গতিতে নে আরুলকোট জঙ্গলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। খুব সম্ভব এটা ঝিলকিরই অংশ।

নদীর একধারে পুরনো মন্দির। ভিড়টা সেইখানেই সব চাইতে ঘন। তা ছাড়া অস্থা অসংখ্য দোকান-পসার চোখে পড়ছে। রঙিন পুতুলের দোকান, সস্তা খাবারের দোকান, কা আর চীনে মাটির বাসনের দোকান, লোহার ছুরি-কাঁচি-বঁটি-কুরুনির দোকান। জামা-কাপড় কাচের চুড়ি, বেলুন, প্লাস্টিকের মনোহরণ জিনিস ইত্যাদি ইত্যাদি কত রকমের দোকান বসেছে তার হিসেব নেই। তার ওপর জুয়া খেলার আসর বসেছে, ঘুরণচৌকি এসেছে, মাঝা একটা সার্কাসের তাঁবুও দেখা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে চারদিক সরগরম।

ভিড়ের ভেতর দিয়ে পথ করে প্রথমে মন্দিরের কাছে এলেন বিক্রম সিংরা। এই হট্টমেলা তাঁর মত মানুষ নিতান্তই অভাবিত। তিনি যে আর সবার চাইতে আলাদা, এটুকু বুঝে জনতার অসুবিধে হয় নি; তাঁর চেহারা-পোশাক তাঁর চালচলন তা বুঝিয়ে দিয়েছে। সসম্ভ্রমে মেলার মানুষগুলো সরে সরে বিক্রম সিংয়ের পথ করে দিয়েছে।

মন্দিরের কাছে এসে দাঁড়াতেই বৃদ্ধ পুরোহিত তাঁদের দেখতে পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন 'পুজো চড়াবেন?'

'না।' বিক্রম সিং বললেন, 'আমরা এমনি মেলা দেখতে এসেছি।'

'তা, বসুন না—' পুরোহিত খুব সমাদর করে আসন পেতে বিক্রম সিং আর লিমিকে বসালেন।

বিক্রম সিং বললেন, 'আচ্ছা, এই জায়গাটার নাম কী?'

'নারাণকোট।'

'এই মন্দিরটা কত কালের পুরনো?'

নেহাত কিছু বলতে হবে, সেই জন্যই বলা। নইলে এ জায়গার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বিক্রম সিংয়ের দুর্ভাবনা নেই।

পুরোহিত জানালেন, মন্দিরটা কতকালের পুরনো তার হদিস পুঁথিপত্রে থাকতে পারে কিন্তু তাঁর জানা নেই।

বিক্রম সিং বললেন, 'মেলাটা কত কালের?'

পুরোহিত বললেন, 'তা-ও বলতে পারব না। তবে আমার বাবা ছেলেবেলায় এই মেলায় এসেছেন, তাঁর বাবা তাঁর ছেলেবেলায় এসেছেন, তাঁর বাবা এসেছেন তাঁর ছেলেবেলায় বংশ পরম্পরায় এই মেলার কথা আমরা শুনে আসছি। প্রাচীন শৈব সম্প্রদায়ের লোকের এর পত্তন করেছে।'

পুরোহিত আরো জানালেন, সারা বছর এই জায়গাটা ফাঁকা পড়ে থাকে। শুধু হেমন্তে সপ্তাহখানেকের জন্য একবার মেলা বসে। মাত্র সাতটা দিন। মানুষের ভিড়ে—চেঁচামেচি দেখতে দেখতে দিন ক'টা যায়; তারপরেই অসীম শূন্যতা আর নৈঃশব্দ্য এসে এখানকার দখল নেয়

আরো কিছুক্ষণ গল্পটল্প করে বিক্রম সিং বললেন, 'এখন আমরা উঠি—'

পুরোহিত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'না-না, তা কখনো হয়!'

'কী ব্যাপার?'

'একটু প্রসাদ না নিয়ে যেতে পাবেন না—'

'প্রসাদ!' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বিক্রম সিং বললেন, 'আচ্ছা, আমরা একটু ঘুরে আসি। বার সময় প্রসাদ নিয়ে যাব।'

'যাবেন কিন্তু—'

'নিশ্চয়ই।'

তারপর ভিড় ঠেলে ঠেলে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখতে লাগলেন বিক্রম সিং। প্রথমটা আড়ষ্ট য়ে ছিল লিমি। ধীরে ধীরে সে সহজ সাবলীল হতে লাগল। যা দ্যাখে তাতেই সে এখন গ্ধ চমৎকৃত হয়ে যায়। আর বিক্রম সিংকে ডেকে ডেকে বলে, 'ঐটা দেখুন, কি সুন্দর!' ইটা দেখুন, চমৎকার!'

বিক্রম সিংকেও মুগ্ধ আদিবাসিনীর সঙ্গে সায় দিয়ে বলতে হয়, 'সত্যিই তো সুন্দর; ত্যিই তো চমৎকার!'

শুধু দেখাই হল না। ঘুরণচৌকিতে উঠে লিমি কয়েক পাক ঘুরে নিল; বিক্রম সিং অবশ্য ঠলেন না। এক পাশে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন। এই সস্তা আমোদের মেলায় হিজ হাইনেস ার কেমন করে গা ভাসিযে দেন; অবশ্য দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে মোটামুটি মন্দ লাগছে না। ছাড়া যেটা সব চাইতে বড় কথা, লিমি এই মেলায় এসে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে; কোণ্ডাগাঁও বার কথাটা খুব সম্ভব সে ভুলে গেছে।

ঘুরণচৌকিতে উঠেই সন্তুষ্ট থাকল না লিমি; সার্কাসের তাঁবুতেও গিয়ে ঢুকল। ঢুকলই , একরকম জোর করে বিক্রম সিংকেও ভেতরে নিয়ে গেল। জরাজীর্ণ একটা বাঘের খেলা, ছু তাসের খেলা. মুখ থেকে আগুন বার করা ইত্যাদি ইত্যাদি বাজে মার্কা খেলা দেখে মি তো রীতিমত মোহিত। অতএব বাধ্য হয়েই বিক্রম সিংকে মোহিত হতে হল। সার্কাস কে বেরিয়ে কাপড়-জামা-খেলনা-বেলুন—হাতের সামনে যা পেলেন তাই কিনে ফেললেন ক্রম সিং।

লিমি বলল, 'এত সব কিনছেন যে?'

'তোমার জন্যে।'

'আমার জন্যে আগে কত কী-ই তো কিনেছেন। আবার এখন কেন?'

'বা রে, মেলায় এলে—কিছু না কিনলে চলে!'

জীবনে এই প্রথম একটি মেয়েকে নিজের হাতে কিনে উপহার দিলেন বিক্রম সিং।

কেনাকাটা দেখাশোনা হলে আবার তাঁরা মন্দিরে ফিরলেন। যাবার সময় প্রসাদ নিয়ে াবেন কথা দিয়ে এসেছিলেন।

পুরোহিত যত্ন করে কলার পাতায় ফল-প্যাঁড়া সাজিয়ে দু-জনের হাতে দিলেন।

নিঃশব্দে খাওয়া চলছিল। হঠাৎ পুরোহিত বললেন, 'মেলা কী রকম দেখলেন?'

বিক্রম সিং বললেন, 'ভালই—'

লিমি উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'চমৎকার, চমৎকার। সার্কাস যা দেখলাম—'

বিক্রম সিং হাসতে লাগলেন।

পুরোহিত বলতে লাগলেন, আগে এ মেলার কত রবরবা ছিল; আরো লোক জন আসত। ার্কাসের তাঁবুই আসত আট-দশটা। বিহার থেকে নৌটঙ্কীর দল আসত। এখন কোনরকমে

ঠাটটুকু শুধু বজায় রাখা—' ঝুলি থেকে পুরনো গৌরবের চিত্রগুলি বার করে এখনক এই দীনতার পাশাপাশি রেখে তুলনা করার সুযোগ দিতে লাগলেন বৃদ্ধ।

কিছুক্ষণ নীরবতা।

তারপর পুরোহিতই আবার বললেন, 'ভাল কথা, আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ অথচ নামটা কিন্তু জানা হয় নি।'

'আমার নাম!' বিক্রম সিং কিছুক্ষণ থতিয়ে থেকে বললেন, 'আমার নাম বিষণলাল সোনি

লিমি পাশে বসে খেয়ে যাচ্ছিল, চমকে মুখ তুলল। বিক্রম সিং চোখ টিপে ইশারা করলে ইঙ্গিতটা লিমি বুঝল অর্থাৎ হিজ হাইনেস এখানে তাঁর পরিচয় গোপন রাখতে চান। চুপ করে রইল।

'কোথায় থাকেন আপনি?'

'রায়পুর।'

'যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করি—'

'স্বচ্ছন্দে।'

'কী করা হয় আপনার?' নোকরি বা ব্যবসা-ট্যবসা—'

'ব্যবসা। রায়পুরের বাজারে আমাদের গদি আছে।'

'আমি দেখেই বুঝেছি মালিক বড় শেঠ আছেন।'

বিক্রম সিং উত্তর দিলেন না।

পুরোহিত আবার বলল, 'আগে চাষাভুষো জাতীয় লোকই এই মেলায় আসত। এ ব বেশ বড় বড় মানুষ আসছে। আপনি এলেন্ শুক্লাজীও আজ আসবেন পূজো চড়াতে-

অন্যমনস্কের মত বিক্রম সিং বললেন, 'শুক্লাজী কে?'

'মস্ত বড় আদমী, এখানকার কমিশনার সাহেব—'

বিক্রম সিং চকিত হয়ে উঠলেন। মনে হল, এভাবে লিমিকে সঙ্গে নিয়ে আরুলবে জঙ্গলের সীমানা পেরিয়ে আসা তাঁর উচিত হয় নি, ব্যাপারটা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ হয়েছে।

যখন মেলায় আসেন খেয়াল ছিল না, কমিশনার বলে সেই অশুভ গ্রহটা হাজার চে মেলে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি শয়তানের অবতার। সো বিনয়ের ছদ্মবেশে সে বুঝিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, হিজ হাইনেসকে সহজে রেহাই দেবে

কমিশনারের নামটা লিমি শুনতে পেয়েছিল কিনা, কে বলবে। হঠাৎ ছোঁ মেরে ত একটা হাত ধরে আরুলকোট জঙ্গলের দিকে ছুটতে শুরু করলেন বিক্রম সিং। আর মন্দিরে বুড়ো পুরোহিত বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

কোণ্ডাগাঁও-গামী পথটা আজও খুঁজে বার করা গেল না।

তের

নানারঙের কাচে রোদের ঝিলিমিলির মতো অনেকগুলো দিন কেটে গেল।

একদিন তাঁবু থেকে বেরিয়ে হঠাৎ লিমি বলল, আচ্ছা—'

'কী বলছ?' বিক্রম সিং উন্মুখ হলেন।

'আপনার মতলবটা কী বলুন তো?'

মনে মনে চকিত হলেন বিক্রম সিং। চাতুরির খেলাটা কী ধরে ফেলেছে লিমি? সতর্ক চোখে লিমির দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে বললেন, 'মতলব মানে?'

'আপনার এই জঙ্গলে ক'দিন এসে আছি বলুন।' লিমি পাল্টা প্রশ্ন করল।

যুবতী আদিবাসিনী ঠিক কী বলতে চায় বুঝতে না পেরে বিক্রম সিং অনিশ্চয়তার সুরে বললেন, ক'দিন আর, খুব বেশি হলে পাঁচ-সাত দিন হবে।'

'কক্ষনো না।'

'তবে?'

'পুরো পনের দিন।'

'তুমি কি গুনে গুনে হিসেব করে রেখেছ?' বিক্রম সিং হেসে উঠলেন।

'নিশ্চয়ই।' বলে একটু চুপ করল লিমি। পরক্ষণেই আবার শুরু করল, 'পনের দিন হয়ে গেল তবু কোগুাগাঁওয়ে যাবার পথটা খুঁজে বার করতে পারলেন না?'

বিক্রম সিং প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলেন। তারপর সহজ সপ্রতিভ সুরে কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করলেন, 'আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ?'

লিমি উত্তর দিল না।

বিক্রম সিং আবার বললেন, 'রোজই তো তোমায় নিয়ে বেরুচ্ছি কিন্তু পথটা খুঁজে বার করতে না পাবলে আমার অপরাধটা কোথায়? তুমিই বিবেচনা করে দ্যাখো।'

'কিন্তু—'

'কী?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না লিমি। অনেকক্ষণ পর খুব আস্তে আস্তে প্রায় ফিসফিসিয়ে বলে উঠল, 'একজনের কথা ভেবে দেখেছেন?'

বিক্রম সিং অবাক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'কার কথা বল তো?'

'আমার নিজের কথা।'

'তোমার কী কথা?'

একটু ভেবে নিয়ে লিমি বলল, 'আদিবাসী হলেও আমাদের সমাজ-টমাজ বলে একটা ব্যাপার তো আছে; সেখানে আর দশজনের সঙ্গে আমাকে থাকতে হয়।'

'তা তো বটেই।' বিক্রম সিং মাথা নাড়লেন, 'সমাজের বাইরে কে আর বাস করে বলো? কিন্তু হঠাৎ ও কথা বললে যে?

চোখ নামিয়ে লিমি বলল, 'আপনার এখানে চিরকাল তো আর থাকব না; একদিন-না-একদিন কোগুাগাঁওয়ের পথটা নিশ্চয়ই খুঁজে বার করা যাবে।'

'নিশ্চয়ই যাবে।'

'ভেবে দেখুন এখানে দিনের পর দিন কাটিয়ে যখন গ্রামে ফিরব, আমার অবস্থাটা কী হবে?'

ঈষৎ শঙ্কিত সুরে বিক্রম সিং জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হবে?'

লিমি বলল, 'বুঝতে পারছেন না?'

'না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লিমি। তারপর ভারী কাঁপা গলায় বলল, 'গ্রামের লোকেরা আমার গায়ে থুতু দেবে। হয়ত—'

'হয়ত কী?' বিক্রম সিংয়ের দু-চোখ বিষাদঘন হল।

'গ্রাম থেকে আমাদের বার করে দিতে পারে।'

বিক্রম সিং চমকে উঠলেন, 'তাহলে তো তোমার খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে—'

নতমুখে লিমি বলল, 'তা একটু হচ্ছে বৈকি।'

অনেকক্ষণ নীরবতা। একটি যুবতী মেয়ে অভিভাবকহীন অবস্থায় দিনের পর দিন অপরিচিত একটি পুরুষের কাছে কাটালে যে তার ক্ষতি হয়, জীবনে এই প্রথম তা অনুভব করলেন বিক্রম সিং। রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'তোমাব আর এখানে থাকা উচিত নয়, না?'

লিমি চুপ।

এবার এক কাণ্ড করে বসলেন বিক্রম সিং। কাঁপা শিথিল সুরে বললেন, 'বুঝতে পারিনি লিমি, একেবারেই বুঝতে পারিনি। না বুঝে তোমার যথেষ্ট ক্ষতি করে ফেলেছি—'

লিমি এবারও নিরুত্তর।

বিক্রম সিং বলে যেতে লাগলেন, 'অনেক আগেই তোমাকে আমার পৌঁছে দিয়ে আসা উচিত ছিল, ইচ্ছে করে দিয়ে আসিনি।'

লিমি চকিত হল, 'ইচ্ছে করে দিয়ে আসেন নি?'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে?'

কী যেন ভর করে বসল বিক্রম সিংয়ের ওপর। কী বলছেন যে খেয়ালও আর রইল না। ঘোরের ভেতর বলে যেতে লাগলেন, 'কোশুাগাঁওয়ের পথটা যখন খুশি আমি বার করে ফেলতে পারতাম—'।

তীক্ষ্ণ প্রখর চোখে তাকাল লিমি। তীব্র স্বরে বলল, 'বার করেন নি কেন?'

'তোমাকে দেখে আমার খুব ভাল লেগে গিয়েছিল, তোমাকে ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে নি। তাই রোজ গ্রামে পৌঁছে দেবার নাম করে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি।'

লিমি উত্তর দিল না।

বিক্রম সিং একই রকম সুরে বলে যেতে লাগলেন, 'কিন্তু আর ক্ষতি তোমার করব না। শুধু আজকের দিনটা আমার কাছে থাকো। কাল, কাল নিশ্চয়ই তোমাকে তোমাদের গ্রামে দিয়ে আসব। আমার একান্ত অনুরোধ আজকের দিনটা তুমি যেতে চেও না।'

বিমূঢ়ের মতো কিছুক্ষণে তাকিয়ে থেকে লিমি বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

সেদিন তাঁবুতে ফিরে সারারাত ঘুমোতে পারলেন না বিক্রম সিং; নরম ফেননিভ বিছানায় ছটফট করে কাটালেন।

লিমির মত মেয়ে তাঁর সমস্ত জীবনের অভিজ্ঞতায় একটিও নেই। পনেরটা দিন লিমি তাঁকে প্রায় সব দুর্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাকে কি তিনি ফিরিয়ে দেবেন?

বিক্রম সিংয়ের চল্লিশ বছরের জীবনে কোন তরুণীই অনাস্বাদিত থেকে ফিরে যায় নি। কিন্তু এই একটি মাত্র মেয়ে যাকে এখনও স্পর্শ পর্যন্ত করেননি তিনি।

আপন স্বভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছুলেন বিক্রম সিং, লিমির ক্ষতি করবেন না। কষ্টিপাথরে এতকাল যারা চিহ্ন রেখে গেছে তারা সবাই নকল সোনা, সত্যিকারের পাকা সোনার একটি দাগ অন্তত থাক।

সারারাত বিনা ঘুমে কাটিয়ে পবের দিন সকালে লিমিকে নিয়ে হাতিতে উঠলেন বিক্রম সিং। এই ক' দিনে লিমির জন্যে যা-যা উপহার কেনা হয়েছিল সেগুলোও উঠল। যে ফটোগুলো

এতদিন তোলা হয়েছিল তার এক কপি করে একটা সুদৃশ্য খামে পুরে লিমির হাতে দিলেন বিক্রম সিং।

যেতে যেতে আজ খুবই অস্থিরতা বোধ করছেন হিজ হাইনেস। ঘুরে ঘুরে তাঁর দৃষ্টি লিমির মুখে এসে পড়ছে। চোখাচোখি হতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। অথচ—অথচ লিমির কাছে তাঁর কিছু বলবার আছে।

বিক্রম সিংয়ের মনের কথা যেন পড়তে পারল লিমি। উৎসুক সুরে জিজ্ঞেস করল, 'আমায় কিছু বলবেন?'

খানিক ইতস্তত করে বিক্রম সিং মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ।'

'বলুন—'

'আমার একটা অনুরোধ আছে। রাখবে?'

'অনুরোধটা কী, না শুনে আগে থেকে কী করে কথা দিই—'

'দেওয়া যায় না, না?' চোখের দৃষ্টি কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে আসতে লাগল বিক্রম সিংয়ের, 'ঠিকই তো, না বুঝে-সুঝে কী করেই বা দেওয়া যায়।'

লিমি উত্তর দিল না; উন্মুখ হয়ে রইল।

ঘোরের ভেতর থেকে বিক্রম সিং হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আমার সঙ্গে বুরহনগড় যাবে?'

'বুরহনগড়ে—মানে আপনার স্টেটে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন?' দু-চোখে অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকাল লিমি।

হঠাৎ যেন ঘোরটা কেটে গেল বিক্রম সিংয়ের। জোরে জোরে প্রবলবেগে মাথা নেড়ে বললেন, 'না, এমনি বলছিলাম।'

তারপর স্তব্ধতা।

অন্য দিন নিজেই উপযাচক হয়ে কত কথা বলেন বিক্রম সিং, হাসিতে-ঠাট্টায়-উচ্ছ্বাসে ভরপুর হয়ে থাকেন। আজ তাঁকে ঘিরে শুধু অসীম অন্তহীন অস্থিরতা।

লিমি লক্ষ্য করল, অন্য দিনের বিক্রম সিংয়ের সঙ্গে আজকের বিক্রম সিংয়ের বিন্দুমাত্র মিল নেই। আজকের এই মানুষটি চিন্তাগ্রস্ত, অবসন্ন, ক্লান্ত। বিষাদমলিন একটি ছায়া তাঁকে যেন বেষ্টন করে আছে।

লিমিই আজ উচ্ছ্বাসময়ী হয়ে উঠেছে। নিজে ডেকে ডেকে হাজারটা কথা বলছে সে, হাসছে। মাঝে মাঝে বিষণ্ণ অন্যমনস্ক সুরে এক-আধটা হুঁ-হাঁ দিয়ে যাচ্ছে বিক্রম সিং।

বিক্রম সিংয়ের ভাবান্তর লক্ষ্য করে হঠাৎ লিমি বলল, 'কি হয়েছে আপনার?'

বিক্রম সিং চমকে উঠলেন, 'কই কিছু না তো—'

'আপনি 'না' বললেই হবে—'

বিক্রম সিং যেন জোর করেই স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চাইলেন, 'আরে সত্যি আমার কিচ্ছু হয় নি।'

লিমি বলল, 'আমি দেখছি আপনি কী যেন ভাবছেন—'

'কী আবার ভাবব; ও তোমার দেখার ভুল—'

'স্বীকার করছি দেখার ভুল। কিন্তু—'

'কী?'

'অন্য দিন কত গল্প-টল্প করেন, হাসিঠাট্টায় মাতিয়ে রাখেন—আজ যেন ঝিমিয়ে পড়েছেন!'

চুরি ধরা পড়ে গেলে যেমন হয় প্রথমটা সেই রকম দেখাল বিক্রম সিংকে। পরক্ষণেই সেই ভাবটা সামলে নিয়ে ব্যস্ত অপ্রতিভ সুরে বললেন, 'কোথায় ঝিমিয়ে পড়েছি?' বলে হাসতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু হাসিটা নির্জীব আর উচ্ছ্বাসহীন দেখাল।

হেসেই থেমে থাকলেন না বিক্রম সিং। কথায়-বার্তায় ঠাট্টায় একটু রঙও ছিটিয়ে দিলেন, 'তোমার তো খুব মজা—'

'মজা কেন?' লিমি জানতে চাইল।

'বাড়ি ফিরে যাবে। ভাই-বোন-মা-বাবা, সবার সঙ্গে কত গল্প জুড়ে দেবে। তা ছাড়া—'

'কী?'

'তেমন কেউ যদি থাকে—'

'তেমন কেউ মানে?'

'এই ধরো যাকে প্রাণমন দিয়ে বসে আছ—তবে তো খুশির ফোয়ারা ছুটে যাবে।'

হৃৎপিণ্ড থেকে রক্তোচ্ছ্বাস উঠে এসে আদিবাসিনীর মুখখানা মুহূর্তে টকটকে হয়ে গেল। চোখ নামিয়ে সে কী যে ফিসফিস করল বোঝা গেল না।

লিমির মুখের রঙবদল লক্ষ্য করেননি হিজ হাইনেস। আবার কখন তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেছেন নিজেরই খেয়াল নেই।

অনেকক্ষণ পর ব্যাপারটা লক্ষ্য করে লিমি আবার তাকে সহজ হাসি-পরিহাসের ভেতর ফিরিয়ে আনতে চাইল। রসের কথা দু-একটা কী যেন বললও; কিন্তু বিক্রম সিং এবার যেভাবে উত্তর দিচ্ছেন তাতে বেশিক্ষণ উৎসাহ থাকবার কথা নয়।

লিমি বুঝল, ভেজা বারুদে আজ আর আলোর ফোয়ারা দেবে না। কাজেই একসময় সে-ও নীরব হয়ে গেল।

নিঝুম জঙ্গলে হাতির গলার ঘুন্টি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অন্তহীন স্তব্ধতার ভেতর খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকল। আজ বিক্রম সিং কেন এত অস্থির, এত বিমর্ষ, এত অন্যমনস্ক, কেন তাঁর এমন ভাবান্তর—আকাশ-পাতাল একাকার করেও লিমি বুঝে উঠতে পারল না।

আজ আর কোণ্ডাগাঁওয়ে যাবার পথটা খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। কাল রাতেই লছমনের কাছ থেকে তার সন্ধান জেনে নিয়েছেন বিক্রম সিং।

এখন বিকেল।

আরুলকোটের জঙ্গল থেকে বেরুলে দু-ধারে সারি সারি পাহাড়। কোণ্ডাগাঁওয়ে যাবার পথটা তার মাঝখান দিয়ে।

বিক্রম সিং দু-চোখে দূরবীন লাগিয়ে পথটা দেখছেন। দূরে পাখিরা উড়ছে, আরো দূরের পাহাড়গুলো ক্রমশ ধূসর হয়ে যাচ্ছে। আর রঙের ফোয়াবা ছুটিয়ে বেলাশেষের সূর্য দিনান্তের ওপারে ডুবে যাচ্ছে।

হঠাৎ অস্থির গলায় লিমি চেঁচিয়ে উঠল, 'এটাই আমাদের গ্রামে যাবার রাস্তা—'

চমকে মুখ ফেরালেন বিক্রম সিং, 'হ্যাঁ—'

আগের সুরেই লিমি চিৎকার করে বলতে লাগল, 'হাতি থামান, হাতি থামান—'

এতদিন পর গ্রামে ফিরছে লিমি, আনন্দ হবারই কথা। কিন্তু তার বদলে তাকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন, বিক্রম সিং বুঝে উঠতে পারছেন না। বিমূঢ়ের মত বললেন, 'কী হল তোমার, হাতি থামাতে বলছ কেন?'

'আমাকে নিয়ে আপনার কোণ্ডাগাঁও যেতে হবে না।'

'সে কি!'

লিমি বিক্রম সিংয়ের কথা যেন শুনতে পেল না। আপন মনে বলে যেতে লাগল, 'তাঁবুতে ফিরে চলুন—'

'কিন্তু কেন?' বিক্রম সিং হতবাক, 'গ্রামে যাবার জন্যে এতদিন তো আমায় পাগল করে তুলেছিলে! এখন কোণ্ডাগাঁওয়ের কাছাকাছি এসে ফিরে যেতে চাইছ কেন?'

লিমি বলতে লাগল, 'আমার খেয়াল ছিল না, তাই আপনাকে নিয়ে চলেছি। মারিয়াদের আপনি চেনেন না কিং—'

'কেন, তারা কী?'

'তারা কী, এককথায় বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে আপনাকে আমার সঙ্গে দেখলে রক্ষা নেই।'

বিক্রম সিং কিছু না বলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

লিমি বলল, 'কিছু জিজ্ঞেস করবে না, চিন্তা করবে না, দেখামাত্র আপনাকে মেরে ফেলবে।'

বিক্রম সিং স্তম্ভিত। তিনি অনুভব করলেন, বুকের ভেতরকার কোন নিভৃত স্পর্শকাতর অংশে এই মুহূর্তে সুন্দর মনোহর গন্ধের মত ধীরে ধীরে কী যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে। স্থির নিষ্পলকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ফিসফিসিয়ে বললেন, 'তা হলে তুমি যাবে কী করে?'

'সে পরে দেখা যাবে, আপাতত তাঁবুতে ফিরে চলুন তো।'

বিক্রম সিং অনেক বোঝালেন কিন্তু কিছুতেই তাঁকে নিয়ে কোণ্ডাগাঁও গেল না লিমি। অগত্যা আজও তাঁবুতে ফিরে আসতে হল।

চৌদ্দ

তাঁবুতে ফিরে চমকে উঠলেন বিক্রম সিং। অসংখ্য পুলিশ চারদিক বেষ্টন করে রয়েছে। তার ভেতর সেই বদমাস কমিশনারটা এ.পি., ডি.এস.পি., সেই পাদ্রীদুটো এবং অনেকগুলো আদিবাসী মারিয়াকে দেখা গেল।

হাতি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে কমিশনার তাঁর দলবল নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। মারিয়াগুলো লিমিকে দেখিয়ে দুর্বোধ্যভাষায় সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। লিমিও সেই ভাষায় তাদের কি বলতে লাগল। বিক্রম সিংয়ের চাকর-বাকর-বাবুর্চি-খানসামা থেকে শুরু করে বন্ধু-বান্ধব-মোসাহেব-বয়স্য সবাই চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে আছে।

কমিশনার চোখের তারা কুঁচকে বিক্রম সিংয়ের দিকে তাকালেন। বললেন, 'ইওর ম্যাজেস্টি, আপনার জন্যে সেই দুপুর থেকে অপেক্ষা করছি।'

দাঁতে দাঁত চাপলেন বিক্রম সিং।

কমিশনার আবার বললেন, 'আপনি আমাকে তৈরি হয়ে আসতে বলেছিলেন। সব খবর নিয়ে আমি তৈরি হয়েই এসেছি।'

বিক্রম সিং অস্ফুট স্বরে বললেন, 'কিসের খবর নিয়ে এসেছেন?'

'সেদিন আপনি আমাকে মিথ্যে বলেছিলেন।'

'মিথ্যে!'

'ইয়েস—' ডানদিকের গোঁফের প্রান্ত নাচিয়ে কমিশনার বললেন, 'কোণ্ডাগাঁও থেকে যে মারিয়া মেয়েটা নিখোঁজ হয়েছিল, আপনি বলেছিলেন, সে এখানে নেই। কিন্তু সে এখানেই ছিল; আর আপনিই তাকে চুরি করিয়ে এনেছিলেন।'

বিক্রম সিংয়ের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল।

কমিশনার থামেন নি, 'হাতিতে চড়িয়ে যাকে নিয়ে সারাদিন বিহার করে এইমাত্র আপনি ফিরলেন সেই মারিয়াদের নিখোঁজ মেয়ে। ঐ যে এখন ওর বাপ-মার সঙ্গে কথা বলছে। ওকে সনাক্ত করার জন্যে ওর বাপ-মা মিশনারী ফাদার আর ওদের গ্রামের লোকজন সঙ্গে করে এনেছি। সবাই লিমিকে চিনতে পেরেছে।'

এদিকে হারানো মেয়েকে এতদিন পর দেখতে পেয়ে মারিয়ারা যে চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল তার প্রাথমিক উচ্ছ্বাসটা স্তিমিত হয়ে গেছে। সবাই এখন কমিশনার আর হিজ হাইনেসের দিকে তাকিয়ে তাঁদের কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করছে।

কমিশনার বলতে লাগলেন, 'আপনি একটি মেয়েকে কিডন্যাপ করিয়ে নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছেন। এর চাইতে জঘন্য অপরাধ আমার জানা নেই। এসব ব্যাপারে পুলিশ অফিসাররা আসামীদের কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু আপনি রাজা, আপনার একটা মর্যাদা আছে। কাজেই অনুগ্রহ করে কাল নিজেই আপনি থানায় হাজিরা দেবেন।' 'রাজা' শব্দটা কেমন করে যেন উচ্চারণ করলেন কমিশনার।

চারপাশে চাকর-বাকরেরা দাঁড়িয়ে। এমন অপমানিত জীবনে কখনও হন নি বিক্রম সিং। শরীরের সমস্ত রক্ত লাফ দিয়ে মুখে উঠে এল; পরমুহূর্তেই পরতে পরতে নেমে যেতে লাগল।

একদৃষ্টে লিমি বিক্রম সিংকে দেখছিল। কিছুক্ষণ আগে এই লোকটাকে খুব দুঃখী, বিষণ্ণ ক্লান্ত মনে হয়েছিল। এখন তাঁকে আরো করুণ, বিমর্ষ মনে হচ্ছে। একেবারে মাটিতে মিশিয়ে গেছেন তিনি। সহানুভূতি আর সমবেদনার একটা ঢল সহসা বুকের ভেতরটা তরঙ্গিত করে দিয়ে গেল তার। নিজের অজান্তেই খুব সম্ভব সবাইকে সচকিত করে চেঁচিয়ে উঠল লিমি, 'রাজাবাহাদুর থানায় যাবেন না। উনি আমাকে কিডন্যাপ করে আনেন নি; আমি নিজের ইচ্ছায় এখানে এসেছিলাম।'

কমিশনার স্তম্ভিত। যারা চারপাশে দাঁড়িয়ে ছিল তারা হতবাক। এমন কি মাটির সঙ্গে মিশে যেতে যেতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো লিমির দিকে না তাকিয়ে পারলেন না বিক্রম সিং।

হতভম্বের মত কমিশনার বললেন, 'এ তুমি কী বলছ লিমি!'

'ঠিকই বলছি। আমি নিজের ইচ্ছায় এসেছি। আপনারা আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন তো?'

বিক্রম সিংকে হাতের মুঠোয় পেয়েও কিছু করা যাবে না ভাবতেই খুব খারাপ লাগল কমিশনারের। বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু—'

'কোন কিন্তু না। চলুন—'

'তুমি একবার ভেবে দেখ, লোকটা কত বড় শয়তান।'

বাধা দিয়ে লিমি বলল, 'আমার যা বলবার বলেছি। রাজাবাহাদুর সম্বন্ধে ভদ্রভাবে কথা বলুন।'

কমিশনার হাত উল্টে হতাশ ভঙ্গি করলেন। নারীচরিত্রের রহস্যময়তা হয়ত তাঁকে বিরক্ত করেছে।

যাবার আগে বিক্রম সিংয়ের কাছে এসে দাঁড়াল লিমি। গাঢ় গলায় বলল, 'ওরা এসেছে; আমাকে যেতে হবে।'

রুদ্ধস্বরে বিক্রম সিং বললেন, 'আর কি কোনদিন দেখা হবে না?'

'জানি না।'

একটু চুপ। তারপর বিক্রম সিং বললেন, 'কিন্তু তোমার নতুন জামা-টামাগুলো—'

'এখন কেমন করে নেব।'

'বেশ, আমি কারোকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।'

'তা হলে সেই সঙ্গে আপনার একটা ছবিও পাঠিয়ে দেবেন।'

আবেগের স্রোতে ভাসতে ভাসতে বিক্রম সিং ফিস ফিস করলেন, 'দেব—নিশ্চয়ই দেব।'

একটু পর লিমিরা চলে গেল। চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন হিজ হাইনেস। জীবনে এই একবার, মাত্র একবারই নারীর জন্য সাধনা করেছিলেন বিক্রম সিং। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

এবার অসময়ে আরুলকোটের জঙ্গলে এসে বাঘ-ভাল্লুক কিছুই মারতে পারেন নি বিক্রম সিং। শুধু একটি বুনো পাখির হৃদয় শিকার করে গেলেন।

মানুষের মহিমা

পুরনো আমলেব নরম গদিওলা বিশাল খাটটার ঠিক মাঝখানে শুয়ে আছেন রেবতীমোহন। তাঁর দু'চোখ বোজা। গলার ভেতর থেকে কিছুক্ষণ পর পব আধফোটা কাতর আওয়াজ বেরিয়ে আসছে।

মাথার ওপর পঞ্চাশ বছর আগের চার ব্লেডের ফ্যানটা ফুল স্পীডে ঘুরে যাচ্ছে। তবু প্রচুর ঘামছেন রেবতীমোহন। পবনের পায়জামা এবং পাঞ্জাবি ভিজে সপসপে হয়ে যাচ্ছে।

ওল্ড বালিগঞ্জের নিরিবিলি অভিজাত পাড়ায় বিরাট কম্পাউন্ডওলা বাড়ির দোতলায় রেবতীমোহনের এই বেডরুম। গথিক স্টাইলের এই বাড়িটা তৈবি হয়েছিল বৃটিশ আমলে, এই সেঞ্চুরির গোড়ার দিকে।

রেবতীমোহনের পাশে বসে তোয়ালে দিয়ে মাঝে মাঝেই তাঁব গলা কপাল মুছে দিচ্ছে সুতপা। কিন্তু পরক্ষণেই আবার চামড়ার তলা থেকে দানা দানা ঘাম ফুটে বেরুচ্ছে। এসব কিসের লক্ষণ বুঝতে অসুবিধা হয় না তার। ঠিক দু'বছর আগে একবার মারাত্মক হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে রেবতীমোহনের। হুবহু সেই সব চিহ্নই আজ আবার দেখা যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন মুখে পলকহীন তাঁর দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় সুতপা ডাকে, 'বাবা, বাবা—'

রেবতীমোহন উত্তর দেন না।

সাড়া যে পাওয়া যাবে না, সেটা ভাল করেই জানে সুতপা। রেবতীমোহন অজ্ঞান হয়ে আছেন। কোনো কিছু শোনা বা অনুভব করার শক্তি তাঁর লুপ্ত হয়ে গেছে। তবু যে সুতপা প্রায়ই ডাকছে তার কারণ একটাই। নিজের হলেও একটা জীবন্ত মানুষের কণ্ঠস্বর তো শোনা যাচ্ছে। সে ছাড়া ওল্ড বালিগঞ্জের এত বড় বাড়িতে সুস্থ সবল মানুষ আর একজনও নেই। দু'টি কাজের লোক ছিল পবশু পর্যন্ত। তাদের একজনের মা মারা গেছে, আরেকজনের মেয়ের বিয়ে। দু'জনকেই ছুটি দিতে হয়েছে। দশ-বারো দিনের আগে কেউ ফিরবে না।

বাইরে এই মুহূর্তে তুমুল বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে মেঘেব একটানা গজরানি। আকাশটাকে আড়াআড়ি চিরে, থেকে থেকেই বিদ্যুৎ চমকে যায়।

শুরু হয়েছিল সেই বিকেলে। তারপর একনাগাড়ে ঝরেই চলেছে। সীসার ফলার মত লক্ষ কোটি বৃষ্টির ফোঁটা আকাশ থেকে অনবরত নেমে আসছে। এই বৃষ্টি আদৌ যে থামবে তার কোনো লক্ষণই নেই। কলকাতা যেন মহাবিশ্বের আদিম কোনো দুর্যোগের দিনে ফিরে গেছে।

সুতপা বুঝতে পারছিল, এখনই ডাক্তার দরকার। কিন্তু কাজের লোকেরা তো নেই-ই, তা ছাড়া টেলিফোনটাও সপ্তাহ দুয়েক ধবে অচল হয়ে আছে। বার বার খবর দিয়েও কিছুই হয়নি। জীবন্ত মানুষের পৃথিবী থেকে এই রাত্তিরে তারা যেন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

চোখ তুলে একবার সামনের দিকে তাকায় সুতপা। এ বাড়ির অন্য সব কামরার আসবাবের মতই রেবতীমোহনের এই বেডরুমের খাট আলমারি ডিভান ড্রেসিং টেবল, সব কিছুতেই প্রাচীনত্বের ছাপ মারা। একধারে নিচু ডিভানে ঘুমোচ্ছে টুটুল। পাঁচ বছরের টুটুল সুতপার একমাত্র ছেলে। রেবতীমোহনের পাশের ঘরটাই সুতপা এবং টুটুলের। কিন্তু খানিকক্ষণ আগে রেবতীমোহনের স্ট্রোকের লক্ষণ দেখা দিতেই সুতপা ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে এনে ঐ ডিভানটায় শুইয়ে দিয়েছে।

টুটুলের মাথার কাছে একটা গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক। পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজ তুলে সেটা দিনরাত বেজে যায়। সুতপা দেখল, এখন বারোটা বেজে চল্লিশ। এই দুর্যোগের রাতে কলকাতা

যখন রসাতলে তলিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, সেই সময় কিভাবে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, ভেবে পায় না সুতপা। আশি বছরের এক রোগাক্রান্ত বেহুঁশ বৃদ্ধ এবং ঘুমন্ত একটি শিশু ছাড়া এ বাড়িতে আর যে কেউ নেই। অরক্ষিত তাদের ফেলে বেরুনোও যায় না। বেরুলেও এই মধ্যরাতে ট্যাক্সি রিকশা বা অটো কিছুই পাওয়া যাবে না। তার মত একটা তরুণীর পক্ষে একা একা প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দেড় কিলোমিটার হেঁটে হাউস ফিজিসিয়ানকে ডেকে আনা প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। কিন্তু কিছু একটা না করলেই নয়।

অথচ রেবতীমোহনকে নিয়ে সুতপার এত যে উৎকণ্ঠা এবং দুর্ভাবনা, তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। দেড় বছর আগে অমলের সঙ্গে ডিভোর্স হবার পরই এ বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবার কথা। কোর্ট রায় দিয়েছিল, যতদিন না টুটুল সাবালক হচ্ছে, তার কাছেই থাকবে।

অমল রেবতীমোহনের একমাত্র ছেলে। একটা বড় মাল্টি-ন্যাশানাল কোম্পানির সে টপ একজিকিউটিভ। তার সঙ্গে সুতপার বিয়েটা কোনো দিক থেকেই সুখের হয়নি। টুটুলের জন্মের কিছুদিন পর থেকেই তাদের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে থাকে। তখন প্রতি সপ্তাহে দু-তিন দিন বাড়ি ফিরত না অমল। পরে মাসে এক-আধদিন হয়ত আসত। খবর পাওয়া গিয়েছিল লাউডন স্ট্রিটে একটা সিন্ধী মহিলাকে নিয়ে সে থাকে। যাকে 'লিভিং টুগেদার' বলে, তাই আর কি। তাকে ফেরাবার জন্য রেবতীমোহন এবং সুতপা প্রথম দিকে অনেক বুঝিয়েছে। অমল সে সব কানেও তোলেনি। পরে এই নিয়ে ঝগড়াঝাটি অশান্তি এবং তিক্ততা লেগেই থাকত। শেষ পর্যন্ত কোর্টে না গিয়ে উপায় ছিল না।

ডিভোর্স হয়ে যাবার পর টুটুলকে নিয়ে দিল্লিতে মা-বাবার কাছেই চলে যেত সুতপা কিন্তু রেবতীমোহন যেতে দেন নি। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন সরকারি কলেজের প্রিন্সিপাল। আইডিয়ালিস্ট এবং হৃদয়বান এই মানুষটির চরিত্র ইস্পাতের ফলার মত ঝকঝকে। কোনোরকম অন্যায়ের সঙ্গে তিনি আপস করতে জানেন না।

ডিভোর্স হয়ে যাবার পর ছেলেকে তিনি আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেন নি। তাঁর যাবতীয় প্রপার্টি, ব্যাঙ্কের টাকা এবং বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার—সব সুতপার নামে লিখে দিয়েছিলেন। সুতপা প্রবল আপত্তি করেছে, রেবতীমোহনের আত্মীয়-স্বজনেরা এসে অনেক বুঝিয়েছে কিন্তু একরোখা জেদী মানুষটিকে টলানো যায় নি। তিনি সুতপা এবং টুটুলকে এ বাড়ি থেকে যেতেও দেননি। সুতপার জীবনে যে চরম ক্ষতি হয়ে গেছে, হয়ত এভাবেই তার কিছুটা পূরণ করতে চেয়েছেন রেবতীমোহন।

হঠাৎ গোঙানির মত আওয়াজে চমকে রেবতীমোহনের দিকে তাকায় সুতপা। আর তাকিয়েই মনে হয়, তার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বরফের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। রেবতীমোহনের চোখ দুটো এখন খোলা, দৃষ্টি স্থির। ঠোঁটদুটো অনেকটা ফাঁক হয়ে আছে, জিভ গালের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে! সবচেয়ে যেটা ভয়াবহ, তা হ'ল মুখটা আস্তে আস্তে ডানদিকে বেঁকে যাচ্ছে। আর এখন প্রচণ্ড ঘামছেন রেবতীমোহন। শরীরের সব জলীয় পদার্থ গল গল করে বের হয়ে আসছে।

রেবতীমোহনকে দেখতে দেখতে মারাত্মক ভয় পেয়ে যায় সুতপা। সে অস্থির ভাঙা গলায় সমানে ডাকতে থাকে, 'বাবা, কী কষ্ট হচ্ছে আপনার? বলুন—বলুন—'

আগের মতই কোনো সাড়া নেই।

এই মুহূর্তে কিছু একটা করা দরকার, এবং তা করতেই হবে। কিন্তু কী যে করবে, ভেবে পায় না সুতপা। চিন্তা করার শক্তিটাই তার দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মাথার ভেতরটা কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে। এখন যদি একটা সুস্থ সবল মানুষ তার পাশে থাকত, অনেকটা ভরসা পেত সুতপা।

প্রচণ্ড স্নায়বিক ভীতি এবং অস্থিরতার মধ্যেও সুতপা স্থির করে ফেলে, রেবতীমোহনকে বাঁচাতেই হবে। অন্তত শেষ চেষ্টা না করলেই নয়। একটা মানুষকে এমন নিরুপায়ভাবে মরতে দেওয়া যায় না। মরিয়া হয়েই খাট থেকে নেমে পড়ে সে। একটা ছাতা আর টর্চ খুঁজে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। যেভাবেই হোক, ডাক্তার নিয়ে আসতেই হবে।

ঘরের জানালা-টানালা বন্ধ থাকায় বৃষ্টির আওয়াজ খুব জোরালো মনে হচ্ছিল না। বাইরে আসতেই শব্দটা পঞ্চাশ গুণ হয়ে কানের পর্দায় ধাক্কা দিতে থাকে। ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পেছনে, সব দিকে আকাশটা গলে গলে নেমে আসছে। দশ ফুট দূরের কিছুই প্রায় এখন আর দেখা যাচ্ছে না। অবিরাম বৃষ্টির আড়ালে সব কিছু বিলীন হয়ে গেছে।

রেবতীমোহনের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে ভেজিয়ে দেয় সুতপা। তারপর প্যাসেজে ব্যালকনিতে এবং একতলায় নামার সিঁড়িতে যেখানে যত আলো রয়েছে, সুইচ টিপে টিপে জ্বালিয়ে দিতে লাগল। যতক্ষণ না সে ফিরে আসে, আলোগুলো জ্বলতে থাকবে।

নিচে এসে ভয়ানক দমে যায় সুতপা। সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে লন। তারপর উঁচু কমপাউন্ড ওয়ালের গায়ে ভারী লোহার গেট। লন-এ প্রায় এক ফুট জল দাঁড়িয়ে গেছে। রাস্তা থেকে এই বাড়িটা বেশ উঁচুতে। বাড়ির লন-এরই যদি এই হাল হয়ে থাকে, রাস্তাটা নিশ্চয়ই দেড় দু-ফুট জলের তলায় ডুবে আছে।

সুতপা লক্ষ্য করল, এ রাস্তায় কর্পোরেশনের আলোও জ্বলছে না। শুধু রাস্তাতেই নয়, খানিকটা দূরে বড় কমপাউন্ডের ভেতর বাংলো টাইপের যে বাড়িগুলো রয়েছে সেখানেও আলোর চিহ্নমাত্র নেই। যতদূর চোখ যায়, নিরেট অন্ধকার এবং অবিরাম বৃষ্টিপাত সব কিছু ঢেকে রেখেছে। রাস্তার জল আর জমাট অন্ধকার ঠেলে দেড় কিলোমিটার দূরে ডাক্তারের বাড়ি আদৌ পৌঁছুতে পারবে কিনা, সুতপা জানে না।

এ রাস্তায় প্রতিটি ম্যানহোলের মুখ খোলা। লোহার ঢাকনিগুলো কবেই চুরি হয়ে গেছে। অন্ধকারে জলের তলায় অদৃশ্য ম্যানহোলে পা পড়লে সুতপা কোথায় তলিয়ে যাবে, কে জানে।

কয়েক মুহূর্ত দ্বিধান্বিতের মত দাঁড়িয়ে থাকে সুতপা। তারপর হঠাৎ অদম্য এক জেদ তার ওপর যেন ভর করে। যা হবার হোক, তবু ডাক্তারের কাছে তাকে যেতেই হবে।

সুইচ টিপে নিজের পোর্টিকোর আলো জ্বালে সুতপা। লন-এর দু'ধারে উঁচু পোস্টে দুটো ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা আছে। ও দুটো জ্বললে গোটা লন-এর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত সবটা দেখা যায়।

ফ্লাড লাইটের বোতাম টিপতেই চমকে ওঠে সুতপা। প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যেও দেখতে পায়, কে যেন গেট টপকে লাফ দিয়ে এপারে নেমে পড়ল। তার মুখ চোখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও আবছাভাবে বোঝা যায় যে সে একটা মানুষই। কী উদ্দেশ্যে এই দুর্যোগের রাতে সে এ বাড়িতে ঢুকেছে তা জলের মত পরিষ্কার। ভেতর দিক দিয়ে তালা লাগানো বলে লোকটাকে ওভাবে গেট পেরুতে হয়েছে।

ভয়ে আতঙ্কে শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায় সুতপার। বৃষ্টির আওয়াজ তো আছেই, সেই সঙ্গে আকাশ ফাটিয়ে মেঘ ডেকে যাচ্ছে, কাছে দূরে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বাজও পড়ছে। এত শব্দের মধ্যে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পাবে না। লোকটা বিনা বাধায় তাকে খুন করে নির্বিঘ্নে এ বাড়ির সব কিছু লুট করে নিয়ে যেতে পারে।

লোকটাও সুতপাকে দেখতে পেয়েছিল। এই সৃষ্টিছাড়া বর্ষার রাতে পৃথিবী যখন গাঢ় অন্ধকার এবং বৃষ্টিতে ডুবে যাচ্ছে, আচমকা কেউ ফ্লাড লাইট জ্বালিয়ে দেবে, এটা খুব সম্ভব সে ভাবতে পারেনি। গেটে পিঠ ঠেকিয়ে লোকটা অনড় দাঁড়িয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ পলকহীন তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কিছু সুতপার মাথার ভেতর দিয়ে বয়ে যায়। লোকটা যেমনই হোক—খুনী ডাকাত ছেনতাইবাজ বা অন্য কোনো ধরনের সমাজবিরোধী—তবু একটা মানুষ তো। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নিজের অজান্তেই সুতপা জোরে জোরে ডাকে, 'এখানে একটু আসবেন—'

বৃষ্টি বা মেঘের ডাক ছাপিয়ে সুতপার গলা লোকটার কানে ঠিকই পৌঁছে যায়। কিন্তু সে উত্তর দেয় না।

আরো বার কয়েক ডাকাডাকির পর লোকটা পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে। হয়ত ভাবে, একটা কম বয়সের তরুণী কতটা আর ক্ষতি করতে পারবে!

কাছাকাছি আসতে লোকটাকে স্পষ্ট দেখা যায়। বয়স ত্রিশ-বত্রিশ। চারকোণা চোয়াড়ে মুখ। গাল বসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে। চোখ এক ইঞ্চি গর্তে ঢোকানো। কপালে গালে বসন্ত ছাড়াও প্রচুর কাটাকুটির দাগ। ওগুলো যে বেদম মারের চিহ্ন, বলে দিতে হয় না।

লোকটার পরনে তালিমারা খাটো ফুলপ্যান্ট আর হাত-কাটা কালো জামা, পায়ের কেডসটাতেও অগুনতি তালি। কোমরে ইঞ্চি আটেক একটা খাপে কিছু পোরা আছে। ওটা কী, সুতপা এক পলক দেখে বুঝে নেয়। তেমন বুঝলে সে বেপরোয়া ছুরি চালিয়ে দিতে পারে। সে যে কোন স্তরের জীব, দেখামাত্রই টের পাওয়া যায়।

লোকটার সারা গা এবং জামা-প্যান্ট থেকে জল ঝরে ঝরে পোর্টিকোর তলাটা ভিজে যেতে থাকে। সে যে অনেকক্ষণ ভিজেছে সেটা তার সিটানো আঙুল এবং ঠোঁট দেখে বোঝা যায়।

পোর্টিকোর সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে সুতপা, নিচে লোকটা। সন্দিগ্ধ সতর্ক দৃষ্টিতে সে সুতপাকে লক্ষ্য করছে।

সুতপা ব্যাকুলভাবে এবার বলে, 'আমাদের ভীষণ বিপদ। দয়া করে একটু সাহায্য করবেন?'

এর জন্য লোকটা প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। সুতপার ওপর চোখ রেখে চাপা গলায় বলে, 'কী সাহায্য?'

'আমার শ্বশুরমশায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বাড়িতে আমি আর আমার পাঁচ বছরের ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই। টেলিফোনটা ক'দিন ধরে অচল হয়ে আছে। এখনই একজন ডাক্তার না ডাকলে শ্বশুরমশাইকে বাঁচানো যাবে না।'

'তা আমাকে কী করতে হবে?'

'আমাদের ফ্যামিলির ডাক্তার অনেকটা দূরে থাকেন। তাঁকে—' বলতে বলতে থেমে যায় সুতপা।

লোকটা চুপ।

সুতপা এবার প্রায় মিনতিই করতে থাকে, 'বিশ্বাস না হ'লে একবার ওপরে এসে আমার শ্বশুরমশাইকে দেখে যান—' ঝোঁকের মাথায় বলতে বলতে থমকে যায় সে। এমন জঘন্য ধরনের একটা লোককে কোনোভাবেই যে ওপরে নিয়ে যাওয়া উচিত না, সেটা মনে পড়তেই ভেতরে ভেতরে অস্বস্তিবোধ করতে থাকে।

লোকটা রুক্ষ গলায় বলে, 'নকশাবাজি ছাড়ুন। আপনার কথায় ওপরে যাই, আর আপনি ফাঁসিয়ে দিন! ওসব ধান্দা চলবে না মেমসাহেব।'

এ ধরনের কথা আগে কখনও শোনে নি সুতপা। বুঝতে অবশ্য অসুবিধে হয় না, লোকটা তাকে একেবারেই বিশ্বাস করছে না। তার ধারণা ভুলিয়ে ভালিয়ে সুতপা তাকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে ফাঁদে ফেলে দেবে। অসহায় ভঙ্গিতে সে বলে, 'আমি কি বিপদে পড়েছি, ওপরে না গেলে কেমন করে দেখাব!'

সুতপার মুখচোখ দেখে এবং কণ্ঠস্বর শুনে লোকটার হয়ত মনে হয়, সে সত্যিই বলছে। কিন্তু সে খুব সম্ভব জগতের কোনো মানুষকেই বিশ্বাস করে না। জলে ভিজে তার কাঁপুনি ধরে গিয়েছিল। সে বলে, 'যত ঝামেলাতেই পড়ুন, আমি ক্যাঁচাকলে পা ঢোকাচ্ছি না। যা বলার এখানেই বলে ফেলুন।'

সুতপা এবার হতাশই হয়ে পড়ে। সে লোকটা প্রথম থেকেই তাকে অবিশ্বাস করছে তার কাছ থেকে কোনোরকমই উপকার বা সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবু নৈরাশ্যের একেবারে শেষ প্রান্তে পৌঁছে সুতপা বলে, 'আমাদের ফ্যামিলির ডাক্তারকে যদি একবার খবর দেন—' একটু থেমে আবার বলে, 'মানে, আমার মত একটা মেয়ের পক্ষে একা একা এই ঝড়বৃষ্টিতে বেরুনো—' বলতে বলতে চুপ করে যায়।

সাহায্যের প্রস্তাবটা ঠিক এই চেহারায় আসবে ভাবতে পারে নি লোকটা। অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর সুতপার বিপন্নতা খানিকটা যেন আঁচ করতে পারে সে। বলে, 'ডাক্তারের কাছে আমাকে পাঠিয়ে ওপরে গিয়ে ফোন করে দিন আর ডাক্তার আমাকে ধরে—' কথাটা আর শেষ করে না সে।

সুতপা বলে, 'আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমাদের ফোন বেশ কিছুদিন খারাপ হয়ে আছে। ওটা ঠিক থাকলে আপনাকে কষ্ট দিতাম না।'

লোকটা একটু চিন্তা করে বলে, 'আপনাদের ডাক্তার কোথায় থাকে?'

সুতপা একটা রাস্তার নাম এবং বাড়ির নম্বর বলে। লোকটা প্রায় লাফিয়ে ওঠে, 'উরি শ্লা, ওখানে যেতে এখন ইস্টিমার লাগবে। রাস্তা-ফাস্তার যা হাল হয়েছে! আপনি কি মেমসাহেব আমাকে যমের বাড়ি চালান করতে চান?'

এ কথার উত্তর হয় না, সুতপা চুপ করে থাকে।

সুতপার মুখের দিকে তাকিয়ে এবার হয়ত করুণাই হয় লোকটার। সে বলে, 'ঠিক আছে। আপনি যখন ঝামেলায় পড়েই গেছেন তখন দেখি কী করা যায়। ডাক্তারের ঠিকানাটা যেন কী বলছিলেন—'

সুতপা রাস্তার নাম এবং বাড়ির নম্বর আরেক বার জানিয়ে দেয়। লোকটা আর দাঁড়ায় না। পোর্টিকো পেরিয়ে গেটের দিকে পা বাড়ায়। হঠাৎ কিছু মনে পড়তে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সুতপা পেছন থেকে ডাকে, 'শুনুন—'

প্রবল তোড়ে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। ভিজতে ভিজতে থমকে দাঁড়ায় লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে বিরক্ত গলায় বলেন, 'আবার কী?'

সুতপা বলে, 'একটু দাঁড়ান, আপনাকে একটা ছাতা এনে দিচ্ছি। আর গেটেও তালা লাগানো রয়েছে। ওটা খুলে না দিলে—'

এমন হাস্যকর অসম্ভব কথা বোধহয় লোকটা আগে আর কখনও শোনেনি। অদ্ভুত হাসে সে, একটি কথাও না বলে প্রচণ্ড বৃষ্টি মাথায় নিয়ে, লন পেরিয়ে, গেট টপকে বাইরের রাস্তায় নেমে যায়। পরক্ষণে তার সিলুয়েট হয়ে যাওয়া শরীরের ঝাপসা কাঠামো গাঢ় অন্ধকার এবং বৃষ্টির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

লোকটা চলে যাবার পর অনেকক্ষণ পোর্টিকোর তলায় দাঁড়িয়ে থাকে সুতপা। চারিদিকের সবগুলো আলো জ্বালিয়ে রেখেই আবার রেবতীমোহনের ঘরে ফিরে আসে। এই ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে পুরো লন, গেট এবং সামনের রাস্তার অনেকটা অংশ দেখা যায়।

সুতপা লক্ষ্য কবল, টুটুল আগের মতই অসাড়ে ঘুমোচ্ছে। আর রেবতীমোহন একই রকম চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখ তেমনই খোলা, গলার ভেতর থেকে আবছা ঘড়ঘড়ে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে! তবে মুখটা একদিকে আরো কিছুটা বেঁকে গেছে। কিছুক্ষণ আগে যেমন দেখে গিয়েছিল, তেমনই ঘামছেন।

একসময় রেবতীমোহন ছিলেন আশ্চর্য সুপুরুষ। দারুণ স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। প্রথম স্ট্রোকটি হবার পর শরীর ভেঙেচুরে এখন ধ্বংসস্তূপ। আরেকটা স্ট্রোকের ধাক্কা সামলাতে পারবেন কিনা, কে জানে।

পাশে বসে তোয়ালে দিয়ে রেবতীমোহনের ঘাম মুছিয়ে দেয় সুতপা। তারপর রোগা ফ্যাকাশে ডান হাতটি তুলে নাড়ি দেখে। তির তির করে সেটা ওঠানামা করছে। বুকের ওপর হাত রেখে টের পায়, হৃৎপিণ্ড এখনও একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি।

রেবতীমোহনের শুশ্রূষা করতে করতে বার বার সুতপা গেটের দিকে তাকায়। লোকটা সেই যে গেছে, তারপব ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। কিন্তু এখনও ডাক্তার আসছেন না। চেহারা চালচলন দেখে লোকটাকে যেটুকু বোঝা গেছে তাতে তার কাছে কোনোরকম দায়িত্ববোধ আশা করা যায় না। হয়ত ডাক্তারকে খবর না দিয়েই সে চলে গেছে। রেবতীমোহনের যা

অবস্থা, ডাক্তার না এলে কী হবে ভাবতে সাহস হয় না সুতপার।

আরো আধঘণ্টা অসীম উৎকণ্ঠায় কাটিয়ে সুতপা যখন বুঝতে পারে তার শেষ আশাটুকুও প্রায় বিলীন হয়ে এসেছে, সেই সময় গেটের কাছে একটা প্রাইভেট হেডলাইটের জোরালো আলো এসে পড়ে। পরক্ষণেই সেই লোকটার চিৎকার শোনা যায়, 'মেমসাহেব, তালা খুলে দিন। ডাক্তারবাবুকে নিয়ে এসেছি।'

সুতপা টের পায়, তার ঝিমিয়ে-আসা অবসন্ন হৃৎপিণ্ডে আচমকা হাজার ঘোড়া ঝড়ের গতিতে ছুটতে শুরু করেছে। সে প্রায় লাফ দিয়েই খাট থেকে নেমে, গেটের চাবি নিয়ে, একসঙ্গে দু-তিনটি সিঁড়ি টপকে টপকে একতলায় এসে দৌড়ে গিয়ে তালা খুলে দেয়।

বৃষ্টি অঝোরে ঝরে যাচ্ছে।

গাড়ির দরজা খুলে এ বাড়ির পারিবারিক চিকিৎসক মধ্যবয়সী ডাক্তার সেন নেমে আসেন। তাঁর গায়ে রেন-কোট। হাতে ঢাউস মেডিক্যাল ব্যাগ। একটু দূরে সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা শরীর বেয়ে জলের স্রোত নেমে আসছে। বোঝায় যায়, মাথায় বৃষ্টি নিয়ে সমস্ত রাস্তা কোমর সমান জল ঠেলে ঠেলে সে ডাক্তারের কাছে খবর দিতে গিয়েছিল।

ডাক্তার সেন বলেন, 'কী ব্যাপার সুতপা? কী হয়েছে তোমার শ্বশুরের?'

সুতপা বলে, 'রাত্তিরে খাওয়া দাওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মনে হচ্ছে আরেক বার অ্যাটাক হয়েছে।'

ডাক্তার যেন চমকে ওঠেন, 'চল, চল—' লম্বা লম্বা পায়ে তিনি এগিয়ে যান। তাঁর পাশাপাশি একরকম ছুটতে থাকে সুতপা।

দোতলায় এসে ক্ষিপ্র গতিতে রেবতীমোহনের হার্ট টার্ট পরীক্ষা করে পর পর দুটো ইঞ্জেকশান দেন ডাক্তার সেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে গোঙানি বন্ধ হয়ে যায়, মুখটা ফের স্বাভাবিক হতে শুরু করে।

রোগীকে দেখতে দেখতে টেনশান কেটে যেতে থাকে ডাক্তার সেনের। বলেন. 'ধাক্কাটা বোধহয় এবারও কাটিয়ে উঠলেন তোমার শ্বশুরমশাই। তবে কাল কার্ডিওগ্রাফ না করে এর বেশি আর কিছু বলব না। পেশেন্টের কাছে বাকি রাতটা আমাকে থাকতে হবে।' একটু থেমে বলেন 'এখন এই ইঞ্জেকশান দুটো না পড়লে ফেটাল কিছু ঘটে যেতে পারত। লোকটাকে ঠিক সময়েই পাঠিয়েছিলে। কে লোকটা? আগে তো কখনও তোমাদের বাড়িতে দেখিনি?'

সুতপা হকচকিয়ে যায়। ডাক্তার আসার পর লোকটার কথা সে আর ভাবে নি। জড়ানো গলায় কোনোরকমে সে বলে, 'আমাদের আত্মীয় বলতে পারেন।'

'খুব সিনসিয়ার লোক। দুর্দান্ত দায়িত্ববোধ। আমার মনে হয়, সারাটা রাস্তা ভিজে, জল ঠেলতে ঠেলতে গেছে। আমার ড্রাইভার তো ক'দিন ধরে জ্বরে পড়ে আছে। নিজেকেই গাড়ি চালিয়ে আসতে হ'ল। এত জল যে খানিকটা আসতে আসতেই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। তারপরে সারা রাস্তা লোকটা আমার গাড়ি ঠেলে নিয়ে এসেছে।

ডাক্তার সেনের শেষ কথাগুলো যেন শুনতে পাচ্ছিল না সুতপা। উদ্‌ভ্রান্তের মত সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'ডাক্তার সেন, আপনি পেশেন্টের কাছে একটু বসুন। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফিরে আসছি।'

নিচে পোর্টিকোর তলায় এসে থমকে দাঁড়ায় সুতপা। যার জন্য নেমে আসা তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতপার কৃতজ্ঞতার জন্য সে অপেক্ষা করে নি। এই বিশাল মহানগরে অন্তহীন দুর্যোগের মধ্যে লোকটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে, কে বলবে।

কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে সুতপার মনে হয়, মানুষ একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। তাকে এখনও কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করা যায়।